সময় অসময় নিঃসময়

তপোধীর ভট্টাচার্য

জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯, শিলচর, আসাম।
শিক্ষা : কাছাড় হাই স্কুলে শুরু। স্নাতোকোত্তর স্তরে বাংলা, বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত —তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী। পি.এইচ.ডি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২।
কর্মজীবন : ১৯৬৯ সালে শিলচরের নরসিংহ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মজীবনের সূচনা। পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-অনুষদের ডিন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিদ্যা বিভাগের রবীন্দ্র-অধ্যাপক। বর্তমানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কর্মরত।
পুরস্কার ও সম্মান : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'জীবনানন্দ পুরস্কার' (২০০০), সিলেটের 'একাডেমি অফ টু আরস' কর্তৃক 'লিজেন্ডারি পার্সোনালিটি অফ দি রিজিয়ন' সম্মান প্রদান (২০০৩), তাসখন্দ ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে সম্মানিত।
গ্রন্থ : প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'প্রবন্ধের ভুবন : ব্যক্তি ও সৃষ্টি', 'আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর', 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ', 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', 'উপন্যাসের সময়', 'জাক দেরিদা : তাঁর বিনির্মাণ', 'রোলা বার্ত : তাঁর পাঠকৃতি', 'ছোটগল্পের প্রতিবেদন', 'জীবনানন্দ : কবিতার নন্দন' প্রভৃতি।
প্রিয় বিষয় : প্রতীচ্যের সাম্প্রতিকতম সাহিত্যতত্ত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য।

সময় অসময় নিঃসময়

সময় অসময় নিঃসময়

তপোধীর ভট্টাচার্য

একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Samay Asamay Nihsamay
A collection of essays by Tapodhir Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর. ২০১০

© স্বপ্না ভট্টাচার্য

প্রকাশক : একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : . মনিষ দেব

মুদ্রক : গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ১৮০ টাকা

মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
স্মরণীয়েষু

শুভেন্দু ইমাম
সরকার আশরাফ
অমলহৃদয়েষু

অন্ধকারের উৎস হতে যাঁরা উৎসারিত আলো

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই

জীবনানন্দ : কবিতার সংকেতবিশ্ব

সূচিপত্র

পূর্বলেখ ৯

সময় ও সমাজ

কালবেলা : মোহিনী আড়াল : ভ্রমকথা ১৫
নিভন্ত এ চুল্লিতে সই একটু আগুন দে ২৪
জনৈক শিক্ষাজীবীর আত্মদর্শন ৩৭
কালবেলার কথকতা ৪৪

ভাষা ও অস্তিত্ব

উনিশে মে, আমাদের উত্তরাধিকার ৫৩
নির্বাসিত বাংলার টুটোফাটা দর্পণ ৬০
প্রান্তিক বাঙালির বিহ্বল বয়ান ৭০
বাংলা ভাষার বিপন্নতা ৭৯
উপভাষা, লঘুসংস্কৃতি, অপর পরিসর ৮৬

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কী লিখি, কী লিখতে চাই ৯৯
আমাদের এই লিখনপ্রণালী ১০৩
সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ভাবাদর্শ ১১৬
নাস্তিকতার সমাজতত্ত্ব ১২৭
লিটল ম্যাগাজিন নামক শমীবৃক্ষ ১৩৯
সাহিত্যতত্ত্বের সহজপাঠ ১৫১
ইলিয়াসের যুগলবন্দি ১৬৬
গ্রহাণুপুঞ্জের আকাশ ১৭৭
উত্তরলেখ ১৮৮

পূর্বলেখ

'We are no longer in the era of the will, but of the passing impulse
We are no longer in the era of anomie, but of anomaly.
We are no longer in the era of the event, but of the eventuality.
We are no longer in the era of virtue, but of virtuality.
We are no longer in the era of power, but of potentiality.'

কবিতার মতো এই উচ্চারণ জাঁ বদ্রিলার করেছিলেন 'Cool Memories' (১৯৯৪ : ১৮) নামক বিখ্যাত জার্নালে। কীভাবে চিহ্নিত করব নিজের সময়কে, প্রতিটি যুগের মানুষ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিহ্বল বোধ করেছে। কেননা জিজ্ঞাসা যেমন অন্তহীন তেমনি মীমাংসাহীন সমকালকে কি চেনা যায় সত্যিসত্যি? কবি -গল্পকার -ঔপন্যাসিক-চিত্রকর তবু সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বর নিয়ে ভাবেন। নিজস্ব ধরনে বয়ানের টানা ও পোড়েন তৈরি করেন। কিন্তু এত উদ্যম সত্ত্বেও সময়-জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না। বরং নতুন নতুন প্রশ্ন উসকে দেয় আপাত-সময় ও প্রকৃতসময়ের সমান্তরাল অস্তিত্ব। আর, অস্তিত্বের নতুন বোধ পরিসর-চেতনাতেও প্রতীয়মান এবং যথার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংশয়-অবভাসের গ্রন্থি তৈরি করে।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলাম বিশ শতক। একুশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিহ্বল মানুষ দেখছে, সত্যও উৎপাদিত হয়। দেখছে, বিশ্বায়ন নামে জুজুবুড়ি ধীরে ধীরে তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকাতেও কীভাবে সান্টাক্লুজে পরিণত হয়ে গেছে। পি.সি সরকারের গিলিগিলি হোকাসপোকাস এখন কম্পিউটার নামক ময়দানব ঢের বেশি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে। টুপি থেকে বেরোচ্ছে হাতি, স্পিলবার্গের ডায়নোসোর, অন্য নক্ষত্রলোক থেকে আসা মহাকাশযান। সব মায়া, সব সত্যের ইজারাদার এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মোড়লপ্রভু। একদিকে দেশ ও জাতির সীমান্ত চূর্ণ করে দিনরাত ইথারতরঙ্গে ভেসে আসছে ছদ্মপৃথিবীর সম্মোহক মাদক, অন্যদিকে উদ্ভট কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোঁড়ামি ভরা অপপুরাণের মরা কোটালে নতুন জোয়ার এনে দিচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। উপগ্রহের অকৃপণ সহযোগিতায় গণমাধ্যম এখন মাদকভরা বিনোদনের অফুরন্ত যোগানদার। সাহিত্য কবেই পণ্য হয়ে গিয়েছিল। এখন তা খোলাখুলি প্রতাপের সেবাদাস, আধিপত্যবাদী রাজনীতির সুরে-তালে-লয়ে পাঠকৃতির তন্তুগুলি বাঁধা।

এ সময় সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক পিঞ্জর বিনির্মিত হচ্ছে তবু। হতেই হবে। কেননা দ্বিবাচনিকতা জীবনের নিয়ামক বিধি। সাহিত্যের পাঁজর থেকে জন্ম নিচ্ছে জীবন্ত লেখার প্রতিস্রোত। কী কবিতায় কী ছোটগল্পে কী উপন্যাসে আকরণোত্তর বিন্যাস ও উত্তরায়ণ মনস্কতা অপরিহার্য সত্য। পিঞ্জরায়িত সময়ের রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র,

আবার শমীগর্ভে প্রচ্ছন্ন আগুনের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক সময়বোধের দ্বিবাচনিক অভিব্যক্তিও দেখতে পাচ্ছি আমরা। নইলে হাসান আজিজুল হক-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখতেন না, ইমদাদুল হক মিলন আর হুমায়ুন আহমেদেরা লিখতেন কেবল। কিংবা মহাশ্বেতা দেবী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, নবারুণ ভট্টাচার্যেরা লিখতেন না কখনো। আজও সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, কাজল শাহনেওয়াজেরা লেখেন কেন যদি সময়ের প্রতীয়মান ও প্রশ্রয়ধন্য পাঠ সম্পর্কে তাঁদের আপত্তি না থাকত? অবভাস আমাদের চিন্তায়, চেতনায় মড়কের সংক্রামক কীটের মতো অনুপ্রবেশ করেছে। সত্য কী আমরা জানি না, এমন কী মিথ্যাকেও আমরা জানি না। আমরা ইতিহাসকে ঠোঁটে রাখি, মেধায় রাখি না। বরং অতি চতুর অতি সপ্রতিভ প্রতীচ্য থেকে উড়ে-আসা ইতিহাস-সন্দর্ভ-ভাবাদর্শের মৃত্যু বিষয়ক ধারণার আঁধি আমাদের আচ্ছন্ন করছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দুটি তুলে এনে নিজের বুকের ওপর রেখে পরখ করতেও অনীহা, এখনো সেই পুরনো হৃৎপিণ্ড আগের তালে-লয়ে ধুকপুক করছে কিনা।

সব অস্থির এখন : আবেগ-চিন্তা-অনুভূতি-বিশ্বাস। ইচ্ছার ওপর সময়ের কর্তৃত্ব নিশ্চয়, কিন্তু ব্যক্তি কি নিরুপায় ভোক্তা ও গ্রহীতা! তাৎক্ষণিক তাগিদে যদি সব কিছুই হয়, লেখার উপকরণ তাহলে কী হবে? অন্বয়ের পুরনো রীতি বাতিল হয়ে গিয়ে যদি অনন্বয়ের সঞ্চরমান অনুভূতিপুঞ্জ সর্বেসর্বা হয়ে থাকে, তাহলে ঘটমানতা বলে কিছুই থাকবে না। যদি এমন হয়, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক কোনো ধরনের যথাপ্রাপ্ত সম্পর্কে মাথা ঘামাবেন না আর। অবভাস কী তত্ত্ববস্তুই বা কী! দ্রুত বদলে-যাওয়া এবং বদলাতে-থাকা এ সময়ে দর্শনেরও মৃত্যু ঘোষণা তবে অবধারিত। কালঃ পচতি ইতি বার্তা।

২

বাংলার মূল ভূখণ্ডের বাইরে আমরা যারা বাংলা বলি, লিখি, ভাবি, তর্ক করি—যথাপ্রাপ্ত প্রান্তিক অবস্থানের বিষণ্ণতা, বিচ্ছিন্নতা, গ্রন্থিলতা কি আমাদের সাহিত্যবোধে দুরপনেয় ছাপ ফেলেনি? আমাদের সৃষ্টি ও নির্মাণ, মেধা ও সংবিদকে কি হঠাৎ কুয়াশা এসে আচ্ছন্ন করে না? ইংরেজি ও স্পেনীয় ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের ভাষাচেতনা ও সাহিত্যচেতনা অবস্থান অনুযায়ী ভিন্নভিন্ন। প্রতিটি পরিসরের স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন তোলে না। হায়, জেলায়-জেলায় পরগণায়-পরগণায় যে বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অসামান্য—সেই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের বাঙালিত্ব এখনো প্রমাণ-সাপেক্ষ। দেবীপ্রসাদ সিংহ, শেখর দাশ, দুলাল ঘোষদের সৃষ্টির ভুবন সম্পর্কে কোনো কৌতূহল উত্তর-পূর্ব ভারতের বাইরে আছে কি? সূর্য যেমন পাহাড়ে ও সমতলে, সমুদ্রে ও অরণ্যে সমান রোদ্দুর ছড়িয়ে দেয়—সময়ও তেমনি একই উত্তাপ নিয়ে আসে। কে কতখানি শুষে নিচ্ছে, তা নির্ভর

করে বেশ কিছু প্রাক্‌শর্তের ওপর। সময়ের নতুন সমিধকে কতখানি কীভাবে কারা কাজে লাগাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে আগুন ও ধোঁয়ার অনুপাত।

এ সময় আগুনের, এসময় ধোঁয়ারও। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অন্তঃস্বরে তার অভ্রান্ত প্রমাণ নিহিত। শুধু দেখার চোখ চাই। পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করতে হবে, শূন্যায়তনগুলিরও নিবিড় পাঠ করা চাই। কেননা কথিত বাচনে শুধু সময় ধরা পড়ে না ; বরং অকথিত পরাবাচনে সময়ের ইশারাগুলি থাকে। শব্দান্তর্বর্তী সেইসব শূন্যতা নিয়েই সম্পূর্ণ হয় চিহ্নায়কের গ্রন্থনা। কবিতা পড়ি কিংবা ছোটগল্প অথবা উপন্যাস, এমন কী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সমস্যা নিয়েই ভাবি, আমাদের বিশ্লেষণ হোক দ্বি-বাচনিকতায় আধারিত ; ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক মাঝে মাঝে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ওই সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সময়কে বুঝি বিম্বিত পরিসরে, পরিসরকেও বুঝি সময়ের নিরিখে। এদের আন্তঃসম্পর্কে জটিলতা চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। যুগে যুগে তার পুনর্নবীকরণের ধরনটুকু পাল্টায় শুধু।

আমাদের লেখায় বড়ো নির্জনতা এখন। হয়তো এই নির্জনতায় বিষাদ নেই তত। আছে উদ্ভট মান্যতার বোধ ; মান্যতা বলব, বৈধতা নয়। এখন আমরা প্রাজ্ঞ হতে পারি না সহজে। তাই আমাদের ইদানীংকার পাঠকৃতিতে দেখতে পাই—সমস্ত কেমন যেন আপাত, ত্রিশঙ্কু, চূড়ান্তবিন্দু থেকে স্থিরীকৃত দূরত্বে রুদ্ধ। নিশ্চয় এই বোধও সময়-শাসিত। কিন্তু কীভাবে অস্বীকার করি যে আজকের লেখকেরা এবং আলোচকেরা সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়াতে পারদর্শী? গভীর গভীরতর কোনো কারণে, সম্ভবত বিশ্বায়নের ছলে সংক্রামিত নির্মানবায়নের প্রভাবে, আমাদের সমস্ত বোধই অসাড় আজ। দাতা যেখানে, গ্রহীতাও সেখানে। ভুল প্রমাণিত হতে বড়ো ভয়। প্রতিটি পাঠকৃতি যে-ধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে শুরু হয়, আপাত-সমাপ্তির বিন্দুতে পৌঁছে দেখি, প্রত্যাশাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছে বৌদ্ধিক চাতুর্য। ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা তো নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

তাহলে কি জাঁ বদ্রিলারের বিষাদ-মথিত উচ্চারণই মেনে নেব : 'We are condemned to social coma, political coma, historical coma. We are condemned to an anaesthetized disappearance, to a fading away under anasesthesia.' (তদেব : ৫)। এ সময়ের কবি ও কথাকারেরা, প্রাবন্ধিক ও সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা এই বাচনের যথার্থতা খুঁজুন তাঁদের সৃষ্টি ও জীবনের যুগলবন্দি পাঠকৃতিতে। কিংবা প্রতিপ্রশ্ন করুন। বাঙালির সমস্ত ভুবনে অব্যাহত থাকুক এই খোঁজা বা প্রতিপ্রশ্ন ; হয়তো পরিসর অনুযায়ী মীমাংসা ভিন্ন হবে, হয়তো কোনো মীমাংসাই হবে না, তবু।

সময় ও সমাজ

কালবেলা : মোহিনী আড়াল : ভ্রমকথা

শিরোনাম নিয়ে নিবন্ধ-প্রয়াসীর কিছু লেখার রেওয়াজ নেই। অনেকদিন আগে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, আমাদিগের (অর্থাৎ লেখকদের) আত্মপরিচয় আপনি দিবার রীতি নাই। কিন্তু ইদানীং সমস্ত কিছুই 'চলে যায়'। অতএব শিরোনাম প্রসঙ্গে লিখছি, না, গুরুতর কোনো কথা নয়। এইমাত্র যে, মনের মধ্যে লেখার বিষয়টি যখন দানা বেঁধে উঠেছে, ভাবছিলাম, নাম হোক ; সময়ের সাহিত্য, সাহিত্যের সময়। একটু পরে নিজেরই খটকা লাগল 'সাহিত্য' কথাটা নিয়ে। সাহিত্য লিখব না কি সন্দর্ভ, সাহিত্য শব্দটা বড্ড বেশি ফর্ম্যাল, আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক, গুরুগম্ভীর। এখন তো 'এক্রিচার'-এর যুগ, টেক্সট বা বয়ান লেখা ভালো। সময়ের বয়ান হতেই পারত, সঙ্গে বয়ানের সময়। তারপর ভাবতে শুরু করলাম, চোখের সামনে 'সময়' এর মতো উদাসীন, নিরপেক্ষ, দার্শনিক শব্দটিও কেমন যেন পানসে, জলো হয়ে গেছে। সময় থেকে নির্যাস শুষে নিয়েছে তথ্যের, পণ্যের সম্মোহন ছড়ানো গণমাধ্যম। একেবারে সন্ত্রাসবাদীর কায়দায় ব্যক্তির দখল থেকে সময় ছিনিয়ে নিয়েছে কে বা কারা। ই-মেল ইন্টারনেট সাইবার কাফে ই-কমার্স ইত্যাদি শব্দাবলী সামুদ্রিক তুফানের মতো আছড়ে পড়ছে আমাদের ওপর। ডট কমের তুমুল সন্ত্রাসে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে ব্যক্তি-সমাজ-ঐতিহ্য-সম্পর্ক ইত্যাদির বোধ। প্রবল পরিহাসের মতো এল বলে সাহিত্য। কিছুদিন পরেই হয়তো এরকম নিবন্ধ-প্রয়াসের কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

ভাবতে ভাবতে মনে এল জীবনানন্দের বেলা-অবেলা-কালবেলার কিছু কিছু বাচন। হ্যাঁ, সময়ের ভব্যসব্য আশালতা শুকিয়ে যাচ্ছে যখন, কালবেলা ছাড়া কী বা বলা যায় একে। গত কয়েক বছরে দেখলাম, কী অসামান্য দ্রুততায় ও দক্ষতায় শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিতদের তফাত মুছে দেওয়া হল। চ্যানেলে চ্যানেলে নির্বোধ সিরিয়্যালের দাপটে সামাজিক বিনিময়ের সমস্ত সেতু একে একে ভেঙে পড়ল। বই পড়া নামক অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল আদিখ্যেতা। একেকবার একেকটা জোর এল মেগা-সিরিয়ালের ; তখন সেই কানু ছাড়া গীত নেই আর। স্টার টি.ভিতে যেমন কৌন বনেগা ক্রোরপতি। উপগ্রহ-প্রযুক্তির উপর একাধিপত্যের সুযোগে বিশ্বপুঁজিবাদের মোড়লেরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিগর্বী বাঙালিদের পর্যন্ত দোঁ-আশলা, তে-আঁশলা জীবে পরিণত করছে। নিকৃষ্ট সামন্তবাদী অপচেতনা ও নির্বিচার ভোগবাদী প্রতীকের ককটেল ইতিমধ্যে বাঙালির ভুবনকে অনেকখানি কলুষিত করে দিয়েছে। হাঁসজারু ও বকচ্ছপদের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞানগুলি। সবচেয়ে মারাত্মক কথা, আমাদের শিশু ও কিশোরেরা হয়ে উঠছে দম-দেওয়া পুতুল, পরগাছা ও উৎকেন্দ্রিক। সাহিত্যের সমস্ত পরিচিত আড্ডায় এবং গত কয়েক বছরে বইমেলাগুলিতে ছোট পত্রিকার সমাবেশগুলির দিকে তাকালেই খালি চোখে ধরা

পড়বে, আনুপাতিক হারে মধ্যবয়স্কদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এর পরে রয়েছে যারা এখন আর তত তরুণ নয়। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ টগবগে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে কম। অথচ ঠিক উল্টো ছবিটা দেখার কথা ছিল। সব মিলিয়ে ভয়াবহ এক বাস্তব বিস্তীর্ণ চোরাবালির মতো অপেক্ষমান।

কেন এমন হল? তথ্য ও বিনোদনের মাদক আমাদের দৈনন্দিনকে আচ্ছন্ন করছে যখন, সাফল্য-শিকারীরা ভোগবাদী সমাজের মাপে নিজেদের খোলনলচে পাল্টে ফেলছে। প্রতিটি ঘরে ঘরে চলছে আত্মপ্রতারণা ও আত্মসম্মোহনের নির্বিবেক প্রক্রিয়া। সর্বব্যাপ্ত সম্মোহনকে বাস্তব বলে ধরে নিচ্ছে প্রায় প্রত্যেকেই। কালবেলার উপযোগী এই মোহিনী আড়াল। পণ্যায়নের প্রভাব ষাটের দশক থেকেই সাহিত্যে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য সাহিত্যের পুরোহিতেরা মার্কিনী কায়দায় যৌনতা ও হিংসার অনান্দনিক মিশ্রণ ঘটিয়ে 'বেস্ট সেলার' উৎপাদনে সচেষ্ট ছিলেন। পরে ক্রমশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপবিশ্বাস, মৌলবাদী প্রবণতা, অলৌকিকতা ইত্যাদি। একদিকে উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপযোগী মানসিকতা আমদানি করে অন্যদিকে চরম রক্ষণশীল প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিচিত্র পাঁচন তৈরি হচ্ছিল। নব্বই-এর দশক থেকে উন্নত প্রযুক্তির উপযোগী আধুনিকোত্তরবাদের ছায়া এসে যুক্ত হল। ফলে আমাদের সাহিত্যের বিজ্ঞাপনধন্য জনপ্রিয় ধারাটি স্তরে স্তরে সাহিত্যের নামে ভ্রমকথারই তাণ্ডব চালিয়ে গেছে। পাশাপাশি অবশ্য ছোট পত্রিকায় সাহিত্যের বিকল্প ধরন ও বিকল্প চেতনা সন্ধানের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক পর্যায়ে যে অভূতপূর্ব সর্বাত্মক আক্রমণ সাংস্কৃতিক নয়া উপনিবেশবাদীরা শুরু করেছে, অভিঘাতের ব্যাপকতায় তার সঙ্গে কিছুই তুলনীয় নয়।

এর আগেও মানুষের ইতিহাসে বহু দুর্যোগ এসেছে, মননে ও সাহিত্যে নানা ধরনের অনন্বয় তৈরি হয়েছে। অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের মধ্যে উপযুক্ত রদবদল ঘটিয়ে মানুষকে দুর্যোগ বরং ঋদ্ধ করেছে আরো। কিন্তু অতি সম্প্রতি মানুষ যেভাবে নিজেরই তৈরি যন্ত্র-প্রযুক্তির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে নিজেকে নিজেই অবান্তর করে তুলছে—এরকম আগে কখনো দেখা যায়নি। মানুষ এখন আত্মহননের মাদকে মশগুল। দুরন্ত গতি ও উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চয়ের নেশায়, সম্পদ থেকে আরো সম্পদ তৈরির অন্ধ প্রতিযোগিতায় স্বয়ং সময় অলীক হয়ে পড়ছে। এখন কোথাও কোনো পৌবাপর্য নেই, প্রেক্ষিত নেই, প্রাসঙ্গিকতাও নেই। অর্জনীয় কোনো সত্য নেই, আছে কেবল নিত্য নতুন সত্য-ভ্রম উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। সাম্প্রতিক এই পর্যায়কে বলা হচ্ছে self ignition, self seduction এর পর্যায়।

তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনাপর্বে এতদিনকার অর্জন-ব্যর্থতা-সম্ভাবনাকে নিশ্চয় যুক্তিনিষ্ঠভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। কিন্তু সমস্যা এখানেই যে আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভেতরে এবং চিন্তা-অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যেও রয়েছে অজস্র কূটাভাস, শূন্যায়তন ও গোলকধাঁধা। এইজন্যে সন্দর্ভ তৈরি করতে-না-করতে আমরা মাঝপথে সেসব ভেঙে দিচ্ছি। আসলে ভেঙে যাচ্ছি নিজেরাই। প্রত্যয় নিয়ে কোনো কিছুকেই

চূড়ান্ত বলে তর্কের খাতিরেও মেনে নিতে পারছি না। সব ধরনের ভাবাদর্শ, স্বপ্ন, বিশ্বাস, কিংবা নির্মাণ-আকাঙ্ক্ষাকে মহাসন্দর্ভ বলে প্রত্যাখ্যান করাই রেওয়াজ এখন। 'সকলেই আড় চোখে সকলকে দেখে'। তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আজ? ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারছি না কেননা ইতিহাস মানে পিঞ্জর, ইতিহাস মানে আধিপত্যবাদের চতুর নির্মিতি। চরম বিমানবায়নের এই পর্যায়ে জৈবপ্রযুক্তি ও জৈবরসায়ন বিদ্যা মানুষের বহু সহস্রাব্দব্যাপী ধারাবাহিকতাকে ভেঙে চৌচির করে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের নামে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিঃশেষে মুছে দিচ্ছে অপ্রতিরোধ্য তথ্যবিনোদনের নয়া উপনিবেশবাদ। এসময় দার্শনিকেরা ভাবছেন অস্তিত্বের প্রত্নতত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। পরিণামে লেলিহ জিহ্বা দিয়ে আত্মসম্মোহন আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে চেটে পুটে খাচ্ছে। সব কিছুই যখন 'ভবিষ্যৎ অতীত', আমাদের সাহিত্যবোধ বা নন্দনচিন্তা দাঁড়াবে কোন্ ভিত্তির ওপরে?

২

সর্বব্যাপ্ত বিভ্রমের এই কালবেলায় পুরনো ধাঁচের বয়ান কোথাও তো প্রাসঙ্গিক থাকছে না। সমস্তই আপেক্ষিক এবং সাময়িক যখন, ভিত্তি কিংবা অন্বিষ্ট অবান্তর হতে বাধ্য। গত চার-পাঁচ বছরে চোখের সামনে জীবনবোধ হয়ে উঠল রঙিন মরীচিকা। ফলে আখ্যান থেকে ঝরে গেল ঋজুতা ও সত্যের নিষ্কর্ষ ; কবিতার বাচন থেকে চিহ্নায়কের দ্যুতি। এটা ঠিক, উপন্যাসে ছোটগল্পে নানাধরনের অভিনবত্ব দেখা যাচ্ছে ইদানীং। কিন্তু মানুষের দুরূহ সংকটের ছবি কি স্পষ্ট হচ্ছে? যে-মানুষটি পাঠাভ্যাস হারিয়ে ফেলছে দ্রুত এবং যার দৈনন্দিনকে শাসন করছে মেকি চিহ্নের সন্ত্রাস—তার কাছে নেতি ও নৈরাজ্যের উদ্ভট প্রতিসন্দর্ভ যোগান দেওয়াই কি সাহিত্যের কাজ? কবিতার হাল-হকিকৎ এই বিভ্রমের পরিসরে সবচেয়ে বেশি কূটাভাসময়। বিকারের ঔদ্ধত্য ও অবিশ্বাসের অহংকার শব্দাবলী থেকে শুষে নিচ্ছে অনুভূতির বর্ণমালা ; অভ্যাসের খোলস দিয়ে চালাকির প্রদর্শনী অব্যাহত রাখতে পারলেই হল। অনুভূতি কি সত্য নয় আর? দর্পণে প্রতিবিম্ব নিয়ে খেলছে আজকের খেলনা-মানুষেরা। বিয়োগপর্বের চিন্তাগুরু জাঁ বদ্রিলারকে তাই ভাবতে হয় বিভ্রমের প্রতিজগৎ নয়, ভ্রমকথার চতুর আবর্ত তৈরি করা নিয়ে। সত্য নয় শুধু, মিথ্যাও নির্বাসিত আজ বয়ান থেকে ; তাই পাঠকৃতি মানে গোলকধাঁধার সিঁড়ি। বদ্রিলার লেখেন, 'Today it is events which are neither true nor false and which play with their screens. You can no more isolate an event from its screen than in the past, you could isolate a passion from its mirror.' (Cool memories : 1994 : 65).

হয়তো এতটুকু নয় ; কিন্তু এর কাছাকাছি উচ্চারণ রয়েছে রণজিৎ দাসের কবিতায় (ডায়েরি থেকে ২)) 'সত্য কী, আমরা জানি না। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজের ছায়ার মতো। এই সত্যসন্দিগ্ধ চির জীবনে, মিথ্যাই শেষ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র নিঃসংশয় উপলব্ধি, সেই অর্থে আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য। আমাদের আশ্রয়।...খুব

সম্ভবত, আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি। জিন-এর গূঢ়তম সন্ধ্যাভাষায় হয়তো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যার সংজ্ঞা এবং ব্যবহারবিধি।' এই বয়ানে কবি সময়ক্লিষ্ট প্রতিবিম্বের মুখোমুখি যেন। শূন্যতার আনাচে কানাচে কাকতাড়ুয়ার মতো দৃশ্যমান যত বিলীয়মান মুহূর্তগুলি, সেইসব যতখানি ভ্রম ততখানি বাস্তব। ভাষার সপ্রতিভতা সত্ত্বেও চোখে পড়ে প্রচ্ছন্ন হাহাকার। কালবেলায় এই তো অর্জন মদান্ধ সভ্যতার। কবিতায় তাই বিষয় খুঁজতে হয় না এখন, ভাবতে হয় না প্রকরণ নিয়েও। আত্মতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার পুরনো জলবিভাজনরেখাও অচল হয়ে গেছে। এসময় আলাদা করে কবিতা লিখতে হয় না, প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ নিজেরাই কবিতায় বয়ান হয়ে ওঠে। ফলে সংযোজক সূত্রও খুঁজে নিতে হয় না। বিয়োগপর্বের সার্বিক অসংবদ্ধতা ও কেন্দ্রহীনতা নেতির বিন্যাসকেই বয়ান হিসেবে তৈরি করে নেয়। অর্থাৎ প্রতিবাচন লুকিয়ে থাকে বাচনেরই ভেতরে। যেমন রণজিতের 'টেলি খুশি' কবিতার প্রথম স্তবক : 'এক নতুন খুশি এসেছে আমাদের ঘরে। টেলিখুশি। টিভি-র পর্দা থেকে রকমারি পণ্যের চমকদার বিজ্ঞাপনগুলি ঘরময় ছড়িয়ে দিচ্ছে এই অদ্ভুত, রাংতা মোড়া খুশি। যাতে মেশানো আছে স্বপ্ন, মুখোশ, কোকেন, মোহর, ডাইনি এবং আলাদিন। তাই দেখে ঘরের মেয়ে পুরুষদের তো বটেই ঘরের বেড়ালটার পর্যন্ত হাসি হাসি মুখ। কারণ, মূলত নিরানন্দ মানুষের সংসারে, যে-কোনো খুশিই, খুশি।'

আধুনিকতাবাদের আরোহী পর্বে জীবনানন্দ লক্ষ করেছিলেন চিহ্নায়কের শৌর্য ও আমোদ; আর, অবরোহী পর্বের সূচনায় তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়েছিল কার্নিভালের হাসি ও তিক্ত শ্লেষ। আধুনিকতাবাদের প্রচ্ছায়া যখন বাংলা কবিতায় পড়তে শুরু করেছে, অন্তর্দাহ ও স্বগতোক্তি সাবলীল মিশে যাচ্ছে পরিহাস ও কোলাহলে। ভাঁড়, জ্যোতিষী এবং জহ্লাদ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একই পঙক্তিতে। ভ্রমকথারই এ এক বিশিষ্ট ধরন। সময়ের বাচন যতক্ষণ কবিদের কাছে ধরা দেয়, প্রতিবাচনের অন্তর্বয়নও মানিয়ে যায়। যেমন জয় গোস্বামী লেখেন ''হাসিগুলি, হাহাকারগুলির' (হাসি, হাসিগুলি, হাসিদের) সমান্তরাল অস্তিত্বের কথা। ক্রমশ বদলে যায় সময়ের অনুভব আর সেই সঙ্গে 'বারোভাতারী মৃত্তিকার পরিসর'কে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে কল্পনাপ্রতিভা হয়ে ওঠে যুগপৎ সুড়ঙ্গসন্ধানী ও মহাকাশচারী। বাস্তব অনায়াসে মিশে যায় প্রকল্পনায় ; প্রাগুক্ত আত্মজ্বলন (Self-ignition) ও আত্মসম্মোহন (Self-Seduction) এর উপযোগী পরাবিবরণ প্রতিবেদনে দখলদারি বিস্তার করে, ভাষার চলনও আমূল বদলে যায় :

'আমরা পান করি, আমরা প্রাণ করি মৃত্যুকে মৃত্যুকে? মৃত্যুকে?
আমরা নিঃশ্বাস ধরেছি, নিঃশ্বাস সৌরবল
আমরা নিঃশ্বাস, আমরা নিঃশ্বাস সীমিত হোম
আমরা আইবুড়ো চাকুরে দিদি তার যুবতী বোন
আমরা ঘরে ঘরে পঙ্গু বাপ আর অন্ধ ভাই
আমরা যা-ই বলি ব্রহ্ম তা-ই কাল ব্রহ্ম তাই বাল ব্রহ্ম তা-ই,
আমরা নিজেদের জায়গা চাই।'

উৎকেন্দ্রিক ও নিরবয়ব সময়ের মধ্যে আজকের কবি-সত্তা দেখতে পায় শুধু 'খোলা মরণ ফাঁদ' এবং লক্ষ করে কীভাবে মানুষ স্বয়ং মোড়ে-মোড়ে মরণ- ফাঁদ হয়ে উঠেছে। এসময় শবোত্থানের ; প্রতিসংস্কৃতি ও প্রতিজীবনের জারজ সন্তানেরা সব চর্ব্যচোষ্য সত্য মিথ্যা নির্বিচারে গিলে খাচ্ছে। কিন্তু সর্বব্যাপ্ত মোহিনী আড়াল অনতিক্রম্য বলে সময়ের কৃষ্ণবিবর কারো চোখেই পড়ছে না 'বিশ্বতানে মোহিছে চুম্বক'। প্রত্যেকের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে, মাটির তলায় লোহা ফুটছে। অর্থাৎ বাস্তবই প্রকল্পনা হয়ে উঠছে এখন। সমস্ত আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-স্বপ্ন প্রবল ভস্মের মুখে লুটিয়ে পড়ে যখন, প্রতিবাদহীন দিক-ভ্রান্ত মানুষ ওই ভস্মের নিচে লুকোতে যায় আর 'আমরা সবাই দুই হাতে ভয় ভস্ম খাই।' (ভুতুম ভগবান)

কেন সময়ের এই কথকতা তৈরি হচ্ছে আজ? কারণ, বিলুপ্তির আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে ত্রস্ত স্বয়ং কবিতা। সামাজিক মনস্তত্ত্ব জন্ম নেয় বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে। এই সূত্রে বদলে যায় সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও আঙ্গিক, মূল্যবোধ ও অন্বিষ্ট। বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী সমস্ত যুগে যা ঘটেছে, এখনো একই প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখছি। তবে কথাটা এইখানে যে এখন মানুষের মৌল পরিসরই আক্রান্ত। তাই ভাষা-চেতনা, সাহিত্য-বোধ সব কিছুই বিপন্ন। আমাদের চোখের সামনেই তো নিঃশব্দে ঝরে যাচ্ছে শৈশব ও কৈশোরের সারল্য, লাবণ্য ও নিবিড়তা। সহজ পাঠের সহজ আনন্দ এখন নির্মমভাবে নির্বাসিত। বৈদ্যুতিন গণ-মাধ্যমের অন্ধ প্রতিযোগিতায়, উৎপাদিত চিহ্নের সন্ত্রাসে আর ভোগ্যপণ্যের মাদকতায় কালো হয়ে গেছে আমাদের আকাশ। শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল প্রকরণ রূপান্তরিত হয়নি, নির্যাসও অন্তর্হিত। আমাদের সংস্কৃতির শেকড় উপড়ে ফেলছে বিশ্বপুঁজিবাদ। আর, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে প্রযুক্তি-সেবিত সামন্তবাদের অন্ধকার। রাষ্ট্রীয় প্রতাপের আনুকূল্যে আসমুদ্র হিমাচল এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। বাঙালি কবি-লিখিয়েরা জারজ-সংস্কৃতির প্রশ্রয়দাতা রাজনীতির কৃষ্ণবিবরকে শনাক্ত করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতেই তীব্র আত্মবিদারক শ্লেষে জয় লেখেন, আমরা সব বুদ্ধু সব ভূতুম ভগবান। এই সময়ের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সত্য, মিথ্যা, সন্দর্ভ, প্রতিসন্দর্ভ, প্রতিবেদন, ভ্রমকথা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস—সব কিছু একাকার হয়ে যাওয়া আর সব কিছু সহনীয় হয়ে যাওয়া। কিছুদিন আগেও কবি-লিখিয়েরা প্রতিবাদ করতেন, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন কেননা কোনো-না-কোনো ভাবে দায়বোধ পীড়িত করত তাঁদের। কিন্তু এখন নির্লিপ্ততা ও উদ্বেগহীনতা নৈরাজ্যকেই দার্শনিক সমর্থন দিয়ে যায়। এমন কী কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ধতা এত সর্বগ্রাসী যে পৌরসমাজ আর রাজনৈতিক সমাজের পশ্চাৎগতিও তাঁদের কোথাও সংলগ্ন করে তোলে না। বরং আধিপত্যবাদীদের চতুর কৃৎকৌশল সম্পর্কে উদাসীন থেকে তাঁরা অনায়াসে প্রতিগতির শিবিরে যোগ দিতে পারেন। এখনকার বয়ানে তাই আত্মপ্রতারক মোহিনী আড়াল অতি সহজেই বিমানবায়ন প্রক্রিয়ার পালে হাওয়া দিচ্ছে।

আমরা কি লক্ষ করেছি প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বিজ্ঞাপনে কত সাবলীল ভাবে

মান্যতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে? বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে রুচিবিকৃতির উন্মত্ত প্রদর্শনী থেকে সাহস সঞ্চয় করে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যপত্রগুলিও নিজেদের বিজ্ঞাপনের ভাষা পাল্টে দিচ্ছে। স্বভাবত বিজ্ঞাপনী মনস্তত্ত্ব অবধারিত ভাবে এসে পড়ছে সাহিত্যের বয়ানেও। কোনো কিছুতেই কারো এসে যায় না যেন। আসলে রুচিবিকার আধুনিকোত্তর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার অভিজ্ঞান। তাই কিছুদিন আগে হাবেরমাস যে বৈধতাজনিত সংকটের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, ইদানীং সেসব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে সব কিছু কেননা আমাদের মন এখন জগদ্দল পাথর। সেই পাথরে শ্যাওলা জমতে পারে মাত্র, কোনো রেখার আঁচড় পড়ে না। এই আরোপিত মান্যতার ভেতরে বিপুল নিরবয়ব ধূসর শূন্যতা তবু চোখে পড়ে যায় কোনো কোনো কবির। জয় গোস্বামী তাই লেখেন :

'আগুন নিবতে ছাই নেই আর পাথুরে দেওয়াল নেই শুধু দুই দিকে ছড়ানো শূন্য, শুধু দশদিকে ছড়ানো বিরাট একটা কালো দশ দিক, মাঝে মাঝে বিন্দুরা টুপটুপ করে জ্বলছে' (নর্তক)।

এ হল নিরালম্ব সময়ের বার্তা যখনকার দস্তুর হল : 'To lose the original, but find its double, to lose face, but recover one's image, to lose innocence, but recover one's shadow.' (জাঁ বদ্রিলার : প্রাগুক্ত : ৬৪)

৩

আজ উপন্যাসকে গিলে খাচ্ছে পপসাহিত্যের আন্তর্জাতিক দানব এবং মেগা-সিরিয়ালের ঝকঝকে ভিস্যুয়াল। ছোটগল্পকে শুষে নিচ্ছে বিনোদনের রগরগে কেচ্ছা আর বিজ্ঞাপনের মায়াবী নাট্য-মুহূর্তের বিন্যাস। শিশুসাহিত্যের সজীব ও সংবেদনশীল বয়ান কার্টুন নেটওয়ার্ক-এর যান্ত্রিকতায় মুছে যেতে বসেছে আজ। ছেলেবেলায় যে-সমস্ত গল্প গাথা, লোকায়ত ঐতিহ্যের মণিমুক্তো, কল্পনার সহজ সৌন্দর্য সাংস্কৃতিক সত্তাকে কুসুমিত করত ; আজকের প্রজন্মে তাদের অনুপস্থিতি খুব বেশি প্রকট। শৈশব ও কৈশোরে যাদের মন ফুলের মতো তাজা ও নিষ্কলুষ থাকে, অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের মধ্যে বিকারের সংক্রমণ ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে যৌনতা ও সন্ত্রাসের অন্তর্ঘাত দিয়ে। সাহিত্যের উৎসুক গ্রহীতা হওয়ার যে-প্রক্রিয়া এতদিন শিশুকালেই শুরু হয়েছে, ইদানীং তা ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে আরম্ভ হওয়ার আগেই। সর্বগ্রাসী ভোগ্যপণ্যের মাদকে এবং অন্ধ প্রতিযোগিতার মোহে যে-সব আধ্যাত্মিক মানুষের কাঠামো তৈরি হচ্ছে, তাদের ভয়াবহ বৃত্তবন্দি অবস্থানে সাহিত্য ও শিল্পের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের প্রজাতি কল্পবিজ্ঞানের ক্রমোৎকর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক কালে AXN নামক টিভি চ্যানেল যেভাবে কল্পবিজ্ঞানকে বিকৃত করছে এবং উৎকট করছে বিমানবায়ন প্রক্রিয়াকে কম্প্যুটার প্রযুক্তির সাহায্যে জান্তবতা-হিংস্রতা-অলৌকিকতার ককটেলে রূপান্তরিত করেছে, তা সরাসরি আমাদের সূক্ষ্ম সংবেদনা, মানবিক ইতিহাস ও

কল্পনার পরিসরকে চূড়ান্তভাবে মুছে ফেলছে। সূক্ষ্মতা, কল্পনা ও মানবিকতার উপর এমন বীভৎস আক্রমণ আগে কখনো দেখা যায়নি।

সব মিলিয়ে, এ কোন্ পৃথিবীর ছবি যেখানে প্রতিবাস্তব ও প্রতিসন্দর্ভের মায়া আমাদের এতদিনকার সমস্ত নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক উপার্জনকে নিরালম্ব করে দিচ্ছে? আধুনিকতাবাদ মানুষকে যদিও নিঃসঙ্গ করেছিল, তবুও সেই নিঃসঙ্গ মানুষের নিজস্ব নির্জনতা লুপ্ত হয়ে যায় নি। কিন্তু যন্ত্র-প্রযুক্তি দ্বারা উৎপাদিত মাদকগ্রস্ত প্রতিজগতে আধুনিকোত্তরবাদ সেই নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতার অবকাশও রাখেনি কোথাও। কর্কশ কোলাহলের স্থূল সন্ত্রাসে অবয়বহীন ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সব সূক্ষ্মতা, সব স্বপ্ন, সব কল্পনা। একুশ শতক বা তৃতীয় সহস্রাব্দের নামে তৃতীয় বিশ্বের যেসব আত্মবিস্মৃত মানুষজনেরা গন্তব্যহীন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা টেরও পাচ্ছেন না কীভাবে তাঁদের শিথিল মুঠো থেকে বালির মতো ঝুরঝুর করে পড়ে যাচ্ছে যাবতীয় সংকল্প ও উদ্যম, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টি ও নন্দন। প্রথম দুনিয়ার বহু হাত-ফেরতা সিকি আধুলি নিয়ে কেউ কেউ মশগুল হয়ে পড়ছেন। নিজেদের যথাপ্রাপ্ত পরিসর ও পরম্পরার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে উপন্যাস-ছোটগল্প-কবিতার প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইছেন। ফলে তাঁদের রচনা-প্রয়াস হয়ে উঠছে কৃষ্ণবিবরের দৃষ্টান্ত, যা বারবার, এমনকী তাঁরা নিজেরাও পুনরাবৃত্ত করতে পারছেন না।

তাছাড়া আরো একটি মৌলিক প্রশ্নও উঠে আসছে এখন। আধুনিকতাবাদ লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনচর্যাকে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছিল, ছড়িয়েছিল পরিশীলিত নাগরিকতার মোহ। আধুনিকোত্তরবাদ সেই মোহকে প্রযুক্তি-সন্ত্রাসের সাহায্যে সময়-নিরপেক্ষ, পরিসর-নিরপেক্ষ অধিবাস্তবের গোলকধাঁধায় পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। স্পন্দমান জীবনের কথকতা নয় আর, ঈপ্সিত এখন সেই সর্বাত্মক ভোগবাদ যার প্রভাবে দিন-রাত্রি চেতনা-অবচেতনা-ভূত-ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়। আরো একটি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াও বিষাক্ত ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। গণমাধ্যমের বলয় বিশ্বায়িত হওয়ার ফলে লোকসংস্কৃতির উৎসভূমি খরার দাবদাহে পোড়া জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে দ্রুত।

আজ যাঁরা সাহসী মুঠোয় ছোট পত্রিকার পতাকা ধরে রাখতে চাইবেন, তাঁদের লড়াই অনেক বেশি কঠিন। কেননা তাঁরা বাস করছেন জাঁ বদ্রিলার কথিত 'Hyper-real' জগতে। যেখানে 'The model comes first and its constitutive role is invisible because all one sees are instuntiations of models' (1991 : 83)। বিশ্বপুঁজিবাদের কুটিল ছায়ায় আবিল ভারতবর্ষীয় সমাজ ওই অধিবাস্তবের দ্বারা আক্রান্ত। তাই আমাদের চিন্তার ধরন পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছি না, কখন কীভাবে নিঃশব্দ পদচারণায় বিদূষণ আমাদের বোধ-বুদ্ধিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিচ্ছে। মোহিনী আড়াল ভেদ করার দ্রষ্টাচক্ষু আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ভ্রমকথাকেও বরণ করে নিচ্ছি প্রাগুক্ত 'মডেল' বা নিয়ন্তা আকল্প হিসেবে। এই আকল্পের সাংস্কৃতিক রাজনীতি অর্থাৎ আধিপত্যবাদের কূটকৌশল সুস্মিতা সেন, ঐশ্বর্য রাই, লারা দত্তদের একাদিক্রমে

বিশ্বসুন্দরী হিসেবে ঘোষণা করার মধ্যে ব্যক্ত হয়। কারণ সর্বাত্মক মুক্তিকামী নারীচেতনাকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে এবং পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ় প্রোথিত করার জন্যে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের উপর নতুন বিউটি মিথ চাপিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। একটু আগে যাকে বিষাক্ত ছত্রাক বলেছি, তার বিপুল সংক্রমণ বুঝতে পারি যখন আসামের বরাক উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। সমানুপাতিক হারে হুহু করে বেড়ে যায় বিলিতি মদের কেনাবেচা ও যৌন সন্ত্রাস।

ওই একই আকল্পের সূত্রে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে চরম আদিখ্যেতা করা হয়। সবই পণ্যায়নের স্বার্থে। সাহিত্যের নতুন বিধি-বিন্যাস তৈরি হতে থাকে তারই অদৃশ্য প্রেরণায়। নইলে অরুন্ধতী রায় থেকে ঝুম্পা লাহিড়ী রাতারাতি বেস্ট সেলার হয়ে যেতেন না। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি। একদিকে কম্পিউটার প্রযুক্তির মায়ায় ভিস্যুয়ালের সন্ত্রাস ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী এবং পাঠাভ্যাস ভ্রান্ত পথে মরীচিকা-প্রত্যাশী, অন্যদিকে সাহিত্যসংবিদ ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জনে যাওয়ার পক্ষে। মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি-সংস্কার-বিবেক। অধিবাস্তব জগতে আরম্ভ নেই, বিকশিত হওয়া বা করাও নেই। এই অধিবাস্তবতায় 'more and more areas of social life are reproductions of models organized into a system of models and codes' (তদেব)। আসলে তো চিহ্নায়কও নেই, সামাজিকতাও নেই এখন। আছে কেবল কিছু বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অবভাস। বদ্রিলার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'Today it is quotidian reality in its entirety-political, social, historical and economic that from now on incorporates the simulatory dimension of hyperrealism' (Simulations : 147).

৪

এই কালবেলায় প্রতিদিনকার জীবন যখন ক্রমশ বেশি করে অধিবাস্তব হয়ে উঠেছে, সাহিত্যের সমস্ত প্রতিবেদনকেই তৈরি হতে হচ্ছে যুদ্ধের জন্যে। আক্ষরিক এবং রূপক দুই অর্থেই জীবন মূলত যুদ্ধক্ষেত্র। পাঠকৃতিও তাই। কোনো-এক মুহূর্তের চিহ্নায়কের আগ্রাসনে পূর্ববর্তী মুহূর্তের চিহ্নায়ক লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যেমন, তেমনি সেও তো আগামী সমস্ত অস্থির চিহ্নায়কের পক্ষে ভবিষ্যৎ অতীত মাত্র। চূড়ান্ত অস্থির ও অনিশ্চিত এই পরিসরে সত্যভ্রম ও প্রতিবাচনের কাছে কি হার মানবেন ছোট পত্রিকার যোদ্ধারা? সমস্ত পুরনো আকল্প নস্যাৎ করে কালবেলা যদি ভ্রমকথার বুদ্বুদমালা উপস্থাপিত করে, তাও তো এক আকল্পই। সমস্ত ধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও সাহিত্যকে দাঁড়াতে দেখি জটিল জিজ্ঞাসায়, আত্মমন্থনে। সবাই নিশ্চয় চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন না। হয়তো বা কেউ কেউ আবার আবর্তই তৈরি করেন কেবল আর নিজেদের অগোচরে নব্য স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে ওঠেন। তবু লিখন-প্রক্রিয়ার বিনির্মাণ অব্যাহত থাকে। সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রশ্ন বড়ো নয়। রবিশঙ্কর বল, মধুময় পাল, স্বপন সেন যখন তাঁদের বয়ানে প্রতিসন্দর্ভকেও গ্রথিত

করেন এবং অন্তর্বস্তু ও প্রকরণে সময় ও পরিসরের ভেতরকার শূন্যায়তনগুলি খনন করেন—তাতে কেবল আধুনিকতাবাদী অনন্বয়ের বিন্যাস থাকে না। তেমনি মলয় রায়চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী, উদয়ন ঘোষদের সন্দর্ভেও দেখি কৃষ্ণবিবরের নানা আয়তন। সব মিলিয়েই তৈরি হয় কালবেলার ভ্রমকথা।

মোহিনী আড়াল মানুষের স্বযাচিত নিয়তি : একথা লিখব না। বিভ্রমের সামাজিক ও ঐতিহাসিক উৎস শনাক্ত করাই কবি-লিখিয়েদের দায় এখন। আজকের বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব দুনিয়ায় প্রতিটি বস্তুই আগ্রাসী পুঁজির Fetish হয়ে দাঁড়িয়েছে (তদেব : ১৫২)। ছলনা-জালে সৃষ্টির পথ আরো আকীর্ণ এখন ; তাই বলে কি ভ্রমকথার বৈধতা খুঁজবে সাহিত্য?

চুল-দাঁত-নখ-চোখ-ঠোঁট-ত্বক এবং অবশ্যই শরীরী (নারী শরীরের) অনুষঙ্গ অধিবাস্তবের নানা বিভঙ্গ। আমাদের নিভৃত প্রেম, দাম্পত্য কিংবা মাতৃত্ব ও বন্ধুতা সমস্তই এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বজোড়া হাটের হট্টরোলের মাঝখানে। এইসবই এখন বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব। এই প্রেক্ষিতে তবু কবি-লিখিয়েদের ভাবতে হচ্ছে লেখার নতুন প্রকরণের কথা, জীবনের নতুন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্যের কথা, সত্তার অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞান-তাত্ত্বিক সন্ধানের কথা। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই যেন চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে সব। এখন যেন আকারহীন, চরিত্রহীন, বর্ণহীন, লক্ষ্যহীন স্রোতের তোড়ে মুছে যাচ্ছে সব। আলো এবং অন্ধকারের দ্বৈততা সম্পর্কেও যখন দ্বিধা দেখা দেয়, কী করবেন ছোট পত্রিকার আপসহীন যোদ্ধারা?

যেভাবে যন্ত্রবদ্ধ জীবনে সংকেত, চিহ্ন ও প্রতিবিম্বের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু, বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার সমস্ত আকল্পই অনিকেত হয়ে পড়ছে। ঘরে-ঘরে ঢুকে পড়ছে আজ লোভ-লালসা বিকৃত আকাঙ্ক্ষার মারীবীজ। অনতিসাম্প্রতিক কৌন বনেগা ক্রোড়পতির নির্লজ্জ জুয়াখেলা প্রচারমাধ্যমের দৌলতে অধিবাস্তবের নগ্ন আগ্রাসনকে অবারিত করে তুলেছে। এ তো আমাদের কালবেলারই অভিব্যক্তি যখন এদেশের যাবতীয় অসংহতি যাদুবলে মুছে দেয় রাঘববোয়াল রুপার্ট মার্ডুকের সাইবার মাদক। ছায়াছবির মায়জগতের সম্মোহক ব্যক্তিত্ব হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার চেয়েও ঢের বেশি দ্রুততায় ও দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণ করে ভারতবাসীর মগজ ও সময়। বিনোদনের রাজনীতি বিভ্রান্ত দেশবাসীদের বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কি এই ক্রান্তিকালের সাহিত্য-যোদ্ধারা এড়িয়ে যেতে পারেন? কে অস্বীকার করতে পারে যে 'The cool universe of digitality has absorbed the world of metaphor and metonymy' !

নিভন্ত এ চুল্লিতে সই একটু আগুন দে

ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে। ইতিহাস পুড়ছে। সভ্যতা পুড়ছে। সংস্কৃতি পুড়ছে। দাউ দাউ আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে এতদিনকার সমস্ত উপার্জন। সব কিছু ইন্ধন এখন। আসলে সময় নিজেই দাহ্য, নিজেই দাহক। পরিণাম বলে কিছুই নেই। পরিণাম এক বিভ্রম মাত্র, পরিণাম এক প্রহসন। ধারালো কুয়াশা ছেয়ে ফেলেছে চরাচর। তাই যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা। ইতিহাসের মৃত্যুর কথা বলে, সংস্কৃতির মৃত্যুর কথা বলে, মতাদর্শের মৃত্যুর কথা বলে, মানুষের মৃত্যুর কথা বলে। মুখ নয় শুধু, গোটা অবয়ব ঢেকে যাচ্ছে ঝাঁ-চক্‌চক্‌ বিজ্ঞাপনে। মুখ নয় শুধু, মায়াবী আরশিতে চলে মুখোসের দেখাদেখি। জানাশোনা নয়, স্রেফ তাকিয়ে থাকা। কারণ, জানারও মৃত্যু হয়ে গেছে। মানুষ যে-দুনিয়ায় অস্তিত্বকেও প্রত্নতত্ত্বের বিষয় করে তোলে—সেখানে নির্দিষ্ট অবস্থান বলে কিছু থাকতে পারে না। সিচ্যুয়েশন নেই, নেই সিচ্যুয়েটেড্‌নেস। অতএব নেই সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকারের দ্বৈততা।

তাহলে, এখন প্রত্যাশাও নেই কোথাও। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কেবল জরাজীর্ণ অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠানিকতা। লক্ষ্য নেই কিছু, যাত্রাও নেই কোথাও। আসছে-আসছে ভাবতে-ভাবতে হৈ হৈ করে নয়, গড়াতে-গড়াতে চলে এল এবং গেল ধাঁধাছড়ানো ২০০০ সাল। নতুন অ্যালিসেরা সব চলেছে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে, আয়নার বাইরে থেকে আয়নার ভেতরে। বাস্তব ধুলোমাটি ঢাকা রইল পেছনে। এখন থেকে সবই কুহকের বাস্তবতা। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীর মতো ঘোরের ভেতরে চলে যাব সবাই। যা আছে সমস্ত বোর্হেসের লেবিরিনথ : স্তরের পর স্তর, সিঁড়ির পরে সিঁড়ি। বাস্তব থেকে ছুটি নিয়ে কুহকের গোলকধাঁধায় মিশে যাব। সামনে আছে ইশারা অবিরত : ক্লোনিং, কসমেটিক সার্জারি, সেক্স-ডল, ডেনিম-রেমণ্ড-পিটার ইংল্যাণ্ড দিয়ে মোড়া আর প্রায়-নগ্ন লাস্যময়ী তরুণী পরিবৃত সম্পূর্ণ মানুষের নতুন আধুনিকোত্তর চিহ্নায়ক, শৌর্য ও সাফল্যের নব্য চিহ্নায়ন প্রকরণের প্লাবন। এ এক বিকল্প জীবনের পাঠ। এই পাঠের জন্যে আমাদের তৈরি করে নিচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি যাদের দাপটে অতি দ্রুত মুছে যাচ্ছে রাষ্ট্র। সার্বভৌমত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ইতোমধ্যে প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে পড়েছে।

'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি/আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি'—এ গানের আদি তাৎপর্য যা-ই থাকুক, এখন তা নয়া উপনিবেশবাদের জালে মাছির মতো বন্দী ভারতরাষ্ট্রের মর্মগাথা। হয়তো এ ভাষাও অতীতের ভাষা।

কারণ, চার অধ্যায়ের এলা যেমন অতীনকে বলেছিল—তেমনি তো আমাদের দেশের বর্তমান কর্ণধারেরাও রাষ্ট্রকে বিশ্বপুঁজিবাদের স্বেচ্ছাবৃত মুৎসুদ্দি করে তুলে দিবারাত্র এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন : 'দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও এই নাও।' দুয়ার-ভেঙে এসে যাচ্ছেন জ্যোর্তিময় পশ্চিমীরা : প্রথম গেছে লজ্জা এবার যাবে একে একে সমস্ত ভূষণ। সবেমাত্র গেল বীমাশিল্প, তারপর যাবে ব্যাঙ্কিং। না, মুৎসুদ্দি রাষ্ট্র নিজের বলে কিচ্ছু রাখবে না আর। 'তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি/সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী'—এই তো গাইছেন রাষ্ট্রনায়কের ছদ্মবেশে ইজারাদার মন্‌সবদারেরা। মার্কিনী শাহানশাহ গোটা দুনিয়ার ইজারা নিয়েছেন; তাঁর রক্তচক্ষু ও ভ্রূভঙ্গে তৈরি হচ্ছে কত ইরাক-বসনিয়া-চেচেনিয়া-কারগিল-ইন্দোনেশিয়া-আফগানিস্তানের রঙ্গভূমি। হর্ষদ মেহেতা-নরসিমা রাও-মনমোহন সিং মশায়েরা পালাগানের সূত্রধার ছিলেন, তারপর নাচনকোঁদন করে ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে মঞ্চে এসে গেলেন স্বদেশি নামাবলী পরা পুরুতের দল। এঁরা একদিকে রুপার্ট মারডুকের মতো তিমিঙ্গিলদের কাছে তুলে দিয়েছেন তথ্যবিনোদনের কামধেনু, অন্যদিকে ত্রিশূলধারী শেয়ালদের লেলিয়ে দিচ্ছেন মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে। বিশুদ্ধ স্বদেশি মতে চরণ শাহ সতী হলো।

অযোধ্যায়-কাশীতে-মথুরায়-মোচ্ছব আবার লাগবে কি?

উলঙ্গের দেশে পোষাকের প্রয়োজন কী! একদিকে সামন্তবাদের অঘোরপন্থা ওঁ নমঃ শিবায়, শ্রী শ্রী হনুমান জাতীয় অন্তহীন ভিস্যুয়ালের সন্ত্রাসে মনকে পাথর করে দিচ্ছে, অন্যদিকে আধুনিকোত্তর প্রতিনন্দন কম্পিউটার প্রযুক্তিতে ভর করে বিজ্ঞানকেও বিভ্রম বলে প্রতিপন্ন করছে। অজস্র অধিবাস্তব বিদেশি ছবির মধ্য দিয়ে (যেমন ইণ্ডিপেণ্ডেস ডে, টার্মিনেটর, ফারস্কেপ, নাইটম্যান ইত্যাদি) দর্শক একসময় অসম্ভাব্য ভবিষ্যতের কৃষ্ণবিবরে ঢুকে যায় এবং যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে অসম্পূর্ণ, রিক্ত, পরিত্যাজ্য বলে মনে হতে থাকে তার। শনির থানে ভিড় বাড়তে থাকে প্রতিনিয়ত, মসজিদে-গুরুদ্বারে উপচে পড়ে বাঘে-গরুতে সহাবস্থান। এত সব উদ্ভটের পরস্পর সন্নিবেশ, কাদের স্বার্থে মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে গত দশ বছরে, এ নিয়ে প্রশ্ন জাগে না কোনো। কারণ, আমরা প্রশ্ন করতে শিখি না এবং প্রশ্ন করতে দেওয়াও হয় না আমাদের। সব কিছু মান্যতা পেয়ে যায় বলে অন্তরে-বাহিরে আমাদের উৎকট নগ্নতাও প্রতিভাবাদর্শের সমর্থন পেয়ে যায়। যেভাবে মহাকাশযান পৃথিবীর অভিকর্ষ পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতায় দূর মহাশূন্যে পৌঁছে যায়, তেমনি প্রচণ্ড এসকেপ ভেলোসিটি নিয়ে আমরাও শতাব্দীর প্রদোষবেলায় ইতিহাস থেকে, সত্য থেকে, বাস্তবতা থেকে, সংস্কৃতি থেকে নামহীন রূপহীন চরিত্রহীন শূন্যতায় নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। এখন আমরা প্রতিমুহূর্তে চিহ্নায়ক তৈরি করছি এবং ভেঙে ফেলছি। স্মৃতির ভারমুক্ত হয়ে সত্তার দায়মুক্ত হয়ে জমিয়ে তুলছি শুধু পুঞ্জপুঞ্জ অভ্যাসের ছাই। বর্তমানে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে নিমিষে ভবিষ্যৎ অতীত হয়ে যাচ্ছে। যা যা হয়ে যাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসে ক্রমাগত পেছনপানে হাঁটছে যা যা আছে এবং যা যা হতে পারত।

কিন্তু পুঞ্জ-পুঞ্জ ছাইয়ের মধ্যে কোথাও কি নেই এতটুকু আগুনের ইশারা? প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস আরো বিকৃত, আরো আরো জরাগ্রস্ত হচ্ছে বলে কি আশ্চর্য থাকবে না কোথাও? আধুনিকোত্তর প্রতিজীবনের উদ্ধত মহড়া সত্ত্বেও সত্যের দ্বিবাচনিক উপস্থিতি তো অনস্বীকার্য। সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল ফুটবে নয়, ফুল ফুটছে। আছে, আছে, আশ্চর্য আছে, সংস্কৃতির কুসুম আছে। বিশ্বপুঁজিবাদ, বিশ্বমৌলবাদ, মরিয়াও-না-মরতে-থাকা সামন্তবাদের গাঁটছড়া সত্ত্বেও নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো নিঃসঙ্গ, পবিত্র, জেদি, অধ্যবসায়ী আগুন জ্বলছে। জেগে থাকার, জাগিয়ে রাখার আগুন। তা যদি না হত, শতচ্ছিন্ন বাঙালির ছন্নছাড়া ভুবনে নিশ্চয় ছোট পত্রিকার সমিধ আহরণ অব্যাহত থাকত না। আনখশির বিদূষণের উন্মত্ততা সত্ত্বেও পণ্যসর্বস্বতা-ভোগবাদ-কপটতা-অসূয়ার চক্রব্যূহ পেরিয়ে গিয়ে প্রতিস্রোত তৈরির দৃষ্টান্ত দেখা যেত না। পুরুলিয়া-বালুরঘাট-মেদিনীপুর- ধানবাদ- আগরতলা-গৌহাটি-শিলচর-বগুড়া-সিলেট-চট্টগ্রাম-রাজশাহ-বরিশাল-গাইবান্ধার মতো জনপদে বেরোত না প্রতিস্রোতপন্থী ছোট কাগজ। স্বাতন্ত্র্যেই তাদের অভিজ্ঞান, তাদের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ। কেননা লিটল ম্যাগাজিনের সেনানীদের চেয়ে বেশি কে জানে আর, সমস্ত তাৎপর্যই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়! লেখা মানে যুদ্ধ, পত্রিকা মানে যুদ্ধক্ষেত্র; এই যুদ্ধে সিসিফাসের মতো অধ্যবসায় আছে শুধু, কেবলই পাথর চুড়োয় তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া নতুনভাবে শুরু করে যাওয়া। একটি সংখ্যার প্রকাশ মানে পরবর্তী সংখ্যার জন্য যুদ্ধাস্ত্রে শান দিতে শুরু করা, কেবলই এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাওয়া। এই যাওয়ার নাম জীবনানুশীলন, যার আরেক নাম সংস্কৃতি।

এইজন্যে শিলচরে প্রতিস্রোতের তরুণেরা এখানে মুঠোয় মশাল ধরে রেখেছেন। অতন্দ্র অনিশ শতাব্দী স্বপ্নিল উদর্ক শতক্রতু ইত্যাদির অগ্ন্যাধান ব্যর্থ হয়নি। অন্ধকার যখন গাঢ়তম, বরাক উপত্যকার বাঙালিরা প্রতিস্রোত ও সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন জেগে থাকার প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ চিহ্নায়ক। পরিসরিক্ত অবস্থানেও উত্তর পূর্বের বাঙালিরা 'একা এবং কয়েকজন', 'পূর্বদেশ গল্পপত্র', 'পাহাড়িয়া', 'মুখাবয়ব'-এর মতো সময়সেনানীর যুদ্ধ-বার্তা ঘোষণা করতে পারেন। মহানাগরিক কলকাতায় এবং ঢাকায় পান্থপাদপ খোঁজার প্রয়োজন নেই এখন। আমাদের নিভন্ত চুল্লিতে আগুন যোগান দিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের দিকে তাকিয়ে জীবন ও পাঠকৃতির ভ্রান্ত পাঠ থেকে আমরা নিয়ত জায়মান মুক্তপাঠে যাওয়ার সংকেত বুঝে নিতে পারছি। সমীরণ মজুমদার (অমৃতলোক), আফিফ ফুয়াদ (দিবারাত্রির কাব্য), এজাজ ইউসুফী (লিরিক), মোস্তাক আহমেদ দীন (বিকাশ), ফারুক সিদ্দিকী (বিপ্রতীপ), সরকার আশরাফ (নিসর্গ), অমিত দাস (উত্তরাধিকার), সুবল সামন্ত (এবং মুশায়েরা), অঞ্জন সেন (গাঙ্গেয়পত্র), উৎপল ভট্টাচার্য (কবিতীর্থ), পাঠকৃতি (শুভেন্দু ইমাম) এবং এরকম আরো অনেক যোদ্ধা শৌর্য ও লাবণ্যের যুগলবন্দি অক্ষুণ্ণ রাখছেন। কত ভিন্নতা তাঁদের অবস্থানে। আধুনিকোত্তর কালবেলায় দাঁড়িয়ে তাঁদের সামূহিক উপস্থিতি আর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াণ-পটভূমিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝতে পারি।

'কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'—জীবনানন্দের এই গহন উপলব্ধি হয়েছিল অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের আগ্রাসী চোরাবালি লক্ষ করে। আমিষ অন্ধকারে কত শত সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছিলেন তিনি, ক্লান্ত পৃথিবীর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখে পড়েছিল শতশত শূকরীর প্রসব-বেদনার আড়ম্বর। জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বিবাচনিকতা পুনরাবিষ্কারে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। আলো যে গভীরতর হয় অন্ধকারে এবং মানুষের মৃত্যু হলেও মানব বেঁচে থাকে—অলঙ্ঘ্য এই সত্য তাঁর উচ্চারণে ফিরে ফিরে এসেছে তাই। আধুনিকোত্তর পর্যায়ের ক্রমবর্ধমান গ্লানির আত্মবিদারক হাহাকারে দীর্ণ হতে হতে পুনঃপাঠ করতে পারি জীবনানন্দের সময়মন্থনকেও। নিশ্চিত খুঁজে পাব আমরা অম্লান বিশল্যকরণী। দেখব, হাজারবার ইতিহাসকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও তা তথ্যের কঙ্কালমাত্র নয়। এখনো ইতিহাস খুঁড়লে পাওয়া যায় শত শত জলঝর্নার ধ্বনি, উত্তরায়ণ মনস্কতার সংকেত। জীবনানন্দ যে উত্তর-ব্যক্তিসত্তার কথা বলেছিলেন, এখনই তো তার যথার্থ তাৎপর্য ও গঠনশৈলী আবিষ্কার করার সময়। শুধু দ্রষ্টা চক্ষু চাই আজ। তেমন চোখ যা শুধু তাকিয়ে থাকার জন্যে নয়, দেখার জন্যে। হয়তো তখন অনেক অদৃশ্য পর্দা সরে যাবে। অতিপরিচয়ের অভ্যস্ততা যে কুয়াশার আড়াল তৈরি করে, তা সরিয়ে দিয়ে পুরনো মুখের মধ্য থেকে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে নতুন অবয়ব। নতুন সত্য, নতুন উপলব্ধি। দেখব, উত্তর-ব্যক্তিসত্তার প্রস্তুতি রয়েছে আমাদের খুব কাছাকাছি। বুঝব, সংস্কৃতি জীবন সংগঠক, উন্মোচন ও প্রসারণ তার স্বভাবধর্ম।

অবস্থানগত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে কোনো-এক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যখন বালুরঘাটে ত্রিতীর্থের মতো অসামান্য লড়াকু নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন কিংবা ওই একই শহরে অজিতেশ ভট্টাচার্য ৩৪ বছর ধরে মধুপর্ণীর মতো সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন—তাঁরা নিশ্চয় উত্তর-ব্যক্তিসত্তার প্রতিভূ হিসেবে জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেন। তেমনি বরাক উপত্যকার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ শহর হাইলাকান্দিতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য' তিন দশকব্যাপী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হয়। বাঙালির বিভিন্ন জনপদে সমীরণ মজুমদার, অখিল দত্ত, দেবব্রত দেব, উত্তম দাশ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরকার আশরাফ, ফারুক সিদ্দিকী, বিভাস চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অঞ্জন সেন, হাসান আজিজুল হকেরা প্রমাণ করছেন, অনেকান্তিক মৃত্যু-উপত্যকায় পারাপারহীন সন্ধ্যা নেমে এলেও মানুষ অপরাজেয়। ইতিহাস ও সভ্যতা যতই পুড়ে যাক, উত্তরব্যক্তিসত্তা অজর অক্ষয়। এইজন্যে শিলচরের মতো প্রান্তিক জনপদেও আমাদের উদ্যোগহীন স্বপ্নহীন সংকল্পহীন মেকি অস্তিত্বের স্থবিরতাকে সমূহ লজ্জিত করে ৭২ বছরের চিরতরুণ মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য শরীরেরপ্রতিটি বিভঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন নাচের ললিত ছন্দ। ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্প-ভাবনার সুষম সমন্বয়ে তাঁর প্রতিটি সঞ্চালনে প্রতি মুদ্রায় নাচ নয়, আসলে জীবনের অফুরান সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা পুষ্পিত হয়ে ওঠে। অবক্ষয়বাদের সমস্ত কৃৎকৌশলকে পরাভূত করে মুকুন্দদাস আমাদের ফিরিয়ে দেন যেন জীবনকে নতুনভাবে ভালোবাসার জোর, বিশ্বাসের শক্তি,

দেখার ক্ষমতা। মানুষ যে আজও কত বিস্ময়ের দীপাধার, নৃত্যগুরুর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনে সেই বার্তা উঠে আসে। আমরা তখন পাশের মানুষটিকে মানবিক স্পর্ধায় বলতে পারি, আছে, আলো আছে সব অবভাস পেরিয়ে।

এমন উচ্চারণে স্থিতধী আত্মদীপ হওয়ার নামই তো সংস্কৃতি। এই হওয়ার আর হয়ে ওঠার কোনো সমাপ্তিবিন্দু নেই, নতুন নতুন আরম্ভ আছে শুধু। সব ধরনের ধারাবাহিকতা মুছে ফেলার সন্ত্রাসী চক্রান্ত সত্ত্বেও ফিরে দেখা আছে। বাঙালির তিন ভুবনে রূপকথার রাক্ষসখোক্কসদের নিদালির মন্ত্র আধুনিকোত্তর আঙ্গিকে ব্যবহৃত হচ্ছে যখন, ঘুমঘোরে অনেকের আত্মা আচ্ছন্ন। ধর্মের মাদক, আঞ্চলিকতার মাদক, বিশ্বায়নের মাদক সুস্বাদু ঘুমের ঘেরাটোপ তৈরি করে দিয়েছে আমাদের জন্যে। আমরা আজ জানি না, আমরা কী এবং কারা! 'কী আমার পরিচয়, মা' এই অবোধ প্রশ্ন জাগে না বলে মাঝরাতে বারবার ভিৎহারা হতে হয় আমাদের। পাঠ দিতে পারে, দেয় শুধু সংস্কৃতি! বিভাস চক্রবর্তী 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' কিংবা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'দেবাংশী' নাটকে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণকে প্রয়োগের মৌল আধেয় করে তোলেন আর সেলিম আলদীন পরম্পরার নিবিষ্ট পুনঃপাঠে নাট্যবস্তুকে আধারিত করেন—বুঝে নিই, আমরা যা ছিলাম তাতেই তাঁরা অস্তিত্বের নির্যাস সন্ধান করেন। শওকত আলী যখন তন্নিষ্ঠ আন্তরিকতায় তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসবীজ আহরণ করে 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' লেখেন কিংবা সেলিনা হোসেন 'নীল ময়ূরীর যৌবন' লেখার জন্যে চর্যাপদের সময় ও পরিসরকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করেন—বুঝি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতিবেদনে শেষ কথা নেই কোনো। আছে শুধু প্রাক্তন আলোক-উৎস থেকে দীপ জ্বালানো নবীন অধ্যবসায়। আর, এভাবে নিজেদের পরিচয় যাচাই করে নেওয়া। যে-পথ হারিয়ে গেছে কখনো, সে-পথে পুরনো রীতিতে পথিক হওয়া যায় না হয়তো, পথ পুনর্নির্ণয় নিশ্চয় করা যায়। কারণ, শুধু একান্তিক বিচ্ছেদকে মান্যতা দিয়ে ইতিহাসের ভ্রান্ত পাঠ করি ; বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিরালাপ আবিষ্কার করে বরং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারি।

সৃষ্টি এভাবেই হতে পারে, হয়ে থাকে। কেননা সার্থক সৃষ্টি কোনো-না-কোনোভাবে পুনঃসৃষ্টি মাত্র। অস্তিত্বের অনুশীলন করে সংস্কৃতির আনন্দকুসুম ফুটিয়ে তোলা। এ যে আপ্তবাক্য নয়, তার চমৎকার প্রমাণ পেয়েছি বাংলাদেশের বগুড়ায়। ধূসর অতীতের পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের স্মৃতি বাহ্যত এখন নিরালম্ব। পাহাড়পুর বিহার ও মহাস্থানগড়ের প্রায় অদৃশ্য ধ্বংসাবশেষে আর শীর্ণকায়া করতোয়া নদীর প্রায়-অনুপস্থিত উপস্থিতিতে ইতিহাসের সমস্ত চিহ্নায়ক কার্যত বিলুপ্ত। তবু সন্দেহ নেই, বগুড়ার আকাশে-বাতাসে স্পন্দিত অনুরণিত হচ্ছে ইতিহাস। একবার (২৩ অক্টোবর, ১৯৯৯) ইংরেজ আমলের জরাজীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'কথা পুণ্ড্রবর্ধন' নামে নাটক দেখার সুযোগ হয়েছিল। কার্তিক মন্দিরের দেবদাসী কমলা ও কাশ্মীরের সিংহাসনচ্যুত রাজা জয়াপীড়ের শিল্পিত প্রেম, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজকন্যার চক্রান্ত, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধ, অন্তঃসারশূন্য আচারধর্ম ও মানবিক উপলব্ধির দ্বন্দ্বের পটে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জয়াপীড়ের পুণ্ড্রবর্ধন

আক্রমণ এবং স্বদেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েও চক্রান্তের শিকার কমলার আত্মবিসর্জন : এই হল মোদ্দা বিষয়। কিন্তু এহ বাহ্য। বগুড়ার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বগুড়া থিয়েটারের এই অসামান্য নাট্যপাঠকৃতির রচনা এবং হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির সাধারণ ঐতিহ্যভাণ্ডারে উত্তরাধিকার সন্ধান—এই বিষয়টি এ সময়ের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক। নাটক অভিনীত হওয়ার পরে সতেরো বছরের তরুণী থেকে পঁচাত্তর বছরের প্রবীণ অভিনেতার জ্বলন্ত উৎসাহ দেখেশুনে মানুষের ওপর এবং সংস্কৃতি নামক প্রাণভ্রমরের ওপর অস্খলিত বিশ্বাস যেন ফিরে পেয়েছি নতুন করে।

'কথা পুণ্ড্রবর্ধন'-এর নাট্যকার তৌফিক হাসান ময়না গ্রন্থনাতে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। কারণ সংস্কৃত ও পালি মন্ত্র এবং হিন্দুধর্মের আচার অনুষঙ্গ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার মতো উৎসুক জন খুব বেশি নেই ওই অঞ্চলে। পরিচালক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ নাটকের আগে এবং পরে জানালেন, সাধারণত সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে নাট্যসংস্কৃতির স্বার্থে তিনি বাঙালির উৎস-সন্ধানে যাত্রা করেছেন। পুণ্ড্র অঞ্চল মনসামঙ্গল কাব্যেরও পৃষ্ঠভূমি। অতএব তাঁর পরবর্তী নাট্যবীজ আহরণের জন্যে তিনি বাঙালির ওই ঐতিহ্যভূমিকে খনন করবেন। শুনি আর অভিভূত হই। ভাবি, বরাক উপত্যকার কুয়োবাসী বাঙালি আমরা, নিজেদের আগে হিন্দু মনে করি কিংবা মুসলমান। বগুড়া থিয়েটার ২৯ মে ১৯৮০ থেকে নিভন্ত চুল্লিতে আগুন যোগান দেওয়ার যে অসামান্য সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে, তার সামাজিক তাৎপর্য মৌলবাদ-লাঞ্ছিত পরিসরে সবচেয়ে বেশি প্রকট। বগুড়ার বার্তা বরাকে নিয়ে যাওয়া যায় না? মনে পড়ে গেল উত্তরবঙ্গে বাগডোগরায় আরো একজনকে জানতাম। তিনি পেশায় চিকিৎসক, নেশায় নাট্যকার ও পরিচালক, ডাক্তার দেবপ্রসাদ কর। নিভন্ত চুল্লিতে আগুন যোগান দিয়ে যাচ্ছেন তিনিও। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যদের দেখান। খাঁটি বাঙালি না হলে যে খাঁটি মানুষ হওয়া যায় না, এই জেনে তিনি বাঙালির হারানো পৃথিবী খুঁজে যাচ্ছেন দুর্মর জেদে ও বিপুল তিতিক্ষায়। লিখতে পারি শিলচরের ছন্দোময় তরুণ জয়ের (যার পোশাকি নাম সৌমিত্রশঙ্কর চৌধুরী) কিংবা গানে-গানে ভুবন পরিক্রমায় মগ্ন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের কথা। জয়ের নাচ আর শুভর গান যে ঘুম-ভাঙানিয়া সোনার কাঠি। তাই ওরা দুঃসহ আঁধারে জেগে থাকা ও জাগিয়ে রাখার ব্রত নিয়েছে। লিখতে পারি নাটকের শিল্প, সংবেদনাকে জীবনের মুখরিত সখ্যে নিয়ে-আসা শেখর দেবরায় ও বিশ্বজিৎ দাসের কথাও যারা বিদূষণের হিংস্র তাণ্ডবের মধ্যে নীল আকাশ আর নির্মল সুপবনের কথকতা করে। শৈশবের অমল ধবল পাল উড়ছে তাই শিলচরে, ফিরে এসেছে বিশ্বাস : আছে আছে জীবন আছে উত্তাপ আছে সৌন্দর্য আছে। জয়-শুভ-বিশ্বজিৎ-শেখরের অস্তিত্বে মিশে যায় তৌফিক-দেবপ্রসাদের অবয়ব। আর সিলেটের শুভেন্দু ইমাম-লীনেন-বাবু-বান্না-দীনদের আস্তিত্বিক মূর্ছনা। জীবনের সংস্কৃতিই তো বাঙালির সংস্কৃতি : এই বার্তা উঠে আসে তাঁদের সমবায়ী উপস্থিতি থেকে।

এইজন্যে 'বগুড়া থিয়েটারের কথা' নামক ছোট্ট প্রতিবেদন পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আধুনিকোত্তর পিশাচ-সময়ে তিন ভুবনের বাঙালিরা তো যাত্রী একই তরণীর। ওরা আর আমরা—এই বিভাজন কে করে? এই বার্তা কি নয় প্রত্যেকের : 'আমাদের জনগোষ্ঠীর মন মানসিকতায় যখন সামন্ত সংস্কৃতির অবশেষসমূহ শিকড় গেড়ে বসে আছে, যে মুহূর্তে সমাজের কর্ণধারেরা পুরনো বস্তাপচা প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে লালন করে চলেছে, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক জোয়ারে যখন দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে ঠিক সে মুহূর্তে শোষণ নিপীড়নই যে শেষ কথা নয়, যুগ যুগান্তরে সঞ্চিত বিক্ষোভের ঘনীভূত পরিণতিতে নতুন দিন আসছে, আসবেই, মানুষের মনের জমিতে নাটকের মাধ্যমে এ বিশ্বাসের শিকড় গাড়তে এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সবার মাঝে তুলে ধরার মানসে তাঁদের আত্মপ্রকাশ। এবং সবার, সমস্ত সংস্কৃতিযোদ্ধার!'

অতএব ইতিহাস-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ব্রহ্মাণ্ড নয়, অভ্যাসের অবসাদ পুড়ছে। আগ্রাসী লোভ পুড়ছে ইন্ধনসহ। মানুষ নয়, মানুষের ছদ্মবেশ পুড়ছে। পুড়ুক। নিভন্ত এ চুল্লিতে সই আগুন ফলেছে।

২

অদ্ভূত আঁধার নেমেছে বাঙালির ভুবন জুড়ে। শুধু যে অন্ধজনেরা সবচেয়ে বেশি দেখার ভান করছে এখন, তা-ই নয়। আত্মঘাতের মাদক ব্যবহারের কত রকম বিধি রপ্ত করছে বাঙালি। একুশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভাবছি, উদীয়মান এ-শতকে আমাদের সামূহিক সত্তার সমস্ত অভিজ্ঞানই ধূসর স্মৃতির মহাফেজখানায় মূঢ় অবহেলায় জমা দিয়ে এলাম নাকি? বিশ শতকের গোড়ায় জোর ঝটকা লেগেছিল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে। তখন না হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন! বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার মন এক হোক, এই ইচ্ছে জানিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি। আর ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অকাল-প্রয়াত হওয়ার আগে তিনি বাঙালির জন্যে স্বরাজের নতুন তাৎপর্য বয়ে এনেছিলেন। জাতীয় মনন ও স্বপ্ন জাগানোর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে নিঃশব্দ চরণে পেরিয়েও গিয়েছিল! জীবনানন্দ ওই মুহূর্তের স্বপ্নসম্ভব পাঠসংহতি তৈরি করেছিলেন রূপসী বাংলার কবিতাসন্দর্ভে। ছিলেন নতুন পথের দিশারি ঘুম-ভাঙানিয়া নেতাজী সুভাষ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালির ভূখণ্ড নয় কেবল তার ঐতিহ্য সংস্কৃতি, তার স্মৃতি ও বিবেক পর্যন্ত বিভাজিত হয়েছিল। উপনিবেশগ্রস্ত মন দিয়ে রাজনৈতিক ঠিকাদারেরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ঢোল-শহরৎ করেছিলেন তখন। অসহায় সাধারণ মানুষ, ক্লাইভের আমলের মতোই, জেগে ঘুমোচ্ছিল। সবাই বলেছিলেন পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে বাঙালি সত্তার দ্বিধাবিভাজনের কথা। কেউ ভেবে দেখেননি, এ আসলে ত্রিধা কিংবা বহুধা বিভাজন। দেখেননি, প্রান্তিকায়িত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিরা আরও ব্রাত্য হয়ে গেলেন। এবং, স্বাধীনতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যের অনন্বয় দিনানুদিন তীব্রতর হল কিনা সংকীর্ণ আঞ্চলিক চেতনার আগ্রাসনে—এসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না কোথাও। উগ্র আঞ্চলিক

আধিপত্যবাদের অনিবার্য পরিণামে বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল বাঙালির ভাষিক স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলার চেষ্টা। বারবার তাই ছিন্নমূল হতে হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিকে। দেশবিভাজনের ফলে কয়েক পুরুষের বাড়ি-জমি তো শুধু ছাড়তে হয়নি, তাঁরা উৎখাত হয়েছিলেন বিশ্বাস-সংস্কৃতি-মানবিক সম্পর্কের প্রত্যয় থেকেও। এর বিষক্রিয়া কত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, এর প্রমাণ অহরহ পাচ্ছি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের মধ্যে মৌলবাদী ভাবনার প্রাধান্যে। যাঁদের কোনোদিন ভিটেমাটি ছাড়তে হয়নি, তাঁরা কোনোদিন বুঝবেন না কেন এইসব ছিন্নমূল মানুষের চেতনায় ইতিহাস নিছক খলনায়কদের তৈরি জঞ্জালের স্তূপ মাত্র। এঁরা জীবন ধারণের তাগিদে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ত্রিপুরায়, আসামে, মেঘালয়ে। প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই করতে করতে সবেমাত্র যখন পা রাখবার এক চিলতে জমি খুঁজে পাচ্ছেন—ঠিক তখনই তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদীরা। আর, সর্বস্ব খুইয়ে নতুনভাবে উদ্বাস্তু হচ্ছেন তাঁরা।

বহির্ভারতের অন্যান্য অংশ তো দূর অস্ত, পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা এসব খবর কি রেখেছেন কখনো? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে খোলাখুলি লিখছি, ত্রিপুরায় বাঙালি আছে—এটা জানলেও আসাম মেঘালয় সম্পর্কে অনেক বিচিত্র সব ধারণা নিয়ে রয়েছেন তাঁরা। আসামে বাঙালির সংখ্যা কতটা এবং বরাক উপত্যকা যে মূলত বঙ্গীয় সংস্কৃতির শেষ আউটপোস্ট—এ বিষয়ে এঁরা কিছুই জানেন না এবং জানতে চানও না। বহু উপভাষায় বিন্যস্ত বাংলা ভাষা সম্পর্কে, বলা ভালো, উপভাষা-অঞ্চল সম্পর্কে কৌতুক ও তাচ্ছিল্য আছে—এইমাত্র। সবাই সুকুমার সেন বা সুনীতি চাটুজ্যে পড়ে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি বিষয়ে অবহিত হবেন, এতটা আশা করি না। কিন্তু অন্তেবাসী বাঙালিরা কিছুমাত্র 'কম' বাঙালি নন তাঁদের তুলনায়, এইটুকু অন্তত জানবেন তো! বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে এবং বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা করার বিচিত্র সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়েও যাঁরা লড়াই করছেন, তাঁদের জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। আমরা ইহুদিদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করি, কিন্তু বাঙালির তৃতীয় ভুবনে অহরহ কী ঘটছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র আগ্রহ দেখাই না। বরাক উপত্যকায়, মেঘালয়ে তো বটেই, আসামের অন্যান্য অঞ্চলে, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে বাঙালিদের ধোপানাপিত যে কবেই বন্ধ হয়ে গেছে—সে-খবর রাখি কেউ? আমরা জানি, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা ভাষার জন্যে শহিদ হয়েছিল বরকত-সালাম-জব্বারেরা। কিন্তু, এখনও আমরা অনেকে জানি না ১৯৬১ সালের ১৯মে শিলচর শহরে (দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকার সদর শহর) একটি তরুণী সহ ১১টি তরুণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইতে শহিদ হয়েছিল। শিলচর রেলস্টেশনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর আসাম পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল। দশ ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন প্রাণ দিয়েছিল কেননা বাংলা ভাষায় কথা বলত ওরা। স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কি?

১৯৬১ সালে থেমে যায়নি রক্তস্রোত। ১৯৭২ সালে আরও একজন আর ১৯৮৬ সালে দুজন শহিদ হয়েছে। বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা বাংলা, কিন্তু খিড়কি দুয়ার

দিয়ে ঢুকে পড়ছে অসমিয়া। এই মুহূর্তে বরাক উপত্যকায় আধা-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গত দুবছর ধরে ২৫ বৈশাখ উদ্‌যাপনে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে প্রশাসন। এদের স্পর্ধা দিনদিন বাড়ছে। যেভাবে বঙ্গভাষাভাষী গোয়ালপাড়া জেলাতে ভাষিক সম্প্রসারণবাদীরা অসমিয়াকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, তেমনি ওদের আগ্রাসন ইদানীং শুরু হয়েছে বরাক উপত্যকায়। ইতিহাসের নিয়মে যা ঘটে থাকে, ট্রয়ের ঘোড়া তৈরি হয়ে গেছে অনেক। তৈরি হয়ে গেছে ফেউয়ের গোষ্ঠী, ভাড়াটে কলমচি আর উচ্ছিষ্টজীবীর দল। একদিকে অসমিয়াকরণের জাল, অন্যদিকে নিকৃষ্ট হিন্দিয়ানির চাপ। তাছাড়া সব কিছুর উপরে রয়েছে বিশ্বায়নের মাদক। অসংখ্য চ্যানেল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বিবেকশূন্য ভোগবাদের নীলস্বপ্ন। ভাষা-সংগ্রামের উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে উঠেছিল বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এক দশকেরও বেশি লড়াইয়ের পরে ১৯৯৪ সালের ২১ জানুয়ারি যদিবা জন্ম দেখলাম তার, ঐতিহ্যবিচ্যুত আত্মবিস্মৃত প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে এই ঘটনার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে শোনা যায়, বাঙালি ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ফিল্মি হিন্দিতে বা ইংরেজিতে। চারদিকে শুধু ধূসর রিক্ততার ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়, জীবনানন্দের অনুপম ত্রিবেদী আর সুবিনয় মুস্তাফীরা বাঙালির তৃতীয় ভুবনের গভীর-গভীরতর অসুখের সূত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এখনই।

বিশ শতকের বাঙালির অর্জন কি তাহলে নেতিবাদ ও আত্ম-নিরাকরণের বিস্তার? ১৯৪৭ সালে আমরা তো বাঙালি পরিচয়ে দাঁড়াতে চাইনি, দাঁড়িয়েছি হিন্দু ও মুসলমানের পরিচয়ে। আত্মপ্রতারণার শুরুও হল তখন। ভারতবর্ষ মানে হিন্দুদের বাসভূমি, একথা ঔপনিবেশিক ন্যায় অনুযায়ী মেনে নেওয়ার পরে বাঙালি ও ভারতীয় এই দুই অভিজ্ঞানের গৌরবই অনেকটা অস্তমিত হল নাকি? এর পরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা অবিরাম করলাম বটে, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর থলে থেকে বেড়াল তো বেরিয়েই পড়ল। অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও, বিভ্রান্ত ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মতো, বাঙালির ভুবনেও তো কালো ছায়া পড়েছিল 'আমরা' এবং 'ওরা'র। কোথায় থাকল তখন আলাওল-নজরুল-ওয়ালীউল্লাহ-শহীদুল্লাহের উত্তরাধিকার? এর পরে বারো বছর যেমন গোটা ভারতবর্ষের জন্যে অন্ধকারে পিছলে যাওয়ার সময়, তেমনি বাঙালির পক্ষেও খুব উজ্জ্বল নয়। বিশেষত তৃতীয় ভুবনের অন্তেবাসী বাঙালিদের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত জটিলতার জন্যে এসময় আত্ম-নিরাকরণের, ভেসে যাওয়ার। কেননা বাঙালি ভুলে যেতে বসেছে কোথায় তার সাংস্কৃতিক গৌরবের মূল কারণগুলি নিহিত। বরং, বাঙালিত্ব মুছে নিয়ে প্রাণপণে হয়ে উঠেছে আর্যাবর্তের পিছিয়ে-পড়া ভাবনার কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের স্বদেশ-ভোলানো শেকড়-উপড়ানো চিন্তার লেজুড়। গত কয়েক বছরে ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো পাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি প্রান্তিক অঞ্চলে চোখে পড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে শনি মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধর্মগুরুদের উৎকট বিজ্ঞাপন-মুখর উৎসবের আয়োজন, অন্যদিকে

মসজিদে-মোক্তবে বিচিত্র সব প্রচারকদের হঠাৎ বেড়ে-যাওয়া আনাগোনা। যাঁরা কিছুদিন আগেও শুধু বাঙালি ছিলেন, এখন তাঁরা নিজেদের জুড়ে দিচ্ছেন হিন্দুস্রোতে কিংবা মুসলমানস্রোতে। এবং, এঁদেরই ঘরের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হচ্ছে সাহেবি কেতার ইশকুলে। শিখছে ক্যুইজ, শিখছে অন্ত্যাক্ষরী। কিন্তু কেউ মাতৃভাষা শিখছে না। মা-বাবারা এদের তাড়না করছেন সব কিছুতেই প্রথম হওয়ার জন্যে। যে-কোনো মূল্যে সাফল্য চাই। এদের মানসিকতা জুড়ে প্রতিযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা; সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মানিয়ে নেওয়া, মান্যতা ইত্যাদি এদের কাছে হয়ে উঠছে জীবনের পক্ষে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক আভিধানিক শব্দমাত্র। এরা যে বাংলা লিখতে পড়তে জানে না, এজন্যে অপরাধবোধ দূরে থাক, ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। এরা টিভির চ্যানেলে-চ্যানেলে ঘুরে বেড়ায়, মা-বাবার উপস্থিতিকে তোয়াক্কা না করে শরীরী মাদকের অমৃতফল খায়। এদের কোনো পক্ষীরাজ ঘোড়া বা বেঙ্গমা বেঙ্গমী নেই, আছে কেবল ভিডিও গেম বা কম্পিউটারের ইন্দ্রজাল। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-জীবনানন্দ-নজরুল-সত্যজিৎ রায়-ঋত্বিক ঘটক-ওয়ালীউল্লাহ-ইলিয়াস-জয়নাল আবেদিনদের নিয়ে বিশ শতকের প্রত্নবস্তু হিসেবে রুদ্ধ হয়ে যাবে বাঙালির পরিচয়। একুশ শতকে কম্পিউটার-ইন্টারনেট-উপগ্রহ-প্রযুক্তির চক্রব্যূহে স্বেচ্ছাবন্দী প্রজন্মগুলি আর যা-ই হোক বাঙালি থাকবে না। কিন্তু গণেশ দুধ খেতে থাকবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, মোল্লাতন্ত্র জাঁকিয়ে বসবে আরও। এইসব সাধারণ সত্যের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু সত্য রয়েছে উত্তরপূর্ব ভারতের প্রান্তিকায়িত বাঙালির জন্যে। তাঁদের পায়ের নিচে শক্ত জমি নেই, চোরাবালি আছে। আঞ্চলিক উপনিবেশবাদের কাছে স্বেচ্ছাসমর্পিত হওয়াতে ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে শিরদাঁড়া আর পায়ের নিচে অনবরত ঝুরঝুর করে সরে যাচ্ছে বালি।

প্রতিটি আগামীকালই তাই হয়ে উঠছে আরও একটু পঙ্গু, আরও একটু বিকৃত আগামীকাল। যেখানে বারুদ থাকার কথা ছিল, সেখানে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ছাই। এই ছাই এমন যার তলায় ধিকি ধিকি আগুনের আঁচ নেই কোনো। নির্ভেজাল ধূসর ও কালো আখরে সময় লিখে চলেছে রূপহীন চরিত্রহীন কৃষ্ণবিবরের কথকতা। বাঙালির তৃতীয় ভুবনে যদিও সাহিত্য-সংস্কৃতির টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এখনো, লক্ষ্যশূন্য তাৎপর্যশূন্য উদ্যমের ফলে ওই আলোকেও গিলে খেতে চাইছে ছায়া ও প্রচ্ছায়া। রূপকের ভাষা এসে গেল বটে, কিন্তু আসলে এ ঘোর বাস্তব। প্রান্তিকায়িত বাঙালি সত্তা সমান্তরাল অপরতার মধ্যে সৃষ্টির উত্তাপসূত্র খুঁজে নেওয়ার পদ্ধতি ও প্রকরণ ভুলে যেতে বসেছে। ছোট পত্রিকাগুলি হয় মৃত নয়তো অর্ধমৃত। ব্যক্তিগত উদ্যমের পুঁজি কিছুতেই সামূহিক উদ্যমের সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে না। তার ওপর নেই উদ্যমের ধারাবাহিকতা, নেই তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর কোনো উপলব্ধি। এক দশকের অনেক আগেই ভেঙে যাচ্ছে সংঘ, তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ঝরে পড়ছে সলতে। ফলে সত্তায় বাজিমাত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিপুল ও অবিভাজ্য বাঙালি সত্তার সাংস্কৃতিক আয়তনে নিজস্ব বৈচিত্র্য ও জীবনানুভবকে প্রতিষ্ঠিত করার জরুরি কাজ উপেক্ষা করে এক ধরনের ভুল আঞ্চলিকতার

ছোটো মাপ তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। কূপমণ্ডূকতার সর্বগ্রাসী ছায়া সঞ্চারিত হচ্ছে সমস্ত কাজে লেখায় চিন্তায়, আন্তঃসম্পর্কের বয়ানে।

যখন ভাবি প্রথম ভুবনের কথা, দেখি যে, বাঙালিত্ব ও ভারতীয়ত্বের ভুল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রবল ঔদাসীন্য অন্য-এক ধরনের আত্মঘাতী প্রবণতা তৈরি করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এমন-এক নব্য মুষলপর্বের লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ, যার অভিঘাতে ভণ্ডামি, কৃত্রিমতা, অন্তঃসারশূন্যতা তৈরি করে চলেছে কেবল থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিকতা আর প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের বাইরে মনন ও সৃষ্টি যেতেই চায় না। একুশ শতকের ভেতরে পৌঁছাতে চাইছে বাঙালি নিছক প্রবাহ রক্ষার আয়োজন দিয়ে। কিছুদিন আগেও যা-কিছু ছিল বাঙালির ক্ষুরধার মেধা ও প্রতিস্রোতপন্থী মননের সূতিকাগার, সেইসব এখন দ্রুত শুচিতা হারিয়েছে। যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনে বা গবেষণাকেন্দ্রে ইদানীং চোখে পড়ে কেবল অসূয়া, নির্লজ্জতা, প্রভু-ভজনা ও ফাঁপা আত্মম্ভরিতার চলমান প্রদর্শনী। জীবনানন্দের ভাষা অনুসরণ করে লিখতে পারি, যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা। তাই শেয়ালের ও শকুনের খাদ্য এখন মেধা ও স্বপ্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। যেভাবে আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে, তাতে মনে হয়, অবক্ষয়ী আধুনিকতা ও বিশ্বায়নলব্ধ আধুনিকোত্তরবাদী সম্ভোগ-মাদকের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই বাঙালির সময়-মুদ্রা এবং এই মুদ্রাগীতির মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ছে তৃতীয় ভুবনেও। প্রান্তিকায়িত বাঙালির জন্যে উপাংশুকথনেও ক্ষয়ের বিলাসিতা, এই তার অস্তিত্বের অভিজ্ঞান। একুশে ফেব্রুয়ারির কৃষ্ণচূড়া যাদের চেতনার রঙে রঞ্জিত হয়ে বাংলা নামে দেশের জন্ম দিয়েছিল, দ্বিতীয় ভুবনের সেই বাঙালিদের জন্যে ইদানীং বিশ্বায়ন এসেছে এন জি ওর মোহনবেশে। পোশাক পাল্টে পাকিস্তানি অপচেতনা দ্রুত ঢুকে পড়েছে সদর থেকে অন্দরে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখনো সক্রিয় বলে তালিবানি সন্ত্রাস সত্ত্বেও সাহিত্য-সংস্কৃতির মননবিশ্ব আবিল হয়নি। কিন্তু সিঁদুরে মেঘের আনাগোনা দিনদিন নানাভাবে স্পষ্টতর হচ্ছে। একদিকে মৌলবাদের ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণুতা, অন্যদিকে উপভাষাকেন্দ্রিক ভয়ংকর আঞ্চলিকতা। এদের পথ ভিন্ন, লক্ষ্য এক, যেন-তেন প্রকারেণ বাঙালিত্বকে ভেতর থেকে ভাঙো! ঐশ্লামিক পরিচিতিকে উস্‌কে দিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্বগত ন্যায়বৃত্তকে চূর্ণ করতে চায় মৌলবাদীরা। আর উপভাষা-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা চায় বাঙালিকে আরও টুকরো করে দিতে। সম্প্রতি হাতে এল লণ্ডনে প্রকাশিত একটি বই, সিলেটি 'ভাষা'ও ওই 'ভাষাগোষ্ঠী'র পরিচিতি বিষয়ে। বিভাষাকে ভাষা বলে চালানোর মধ্যে কোনো সারবত্তা নেই—এই বলে উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু যাচ্ছে না। কারণ, বিশেষভাবে এই উপমহাদেশে এবং সাধারণভাবে বিশ্বের বহু স্থানে আঞ্চলিক পরিচিতিকে উস্‌কে দিয়ে বিভাজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াটি খুব চেনা। হতে পারে, এটা মগ্নশৈলের চূড়ামাত্র। এরপর যদি চট্টগ্রামে এজাতীয় কিছু ব্যাপার শুরু হয়ে যায় (যেমন হয়েছে পশ্চিমবাংলায় তথাকথিত কামতাপুরি নিয়ে), একে তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, এর

কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়তে পারে তৃতীয় ভুবনে। ওই বইটিতে দেখলাম, কয়েকজন উৎসুক ইংরেজ সিলেটি লিপি তৈরিতে সহায়তা করেছেন। একে তো কাকতাল বলে নিরুদ্বিগ্ন থাকা যাচ্ছে না। নয়া উপনিবেশবাদী চক্র এভাবেই তো,নানা ধরনের সহযোগিতার আড়ালে, কাজ করে থাকে চিরকাল। অজস্র কৌনিকতায় ঋদ্ধ বাঙালি অস্তিত্বের পক্ষে যা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য, তা-ই আবার বিচিত্র কূটাভাসের বশে নেতিবাচক বিভেদের সলতে হয়ে উঠতে পারে। তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারি আর উনিশে মে-র উত্তরাধিকার কোথায় থাকবে? সালাম বরকতরা ঢাকার উপভাষার জন্যে প্রাণ দেয়নি নিশ্চয়, কমলা-শচীনেরাও প্রাণ দেয়নি সিলেটি বিভাষার জন্যে। বাংলা ভাষার মৃত্যুহীন শহিদদের পতাকা এই ক্রান্তিকালেই তো নতুন মুঠোয় তুলে ধরা প্রয়োজন। তাঁদের মৃত্যুকে অবমাননা করতে চাইছে মৌলবাদ, অবক্ষয়ী আধুনিকতা, আধুনিকতার ভোগসর্বস্ববাদ ও আঞ্চলিক উপনিবেশবাদ। বাঙালি আবার এক জটিল সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে, তিন ভুবনে আলাদা-আলাদা ভাবে। যতক্ষণ এবিষয়ে অবহিত না হচ্ছি, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিছক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র হবে—তা সার্বিক সত্তার পরিচায়ক হবে না।

সংকট তাকেই বলি যখন অন্ধ-বোবা-বধির জনতায় ভরে যায় চতুষ্পার্শ্ব আর তাদের ধাতব কোলাহলে ও শীৎকারে গলে-গলে পড়তে থাকে অন্ধকার। ডিশ অ্যান্টেনা আর ইন্টারনেটের যুগে উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থাৎ বাঙালির তৃতীয় ভুবনে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন আপাতদৃষ্টিতে নেই। ভৌগোলিক সীমান্ত যখন ঝাপ্‌সা, চিন্তাবিশ্বের স্বাতন্ত্র্য মুছে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপ্ত প্রতাপের আগ্রাসনে—পিণ্ডাকার ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তিরূপ নয়, সংখ্যাচিহ্নিত অস্তিত্বই ফুটে উঠছে, বুদ্বুদের মতো মিলিয়েও যাচ্ছে। তাহলে বাঙালিত্ব কিংবা বাঙালির বিভিন্ন ভুবন নিয়ে দুর্ভাবনা করব কেন? সময়ের দুরন্ত স্রোতে শ্যাওলার মতো ভেসে যাওয়াকে মানিয়ে নিই বরং। যদি দুর্ভাবনা না করি, যদি মানিয়ে নিই—তাহলে প্রতিবেদনও বিভ্রম মাত্র হবে। তবু যে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করছি, এতেই প্রমাণিত সাংস্কৃতিক রাজনীতি আলোচনার বৈধতা।

বাঙালিত্ব আক্রান্ত—এই যথাপ্রাপ্ত বয়ানের সূত্রে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি শিলচর-ঢাকা-কলকাতার পরিসর থেকে সময়ের রাজনৈতিক মাত্রায়, তার জটিল অন্তঃস্বরে। বিশ্বায়নের দোসর আধুনিকোত্তরবাদ কল্পজীবনের হাতছানি দিয়ে সর্বত্র সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঐক্যবোধের কাঠামো ভেঙে দিচ্ছে একদিকে। অন্যদিকে সৃজনশীল সমান্তরালতা ও ইতিবাচক পার্থক্য-প্রতীতি মুছে দিয়ে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে অবান্তর করে দিচ্ছে। বাঙালির সামূহিক অস্তিত্বে এই দুটোই সমান বিপজ্জনক। কিন্তু মঞ্চসাজের লুব্ধতায় মোহগ্রস্ত আমরা, তলিয়ে ভাবছি না কিছুই। শনাক্ত করছি না বিশ্বায়নের কৃৎকৌশলে উৎপাদিত সত্যভ্রমগুলিকে, তাদের চিত্ত-অসাড়-করে-দেওয়া পদ্ধতিগুলিকে। যাঁরা প্রান্তিক অঞ্চলের অধিবাসী বলে প্রত্যাখ্যাত অপরের অবস্থানে খানিকটা অভ্যস্তই, তাঁদের কোনো প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নেই বলে সবচেয়ে আগে তাঁরা মুছে যাবেন। কিন্তু অজগর সাপের ভয়াবহ ঐক্যনীতি শেষ

পর্যন্ত কাউকে রেয়াত করবে না। একুশে ফেব্রুয়ারি ও উনিশে মে-র চেতনা থেকে যদি উত্তরায়ণমনস্কতা বিচ্ছুরিত না হয়, ছাই ও লাভার স্তূপে তৈরি হবে নতুন-এক পম্পাই নগরের দুঃস্মৃতি।

না, পুরোপুরি ঠিক বলা হল না। কেননা একুশ শতক হলো স্মৃতিহীনতার শতক। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দুর্নিবার দাপটে সব ধরনের সত্য উৎপাদিত হচ্ছে যন্ত্রদানবে। আমরা এখন তবু যাদুঘরে গিয়ে আদিম মহাসরীসৃপদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখি, অদূর ভবিষ্যতে কম্পিউটার দিয়ে পুনর্নির্মিত বাঙালি সংস্কৃতির অশ্মীভূত রূপ দেখার জন্যে আগ্রহী দর্শক পাওয়া যাবে না। এ কোনো দুঃস্বপ্নের অতিকথন নয়, এ হল আত্মবিস্মৃত বাঙালির অনিবার্য ভবিতব্য। সম্ভাব্য অমরতার সোনার হরিণ বা সাময়িক লাভ-লোকসানের হিসেব যাদের অবক্ষয়ী আধুনিকতার প্রতি সমর্পিত করছিল, তাদের পথ ধরে চলতে চলতে পরবর্তী প্রজন্ম বিশ্বায়নের মাদকে বুঁদ হয়ে রয়েছে। বাঙালিত্ব এদের কারো অ্যাজেণ্ডায় ছিল না। আত্ম-অবলুপ্তির ঘনায়মান আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েও তাই এরা নির্বিকার, তাদের প্রতিবেদনে শুধু ধ্বংসগোধূলির ম্লানায়মান ছায়া।

কোথায় একুশে, কোথায় উনিশে আজ? নিভন্ত চুল্লিতে আগুন ফলাবে কোন হাঁসজারু-বকচ্ছপদের ভিড়! এই প্রশ্নের মুখোমুখি আজ সহস্রাব্দের ভ্রামণিক সত্তা, নির্বাক বিষণ্ন বিধুর।

নিভন্ত এই চুল্লিতে সই একটু আগুন দে!

জনৈক শিক্ষাজীবীর আত্মদর্শন

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের গল্পটা সবাই জানে। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'—এইমাত্র বলার জন্যে তাঁকে নরক দেখতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা যারা মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছি অহরহ, এমন কী নিজেদের নরক নিজেরাই তৈরি করে চলেছি প্রতিদিন—আমাদের জন্যে কী ব্যবস্থা? ৫ সেপ্টেম্বর ঘটা করে শিক্ষক দিবস করি এখনো, ইনিয়ে-বিনিয়ে সাত-সতেরো কথা বলি জাতির মেরুদণ্ড সম্পর্কে—তারপর, আবারও ফিরে যাই 'নরক' তৈরির কার্যক্রমে। বুনো রামনাথের কথা অবশ্য ইদানীং কেউ বলে-টলে না ; ই-মেল আর ইন্টারনেটের যুগে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও দ্রুত অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। অন্য যে-কোনো পেশার মতো শিক্ষকতাও একটা পেশা। 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্' রব উঠেছে ভুবন জুড়ে। বেসরকারিকরণের মাহাত্ম্যকীর্তনে আমরা সবাই দোহার। ব্যাঙ্কের বাবুরা কাজ করে না, খাল কেটে কুমির ঢুকিয়ে দাও। ইনসিওরেন্স সেক্টর হাজার-হাজার কোটির ব্যবসা করছে। দেশীয় তিমিকে বিদেশি তিমিঙ্গিলদের সুস্পষ্ট কবলে ফেলে দাও। বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে কেমনে দিই ফাঁকি। রেল-বিমান খুব খারাপ চলছে, বাসের মতো সব প্রাইভেট করে দাও। সামাজিক মালিকানার দরকার নেই, চার-পাঁচ-ছজন ধনির শ্রীবৃদ্ধি মানেই তো দেশের শ্রীবৃদ্ধি। 'বিড়াল' প্রবন্ধে মহামূর্খ বঙ্কিমচন্দ্র কী লিখেছিলেন—সেসব ব্যাকডেটেড কথা মনোযোগের অযোগ্য। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষা পাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই আর।

স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাটবাট যেমন আছে থাকুক। দিল্লী ও দিসপুর থেকে নতুন নতুন ঠগীর ফাঁস আসুক। ব্যাঙ্ক-বিমা-রেল-বিমান-ইস্পাত-বিদ্যুৎ—সর্বত্র রামরাজ্য ও হনুমান-রাজ্য চালু হচ্ছে, তেমনি শিক্ষাতেও হোক। সমাজের উঁচুতলার মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া উচ্চশিক্ষার দরকারটা কী? অন্যদের জন্যে আছে হাতে-কলমে কাজ শিখে নেওয়ার ব্যবস্থা। কোথায় আছে, তা স্পষ্ট বলারও প্রয়োজন নেই। 'কোথাও আছে একটা কিছু'—এইটুকু জানলেই হল। ইঁদুর দৌড়ে ঢুকে যাক সবাই, কোথায় যাচ্ছে না জেনেই। ইতিমধ্যে শিক্ষাদানের সামাজিক অঙ্গীকার ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা মুছে যাক। আমরা 'পি-পু ফি-শু'র দলে ছিলাম, আছি, থাকব। মন অসাড়, চেতনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ঘাতকের খড়্গ ঘাড়ের উপর নেমে এলেও চোখে পলক পর্যন্ত পড়ে না। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে নিম্নবর্গীয় কেউ যেতে না পারে, এইজন্যে হাজার টাকা থেকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফি ধার্য হচ্ছে। কেউ কোনও প্রশ্ন করছে না, 'ওহে রামরাজ্যের ভেক-ওয়ালা স্বদেশি ঢোলওয়ালার দল—সাগরপারের কোন প্রভুদের খেদমত করছ

এভাবে!' আমাদের পাঠশালা-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো শুকিয়ে মরছে। ওখানে যে বাংলায় পড়ানো হয়, ওখানে ছেলেমেয়েদের পাঠালে ওরা আনস্মার্ট হবে। দাঁতে-দাঁত চেপে, চোখ পিটপিট করে ইংরেজি বলবে না, বোম্বাইয়া ফিল্মমাকা হিন্দি বলবে না। অতএব অল্প-মাইনেতে ঘানির বলদ হয়ে-যাওয়া মাস্টারমশাই ও দিদিমনিতে ছয়লাপ ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলি। স্কুল? সত্যিই কি এদের স্কুল বলা যায়? না, আসলে এসব ব্যবসাকেন্দ্র। কাদের হাতে পুতুলনাচের সুতো এবং কী তাদের পরিচয়—এসব প্রশ্ন কখনো কারো মনে জাগে না। কত বড়ো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে মগজ ধোলাইয়ের কারিগরেরা, এ বিষয়ে মাথাব্যথা নেই কারো। এইসব 'হেভি স্মার্ট' শিশু-কিশোরেরা যখন তরুণ-তরুণী হচ্ছে, তাদের প্রকৃত পরিণতি কী হচ্ছে—এই খোঁজখবর কিন্তু নেওয়া হয় না। পরিসংখ্যানের সাহায্যে আরও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, সোনার হরিণের পেছনে ধাবমান আজকালকার আদিখ্যেতাপূর্ণ মা-বাবাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতাই বা কী! যে-কোনো মূল্যে সফল হওয়াই একমাত্র পরমার্থ—এই জেনে যারা একচক্ষু হরিণের মতো যাবতীয় পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে পায়ের নিচে পিষে মারছে, তাদের ভবিতব্যই বা কী! বেসরকারিকরণের উন্মত্ত তাণ্ডবে ভেসে গেছে সব কিছু। শিক্ষকের জোব্বা পরে সমাজে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা। এরা এতটাই বেপরোয়া এখন, যে, সকালে ও রাত্তিরে নয় কেবল, দুপুরবেলায়ও পেশাদারি সততাকে প্রকাশ্যে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাড়িতে হাট বসিয়ে দিচ্ছে। একেকজন ছাত্রের পেছনে পাঁচ-ছজন রোবট শিক্ষাব্যবসায়ীর ছায়া। এই নিয়ে নিরেট অভিভাবকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা—কার ছেলে-মেয়ে কোন বিষয়ের জন্যে কজনকে রেখেছে! এই 'রেখেছে' ক্রিয়াপদটা কানে খট করে লাগে ; চাই বা না চাই 'রক্ষিতা'র অনুষঙ্গ সামাজিক দুঃস্মৃতি থেকে উঠে আসে।

আর, শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা ন্যক্কারজনক ভূমিকায় নেমে পাঁক মাখছেন দুহাতে। ভয় দেখাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের, 'আমার কাছে না পড়ে অমুকের কাছে পড়লে টাইট দেব।...আমার সঙ্গে বোর্ডে বা ভার্সিটিতে অমুক চন্দ্র তমুকের ব্যবস্থা করা আছে।..নম্বর কমানো বা বাড়ানো আমার বাঁ-হাতের খেলা।' আর তারই সঙ্গে মানানসই চোখা-চোখা বাক্যবান প্রয়োগ করা হয় ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে। এরাই আজকের শিক্ষক। তাঁরা জাতির কারিগর বটে, তবে বজ্জাতির। কী শেখে ছাত্রেরা এদের কাছে? শেখে, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে চারপাশ সম্পর্কে অন্ধ থাকা শেখে, নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে যারা আছে, তারা সবাই অশ্রদ্ধেয়, মনোযোগের অযোগ্য এবং অস্তিত্বশূন্য অবয়ব মাত্র। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যা শেখে, তা হল, শিক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেহাত ডানহাত ও বাঁ হাতের। তারা শেখে এবং দেখে যে শিক্ষকের আত্মম্ভরী-জোব্বার নিচেই রয়েছে আসল কাক-তাড়ুয়া মূর্তি। এরা যখন ধাপে ধাপে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অন্য কোনো বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যায়, তাদের সঙ্গে সংলগ্ন কালো ছায়া ঢেকে ফেলে সব কিছু। এরা চৈতন্যে মড়কের বার্তাবহ হয়ে বিষাক্ত ছত্রাক ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। দ্রুত পচে যেতে থাকে সব কিছু : শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

নৈরাজ্যের রৌরব ঘনীভূত হতে থাকে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। বস্তুত হতে থাকে নয়, হয়ে গেছে। বিশ্বায়নের দোসর চূড়ান্ত বিমানবায়নের গ্রহণ লেগেছে ভারতের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও, বাপে তাড়ানো মায়ে-খেদানো আমাদের বরাক উপত্যকায়।

২

যেহেতু এই এলাকা চিরকালই পাণ্ডব-বর্জিত, এখানকার আকাশে-বাতাসে পুষ্ট হয় কেবল হীনমন্যতা। আলো-হাওয়া-রোদ কোথায় যেন কোন অদৃশ্য ও অমোঘ প্রতিবন্ধকে ঠিকরে যায়। ঝাপসা কাঁচের আড়ালে সব দৃশ্যই দৃশ্যের কুহক হয়ে ওঠে, সব বার্তাই সত্যভ্রমের বার্তা। নইলে চরম কূপমণ্ডূকতার ও যুক্তিহীনতার অবারিত সমাবেশ এখানকার জনমানসে মৌলবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রতিক ভেদবুদ্ধিকে তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-পর্বেও এতখানি অবারিত করে তুলত না। গত কুড়ি বছরে ধাপে ধাপে যাঁদের অবনমন সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই শিক্ষক সমাজ তাই আজ আর চেতনার প্রহরী নন। তাঁদের আর কোনো অর্থেই বুদ্ধিজীবী বলা চলে না। ব্যবসা-সর্বস্ব মনোবৃত্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলেই কোনো ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের টিকিটিও দেখা যায় না। অথচ ১৯৬১, ১৯৭২ ও ১৯৮৬-এর ভাষা আন্দোলন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাঁদের অনেকেই ছিলেন অগ্রণীর ভূমিকায়।

মোটামুটি ভাবে গত তিন দশকে কেন এই অন্ধকারের অন্ধলিপি তৈরি হল, তা আজ তলিয়ে ভেবে দেখার সময় এসেছে। অসুখের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করার বদলে কেন গোটা সমাজ ভেসে গেল বৈনাশিক অপচেতনায়—এর পেছনে কি গভীর আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভুত্ববাদীদের যৌথ চক্রান্ত রয়েছে? আজ ধ্বস্ত হয়ে গেছে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদান-বিধি। বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এনে দিয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষাকেও কতকগুলি পূর্ব-নির্ধারিত প্রকল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন নতুন পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বহু গুণ বেড়ে গেলেও কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রকৃত তাৎপর্য চিন্তা-চেতনার মধ্যে শুষে নিয়ে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপ্রকরণকে যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করার কোনো গভীর আয়োজন নেই।

৩

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসেবে আমার মনে হয়, এখনই প্রকৃত সময় ফিরে দেখার ও পুনর্গঠনের। এতক্ষণ যে-প্রেক্ষিতের কথা লিখেছি, তা অনস্বীকার্য নির্মম বাস্তব। সময়ের সঙ্গে সুর-তাল মেলানো মানে আত্মবিস্মৃত হয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া নয়। কিন্তু অভ্যাসের ধারাবাহিকতাকেও ভেঙে দিতে হয় কখনো কখনো। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেই এমন কোনো মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা যার ফলে বালির ঝড় এড়ানোর জন্যে আমরা উটপাখির মতো মাটিতে মুখ গুঁজে দিয়েছি। সময়ের প্রহার থেকে নিছক আত্মরক্ষা করার চিন্তায় আমরা

কেবল অন্ধকার সুড়ঙ্গেই ঢুকে যেতে পারি। অতএব সংশয় ও কুয়াশা পেরিয়ে নিজেদের জন্যে আলোর শুশ্রূষা নির্মাণ করাই বেশি জরুরি।

মাধ্যমিক স্তরের সবচেয়ে নিচু ধাপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ধাপ পর্যন্ত শিক্ষকতার চল্লিশ বছর ব্যাপী অভিজ্ঞতায় কিছু কিছু ভেতরের সমস্যা বোধহয় বুঝতে পেরেছি। তারপর চোখের সামনে দেখছি বাংলা বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের মনোভঙ্গির বিবর্তন। দেখেছি কীভাবে মাতৃভাষার মৌলিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে উদাসীন থেকেও এবং নতুন পাঠগ্রহণ সম্পর্কে অনীহা দেখিয়েও বাহ্যিক অর্থে 'সফল' হওয়া সম্ভব। বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই পাঠ্যসূচি চালু থাকলে শিক্ষকেরা স্বস্তিবোধ করেন এবং ছাত্ররাও খুশি থাকে। আর, সবচেয়ে বেশি সুখী হন সেই সব শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা যাদের বাড়িতে এখন তিনবেলা বেসরকারিকরণের সুপবন বয়ে যাচ্ছে। একই কুমিরের ছানা দেখাতে দেখাতে তাঁদের দোতলা-তেতলা বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, জৌলুস হয়, সামসুং-ভিডিওকনের জেল্লায় ঘরের চেকনাই বাড়ে। তাই পাঠ্যসূচি বদলানোর আশঙ্কা দেখা দেওয়া মাত্র এঁরা শোরগোল তোলেন, নানা অজুহাতে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাধা দেন। কারণ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁদের কাছে নতুন পাঠ্যক্রম মানে কেঁচে গণ্ডূষ করা যা কিনা তাঁদের বিবেচনায় অকারণ পণ্ডশ্রম। এঁদের একমাত্র নীতি হল ; 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

আসলে অধিকাংশ শিক্ষক এবং ছাত্রের কাছে পাঠ্যসূচি মানে কয়েকটি নির্দিষ্ট বই নয়, এদের প্রকৃত অর্থ হল মান্ধাতার আমল থেকে চলে-আসা কয়েকটি নির্দিষ্ট 'টপিক' যাদের মধ্য থেকেও আবার চূড়ান্ত বাছাই করে কয়েকটি ছাঁচে-ঢালা প্রশ্ন পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার জন্যে তৈরি করা হবে। এবছর রাম এল তো ওবছর শ্যাম। থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁড়ি কমা পর্যন্ত বদলায় না। এভাবে নতুন চিন্তা করতে অস্বীকার করে এবং পড়ানোকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হয় যাতে ছাত্রেরা তথাকথিত টেক্সট বই পর্যন্ত পড়ে না এবং রেফারেন্স বই-এর নাম পর্যন্ত না-জেনে পরীক্ষা-বৈতরণী দিব্যি পেরিয়ে যায়।

পরীক্ষক এবং অধ্যাপক নিযুক্তির প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকার ফলে আমার কিছু কিছু বোধোদয় হয়েছে। কী বরাক উপত্যকায় কী পশ্চিম বাংলায়, পরীক্ষায় পাওয়া মার্ক্স আর কোনোভাবেই জ্ঞানের পরিমাপক নয়। শতকরা পঞ্চান্নের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও দশ ভাগের বেশি ছেলেমেয়ে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যও ভালোভাবে জানে না। 'নেট' এবং 'শ্লেট' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে ক্যুইজের উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিতে ওরা যান্ত্রিকভাবে কিছু কিছু তৈরি হয় বটে, কিন্তু এর বাইরে গেলেই অথৈ জল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে কারো কারো কাছে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত যুগ-বিভাগ পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের মতো বিখ্যাত লেখকদের দশটি বইয়ের নামও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারে না। অন্য

লেখকদের কথা ছেড়েই দিলাম। গত দশ-পনেরো বছরে প্রাতিষ্ঠনিক বাংলা বিদ্যাচর্চার যেসব বইপত্র বেরিয়েছে, তাদের সম্পর্কে কোনো কৌতূহল নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক সৃজনশীল সাহিত্যের কথা না তোলাই ভালো। আধুনিকতা বা রেনেসাঁস বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে ধারণা খুব ভাসা-ভাসা এবং নিতান্ত অগোছালো। এ এক ভয়াবহ সংকটের ছবি।

কিন্তু এইজন্যে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের একতরফা ভাবে দায়ি করলে চলবে না। পাঠ্যসূচিকে যতক্ষণ সময়োপযোগী না করা হচ্ছে এবং পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি আমূল পাল্টানো না হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, পরিবর্তন-বিমুখ শিক্ষক-সমাজকে তাদের জাড্য থেকে বের করে আনা না হচ্ছে—অন্তত ততদিন বাংলা বিদ্যাচর্চার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আরো একটি জরুরি কথা সরাসরি ও কর্কশভাবে বলে নেওয়াটা প্রয়োজন। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে যে অজাচার চলেছে, তা আগামী প্রজন্মের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষকতার সঙ্গে ভাবাদর্শ ও সামাজিক দায়বোধের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াব বড় কারণ, আমলা-মন্ত্রী-রাজনৈতিক নেতাদের ঘুয দিয়ে শিক্ষকতার চাকরি কিনে নেওয়া হচ্ছে। এরা ছাত্রদের কী পড়াবে? বরং একথা লেখা যেতে পারে, ভুল পড়ানোর চেয়ে না পড়ানো অনেক ভালো। যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করে অযোগ্য ব্যক্তিরা প্রতাপশালী মহলের সুপারিশে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ছে। যোগ্য ব্যক্তিদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা নিশ্চয় অপরাধ ; কিন্তু যে-পদ কোনো অযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য নয়, তাকে তা পাইয়ে দেওয়া আরো বেশি অপরাধ। কেননা এ ধরনের শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার ধার ধারে না। তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সন্ধান করলে দেখা যাবে, এদের জীবনের ত্রিসীমানায় লেখাপড়া ও গবেষণা নেই। কিন্তু এইসব ব্যক্তির ছিদ্রপথেই বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বেনোজল ঢুকে যায়, এদের রাহুগ্রাসে নৈরাজ্য ক্রমশ শক্তিশালী হয়। এরাই ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষ ও চক্রান্তের চোরাবালি তৈরি করে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এদেরই ক্লেদাক্ত উপস্থিতির জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা চিরকালের মতো প্রকৃত বিদ্যার উত্তাপ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে যুক্ত থাকার ফলে লক্ষ করেছি, নিচু স্তরে এখন আর ব্যাকরণ পড়ানো হয় না। বাংলা ভাষার প্রাথমিক বিধিগুলি না-জানার ফলে প্রতিটি স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংক্রামিত হয় অমার্জনীয় গুরুচণ্ডালি দোষ, বানান সম্পর্কে হাস্যকর অজ্ঞতা এবং পদান্বয়ে—গুরুতর ত্রুটি। বেছে বেছে পড়ানোর ফলে ভাষার কাঠামো কিংবা সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো উপলব্ধিই তৈরি হয় না। বিদ্যালয় স্তরে অজস্র বিচ্যুতি যখন অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে পড়ে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইসব শুধরে নেওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকে না। বরাক উপত্যকার বাঙালি হিসেবে আমাদের কিছু বিশেষ সমস্যা রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, ওই সমস্যার গভীরতা কখনো তাঁরা বিশ্লেষণ করেননি বা সমস্যা থেকে উদ্ভূত সংকটের নিরসন করার কথাও

ভাবেননি। বিপুল বৈচিত্র্য সম্পন্ন বাঙালির ভুবনে উপভাষা ও বিভাষার প্রচলন রয়েছে বেশ কিছু অঞ্চলে। কিন্তু ব' 'কের বাঙালিরা যেভাবে উপভাষাকেন্দ্রিক অস্তিত্ব গড়ে তুলেছেন এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের বিড়ম্বনার কারণ নিজেরাই হয়েছেন—এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ফলে এর সুযোগ কখনো কখনো বিভেদকামী মূর্খ শয়তানেরা নিয়েছে। আঞ্চলিক প্রভূত্ববাদীদের প্রশ্রয়ে বাংলার প্রতিস্পর্ধী এক 'বরাকী' ভাষার প্রস্তাবনা করেছে। উনিশে মে-র চেতনা ইদানীং যেভাবে পুনর্জাগরিত হয়েছে, তাতে আশা করা যায়, এই স্পর্ধিত দুঃসাহস আর কেউ দেখাবে না। কিন্তু এর জন্যে আমরাও কি দায়ি নই অনেকটা! অন্য কোথাও উপভাষা ব্যবহারকারী জনতা মূল ভাষার প্রতি আনুগত্য শিথিল করেনি। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে করে ফেলেছি। নইলে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-আনুষ্ঠানিক সভায়ও কেন উপভাষা ব্যবহার করি আমরা? আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তো থাকবেই, কিন্তু তাই বলে শুদ্ধ উচ্চারণে শুদ্ধ পদান্বয়ে আমারই ভাষার শিষ্ট চলিত রূপ কেন বলতে পারব না? কেন এই উপত্যকার কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী গবেষক-গবেষিকা আনুষ্ঠানিক সভায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারে উপভাষা আঁকড়ে থাকবেন? উনিশে মে-র শহিদেরা তো সিলেটি বিভাষার জন্যে প্রাণ দেননি, বাংলা ভাষার জন্যেই দিয়েছিলেন। এই অত্যন্ত মৌলিক ও প্রাঞ্জল কথাটি এখানকার উচ্চশিক্ষিত সমাজেও বারবার বুঝিয়ে বলতে হবে কেন? এ কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়?

ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-উত্তরবঙ্গ-বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো উপভাষাভাষীদের প্রাধান্য। কিন্তু সেখানে তো একথা বলারই প্রয়োজন পড়ে না। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ঘরে-বাইরে লড়াই নিজেদের ভাষিক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এই সর্বাত্মক লড়াইকে আমরাই কি দুর্বল করে দিচ্ছি না? অথচ আমরা প্রান্তিকায়িত অঞ্চলের মানুষ বলে নিজেদের পিছিয়ে-পড়া অবস্থানকে এগিয়ে-থাকা অঞ্চলের বিদ্যাচর্চার প্রতিস্পর্ধী করে তোলার জন্যে বাড়তি উদ্যম, একমুখিনতা ও অধ্যবসায়ের বড় প্রয়োজন ছিল। বরং নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরে চলেছি। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে ভুল বাংলা বানান ও ভুল পদান্বয়ের ছড়াছড়ি। সবচেয়ে বড় কথা, অসমিয়া-হিন্দি বাক্যাংশ ব্যবহার করে খিচুড়ি ভাষা তৈরি করছি আমরাই। এতে যে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদীদের চতুর বিদূষণের শিকার হচ্ছি, এই সচেতনতা কেন থাকবে না আমাদের? নিচু শ্রেণীতে পাঠ্যবই তৈরির নামে পরিকল্পিত ভাবে বাংলা ভাষার গ্রন্থনাকে শিথিল ও ধ্বস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করার বদলে আমরা, বিশেষ ভাবে সমস্ত স্তরে বাংলা ভাষার শিক্ষক ও শিক্ষিকারা, প্রবাদের 'কত রবি জ্বলে রে/কে বা আঁখি মেলে রে'-এর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছি।

হ্যাঁ, এখনই সময় ঘুরে দাঁড়ানোর। প্রতিটি স্তরে পাঠ্যসূচিকে সময়োপযোগী ও যুক্তিসম্মত ভাবে পুনর্গঠিত করা হোক। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদানের নতুন আদর্শ গড়ে তোলা হোক। অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীরা সমস্ত স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা,

গবেষক-গবেষিকা, সাংবাদিকদের নিয়ে একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা-কর্মশালার ব্যবস্থা করুন। তাতে ব্যাকরণ-সচেতনতা, বানানবিধি, উচ্চারণ-বিধি, সাহিত্য-পাঠের নতুন প্রকরণ নিয়ে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হোক। পরের পর্যায়ে কর্মশিবির হোক সমস্ত স্তরের অন্তর্বৃত সঙ্গতিসম্পন্ন পাঠ্যসূচি, পরীক্ষাসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে। বাঙালির তৃতীয় ভুবন বলে নিজেদের অবস্থানকে শূন্যগর্ভ প্রশস্তি না করে তাকে সর্বতোভাবে সার্থকনামা করে তোলা হোক।

আসুন, উপভাষার শৌর্য ও লাবণ্য এবং তার খর চলিষ্ণুতা ও লোকায়ত ব্যাপ্তি আমরা, 'কম' বাঙালিরা শিষ্ট চলিত ভাষায় সংযুক্ত করি। 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলতে পারি যেন আরো বেশি গৌরবে ও সচেতন ভাবে। বাংলা ভাষার ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে ইদানীং। তার মোকাবিলা করার জন্যে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও চিন্তাবিদদের মধ্যে নিয়মিত কার্যকরী বিনিময়ের ব্যবস্থা করি। গোড়া কেটে ডগায় জল ঢেলে কোনো লাভ নেই। নির্বাণে দীপে কিমু তৈলদানম্! হ্যালো মাম্মী হ্যালো ড্যাড্ডি ভ্যালেন্টাইন ডে আর এস এম এস দেওয়া-নেওয়ার চোরাবালিতে নিমজ্জমান প্রজন্মের প্রতি কোনো দায়িত্ব যদি থাকে, তাহলে আর দেরি নয়। নকল ইংরেজিয়ানা আর হিন্দিয়ানার বুদ্বুদ-বিলাস শুধু পথভ্রষ্ট করতে পারে—এই আপ্তবাক্য বলে ওই দায় শেষ হবে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নতুন দিগন্ত সন্ধান করতে হবে আমাদেরই। বেবিফুডে বিভ্রান্ত শুধু কিন্তু কিশোরেরা নয়, তাদের ধৃতরাষ্ট্র তুল্য অন্তরে-বাহিরে অন্ধ মা-বাবারাও। তাই মাতৃভাষা যে মাতৃদুগ্ধ সম, এই উপলব্ধি ফিরিয়ে আনতে গেলে ছোটোদের সঙ্গে বড়োদের জন্যেও বিশল্যকরণীর ব্যবস্থা করতে হবে। আজ, এখনই, এই মুহূর্তে।

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ, পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, বাংলা ভাষাবোধ পুনর্গঠনের পরীক্ষাগার হোক। ব্যাকরণকে অবহেলা করে নয়, ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস কিংবা উপভাষা ও ভাষার ব্যবধান ভুলে গিয়ে নয়। কোর্স সিলেবাস, মার্ক ইত্যাদির চক্রব্যূহে অভিমুন্য হয়েও নয়। আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ে নিজেদের শুদ্ধ করে নিয়ে।

কালবেলার কথকতা

যা অবধারিত, তা-ই হলো। রাঘববোয়ালের রাক্ষুসে খিদেয় মুছে গেল আরেকটি পুঁটি মাছের অস্তিত্ব। শক্তের ভক্ত এই দুনিয়ায় অনেকেই তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করল এই মনোরম দৃশ্য। যে-পথে গেছে আফগানিস্তান কিংবা তারও আগে যুগোশ্লাভিয়া বা চেকোস্লোভাকিয়া নামে প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সে-পথেই গেল ইরাক। যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় ধারাবিবরণীর উত্তেজনাও নেই আর। যাদের ড্রয়িং রুমে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ভালো বিকল্প তৈরি হয়েছিল, তাদের এখন সময় কাটতে চায় না। উত্তর কোরিয়া নামক গোকুলটি তৈরি হচ্ছে, সিরিয়া-ইরানে উনুন গরম হয়নি এখনো ; রুটি সেঁকার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি আসেনি। এখন ইরাকে লুটপাটের চাটনি আর সিয়া-সুন্নির ঝগড়ার পায়েস চেটেপুটে খাওয়া যেতে পারে।

বুশ-ব্লেয়ারের যুগলবন্দি সেলিম-জাভেদ কিংবা লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের চেয়েও বক্স অফিসে ঢের বেশি হিট করেছে। নইলে আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রান্তিক উত্তর-পূর্বের আধা-নাগরিক শহরেও ভাড়াটে কলমচিদের হুক্কা হুয়া এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না। বিশ্বায়নের এমন চমৎকার সঙ্গত কোকাকোলা-পেপসির হিজড়ে-সেনারাও করতে পারেনি। মার্কিন প্রভুর নেকনজরে পড়ার জন্যে কী ব্যাকুল সম্পাদকীয়, সংবাদ পরিবেশনের কী বাহার! সাদা-চামড়ার মালিকেরা যদি কখনও বাতাসা ছুঁড়ে দেয়, এই আশায় বুক বেঁধে নিজেদের বাদামি-চামড়ায় নির্লজ্জ দাসত্বের, আত্মবিক্রয়ের শ্বেতীও প্রসাধন হিসেবে গ্রহণ করেছে এরা। সি.এন.এন, বি.বি.সি-র স্বেচ্ছানিযুক্ত ভাষ্যকার হিসেবে আগাগোড়া বজায় রেখেছে হুক্কা হুয়ার ঐকতান।

অথচ পাশাপাশি তখন দেশে দেশে, এমনকী, বুশ-ব্লেয়ারের আপন ভূমি নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-শিকাগো-লণ্ডনেও হাজার হাজার যুদ্ধবিরোধী মানুষ সভ্যতা-গ্রাসী সংস্কৃতিগ্রাসী নব্য সাম্রাজ্যবাদের দানবিক হিংস্রতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে। কিন্তু ইতিহাস ও মনুষ্যত্বের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে যে বেপরোয়া দাম্ভিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীরা, তাদের কাছে জনগণ অর্থহীন। শিঙে বসে-থাকা মশা-মাছিকে যতখানি তাচ্ছিল্য করে ষাঁড়, তার চেয়ে ঢের বেশি অবজ্ঞা দেশ-বিদেশের যুদ্ধবিরোধী জনতাকে করেছে ওই ঘৃণিত পিশাচেরা। ওদের চাই ইরাকের অঢেল তেল-সম্পদ, যে করেই হোক! এইজন্যে ওরা মিথ্যার পাহাড় গড়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলেছে আস্তাকুঁড়ে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নতুন পর্যায় শুরু করেছে অস্ত্রহীন অসহায় ইরাকের ওপর যথেচ্ছ মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ইঙ্গ-মার্কিন জল্লাদের হানাদারি শুরু হওয়ার আগে ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়া-চীন যতই ঘেউ ঘেউ করুক, এখন তাদের গলায় মিনি বেড়ালের মিহি ম্যাঁও-ম্যাঁও। ইরাকের শবদেহের

ওপর শকুন ও হায়েনাদের অধিকার মেনে নিয়েই ওইসব রাষ্ট্র এখন চাইছে অন্তত কয়েক টুকরো মাংস খাওয়ার সুযোগ।

বড়ো চমৎকার অজুহাত : ইরাকের পুনর্গঠন। বারো বছর ধরে যাদের ভাতে মেরেছে মার্কিন প্রভুত্ববাদ, সেই ছিবড়ে হয়ে-যাওয়া ইরাকিদের ওপর হাজার হাজার বোমা ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করে, তাদের পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্দশন ধ্বংস কিম্বা লুণ্ঠন করে দেখাতে চাইছে, যার শিল তারই নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া : এই হবে একুশ শতকের একমাত্র নীতি। ইরাকের অফুরন্ত তরল সোনা এখন থেকে ওই পুনর্গঠনের সূত্রে মজুত হবে মার্কিন প্রভুর ভাঁড়ারে। স্বাধীনতা বা মুক্তি এখন শয়তানের পদাবলী ; চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে মার্কিন ঘাতকেরা অশ্বেতাঙ্গ দেশে-দেশে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অজগর সাপের ঐক্যনীতি অনুযায়ী গিলে খাবে প্রতিটি দুর্বল দেশের সার্বভৌমত্ব। ওরা প্রয়োজন মতো সত্য, মুক্তি ইত্যাদি উৎপাদন করবে। সর্বাধুনিক তথ্য-বিনোদন প্রযুক্তির মায়ায় আচ্ছন্ন জনদের মনে দৃঢ় প্রোথিত হয়ে গেছে নব্য উপনিবেশ। এরা ডলারের মেকি স্বপ্নে বুঁদ হয়ে বিশ্বায়নের স্তোত্রপাঠক হতে পারে। একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে ইতিমধ্যে যাবতীয় উচ্চাবচতা মুছে যেতে বসেছে। সার্বভৌমত্ব এখন অনাবশ্যক যেহেতু আমেরিকার ইচ্ছাই বিশ্ব জুড়ে একমাত্র আইন। ইরাকের ঘটনাবলী বহু কিছু চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে গেছে।

আধুনিকোত্তর রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, জীববিশ্ব, ব্যবহারবিধি ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথা লিখবেন, তাঁদের 'নিরপেক্ষতা' বা 'দায়বদ্ধতা' নিয়ে হয়ত বা চুলচেরা বিতর্ক হবে। কিন্তু এইসব কী কাজে লাগবে বসরায়-বাগদাদে মৃত কিংবা মৃতবৎ পঙ্গু হয়ে-যাওয়া নারী-শিশু ও সর্বস্বান্ত জনদের? নাকি সাময়িক উত্তেজনার আগুন-পোহানো শেষ হয়ে গেলে ভোগবাদী জমানার প্রতীত বাস্তবে প্রতীত নাগরিক শুধু হতে থাকবে আমজনতা! পি-পু-ফি-শু নীতি অনুযায়ী মার্কিন প্রভুদের চরণদাস হওয়ার জন্যে নিবেদিত হবে কি আমাদের সমস্ত অধ্যবসায়? তাহলে ইতিহাস মুছে যাবে এখন, এই নির্মানবায়ন প্রক্রিয়ার তুমুল সন্ত্রাসে? এই জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য মীমাংসা আমাদের কাছই রয়েছে, অন্য কোথাও নয়। দানবিক শক্তির দম্ভে যারা স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-মানবিকতাকে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের আগুনে ইন্ধন করে তুলেছে—এরাই আবার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বনাম সাধারণ জনগণের বিশ্বব্যাপ্ত প্রধান দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলছে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী মানুষের ক্রমিক অগ্রগতির সত্য এই মুহূর্তে মিথ্যা প্রচার ও বারুদের কটু ধোঁয়ায় যতই ঝাপসা হতে দেখি না কেন, শেষ কথা মানুষই বলবে নিশ্চয়। বস্তুত এই ধোঁয়াশার মধ্যেও দেশে-বিদেশে শান্তিযোদ্ধা সংস্কৃতি-শ্রমিকেরা একজোট হয়েছেন, পথে-পথে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ববাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

একুশ শতকের তৃতীয় বছরে প্রমাণিত হলো, এই নতুন শতাব্দীতে সমগ্র মানব জাতির ঘৃণ্যতম শত্রু হলো বোম্বেটের দল। সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বসে যাওয়ার পরে

পৃথিবীতে মার্কিনী গুণ্ডামি যেভাবে দেখা গেছে, তা সমস্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশের পক্ষে ভয়ানক বিপদের কথা। সোভিয়েট রাশিয়া যতদিন ছিল, নেকড়ে ও শকুনেরা এত দুঃসাহসী হয়ে ওঠেনি। গত কুড়ি বছরে এরা প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের উস্‌কানি দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। গণতন্ত্র-স্বাধিকার-প্রগতি বারবার ধর্ষিত হয়েছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিশ্বায়নের ফাঁস। দখলদারির রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ বিশ শতকের শেষ কয়েকটি বছরে নিরঙ্কুশ হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তানে ওসামা-বিন-লাদেন ও তালিবান তো মার্কিনীদের অপসৃষ্টি ; পরে হাত থেকে আম বড়ো হয়ে গেল যখন, বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগন আক্রান্ত হল। এমন না ঘটলেও আফগানিস্তানকে ওরা ছারখার করতই। কারণ, ভূ-রাজনীতি ও তেল-অর্থনীতির বাধ্যবাধকতা। বিশ্ববিবেক যখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসকদের হাতে জিম্মা থাকে, লাখে-লাখে মানুষ মরলেও কাগুজে বিবৃতি আর কূটনীতির প্যাঁচ-পয়জার ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের কাছে, দেশে-দেশে, গত কয়েক বছরে রাষ্ট্রযন্ত্র অবান্তর ও ভাঁড়দের মহাসভা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। উপগ্রহ-প্রযুক্তির ওপর দখলদারির সুযোগে বার্তাবাহী চ্যানেলগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে পাইক-বরকন্দাজে পরিণত করেছে, সংবেদনশীল মানুষেরা এদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

ইরাক-যুদ্ধে ইন্টারনেটের ওপর শকুনের ছায়া পড়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বেয়াদব ওয়েবসাইটকে হয় মুছে দিয়েছে প্রভুত্ববাদীরা নয়তো এদের বিকৃত করেছে। তবু, বিকল্প সংবাদ বিকল্প বক্তব্য বিকল্প অবস্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী নিজেদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ঘোষণা করছেন। ইন্টারনেটকে সদর্থক ভাবে কাজে লাগাতে না পারলে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে লাখ-লাখ মানুষ জমায়েত হতে পারতেন না। কার্লো জিউলানি শহিদ হতেন না ; ইরাকে প্রসূতিসদন, গ্রন্থাগার ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হানার পরে লুঠতরাজের খবরও আমাদের কাছে পৌঁছাত না। একুশ শতক যদি আফগানিস্তান ও ইরাক ধর্ষণের কালো ছবি দিয়ে শুরু হয়ে থাকে, তা ইতিহাসের সম্ভাব্য নতুন অধ্যায় সূচনার প্রতি তো তর্জনি সংকেত করছে। এই অধ্যায়ে একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র, অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক জনগণের যুক্তফ্রন্ট। যতদিন যাবে, এই প্রধান দ্বন্দ্ব আরও ব্যাপক ও শানিত হয়ে উঠবে। অন্তত এখনকার সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজকর্মীদের ন্যূনতম ও প্রধানতম দায় বলে বিবেচিত হোক এই দ্বন্দ্বকে সচেতন ভাবে ব্যাপকতর ও শানিততর করে তোলা।

হাতির গোদা পায়ের নিচে পিঁপড়ের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে যেসব মতলববাজেরা 'যুদ্ধ' বলে সম্ভ্রান্ত করতে চায়, ওদের ধারণা, এভাবেই ওরা দুনিয়ার তাবৎ বোকাসোকা লোকেদের চোখে ঠুলি পরাতে পারবে। অন্তত, শয়তানি সাম্রাজ্যের শাহানশাহ বুশ ভয় দেখাতে পেরেছে তাদের যারা তাকে কুর্নিশ করে না, তার কথামতো ঘুঙুর পরে নাচে না এবং হিজড়ে ও বিদূষক সাজে না। কেননা এই উদ্ধত দানবটি মাত্র কিছুদিন আগে, হিটলার মুসোলিনীর কায়দায় চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, যারা আমেরিকার সঙ্গে নেই,

তারাই শত্রু। তার মানে, এই একুশ শতকে কোথাও কোনো অপর পরিসর বা সমান্তরালতা থাকবে না, থাকতে দেওয়া হবে না কোনো দ্বিরালাপের সম্ভাবনা। ভিন্নমত পোষণ করার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হবে না এই নতুন বিশ্বে। বিশ্বায়ন মানে মার্কিনীকরণ, আরও চাঁছাছোলা ভাষায় বলা যায়, বুশীকরণ বা বুশায়ন। ওবামার জমানা এরই ধোপদুরস্ত সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ যে মানববিশ্বের বয়ান পেশ করেছিলেন, এই বুশীকরণ প্রক্রিয়া রয়েছে ঠিক তার উল্টো মেরুতে। এ হলো দশমাথা বিশ হাতওয়ালা রাবণের নীতি ; দুনিয়ায় যেখানে যত সম্পদ রয়েছে, সব কিছুতে বুশ ও তার উত্তরসূরির সাঙ্গপাঙ্গদের অধিকার শুধু। বহুজাতিক সংস্থার শুঁড় দিয়ে সব রস শুষে নেওয়াকে যারা বিরোধিতা করবে, তারাই কোতল হবে। কোতল করার আগে শত্রুদের মুখে মাখিয়ে দেওয়া হবে চুনকালি ; অজস্র বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম সহ সমস্ত ঢোল-শহরতের ওপর কব্জা বুশ-পাওয়েলদের। দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে এদের জুড়ি নেই, গোয়েবলস্ এদের খাস কংসমামা। অতএব ইরাকের সম্ভাব্য বার্ষিক তেলসম্পদ (এই মুহূর্তে গোমস্তা সৌদি আরবের তুলনায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় হলেও সমস্ত উৎসকে কাজে লাগালে প্রথম হতে পারে) (তিরিশ হাজার কোটি ব্যারেল) নিঙড়ে নেওয়ার জন্যে সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে গেছে। এখনও চলছে চোঁয়াঢেঁকুর।

মূল মন্ত্র হল পরিচিত সেই ইংরাজি প্রবাদ : কুকুরকে মেরে ফেলার আগে তার বদনাম করো। বুশ-ব্লেয়ারের তিনটে ধারণা খুব বদ্ধমূল ; এক, জনতার চেঁচামেচিতে কান দিলে বড়ো কাজ করা যায় না ; দুই, জনতার স্মৃতি খুব দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী ; তিন, উত্তেজক ও ভীতিকর কিছু গুজব ছড়িয়ে দিলে কেল্লা ফতে। এই তৃতীয় নীতি অনুযায়ী আফগানিস্তানকে শায়েস্তা করার সময় অ্যানথ্রাক্স আর ইরাকের টুঁটি টিপে ধরার সময় সার্স-এর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে বুশ সাহেবের চেলারা। বুশায়ন মানে, কেউটে হয়ে ছোবল দাও এবং ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসো। কিংবা, একই অসুখে দুটো আলাদা দাওয়াই দাও। তাই আফগানিস্তান থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার মূলোচ্ছেদ করার জন্যে ধর্মান্ধ তালিবানদের তৈরি করেছে মার্কিন প্রভুত্ববাদ ; মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলিতে জন্ম দিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে, পরে আরব জাতীয়তা ও ইউরোর সম্ভাব্য সম্পর্ককে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে ঝি-কে মেরে বউকে শেখাতে চেয়েছে। গত শতকে ইরাক-ইরানের যুদ্ধ লাগিয়েছিল কারা? ঐ মার্কিনীরা। ইরানের সম্রাট কাদের প্রশ্রয় পেয়েছিল, খোমেইনি কাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ দেখছে? এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, ইরাকে মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ছক তৈরি হচ্ছে কাদের উৎসাহে? আফগানিস্তানে ছিল সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইরাকের সাদ্দাম তো লাদেনের মতো পৃথিবীর কোথাও সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করেননি। সাদ্দামের প্রধান বিরোধী দল ছিল আল-কায়দার ঘনিষ্ঠ ইনসাফ-আল-ইসলামি নামে সংগঠন। তাহলে? সাদ্দামের ইরাকে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল , নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক পুনর্গঠনের নামে ওখানে এখন

মধ্যযুগের অন্ধকার ফিরে আসবে। আর, তা ঘটবে যুদ্ধোন্মাদ রক্তচোখ ড্রাকুলার হিংস্রতম অবতার বুশ ও ওবামা সাহেবের প্রত্যক্ষ মদতে। সাদ্দাম যদি একনায়ক, বুশ তবে কী? কদিন আগে জানা গেছে, খোদ মার্কিন মুল্লুকে যুদ্ধবিরোধী জনতার প্রতিবাদে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ 'গ্রেট ডিক্টেটর' ভাবছে, পাজি বেয়াদবদের কিছু কিছু গঠনতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করা যেতে পারে।

এই তো ছিল বুশের গণতন্ত্র যেখানে গণ নেই ঘাতকতন্ত্র আছে শুধু। বুশের বন্ধুদের সর্বাঙ্গ গলিত হলেও বাধা নেই ; অবশ্য মার্কিনী অভিধানে বন্ধুত্ব পদলেহনের মর্যাদাপ্রাপ্ত। যেমন পাকিস্তানের শাসক পারভেজ মুশারফ কিংবা বেনজির-পতি জারদারি। আফগানিস্তান-বসনিয়া সহ নানা দেশে যারা হাজার-হাজার সাধারণ মানুষকে খুন ও সর্বস্বান্ত করে, সারা জীবনের মতো পঙ্গু, ভিখিরি ও উদ্বাস্তু করে, তাদের মতামতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুতুল সরকার বসিয়েছে, তাদের পালের গোদার মুখে 'গণতন্ত্র' ভূতের মুখে রাম নাম ছাড়া আর কী? এই গণতন্ত্র হল এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পর্যায়ে প্রভুত্ববাদীর হাতের তাস। এর মূল নীতি সুকুমার রায়ের ছড়ার ভাষায় এরকম : 'আমরা খাব মণ্ডা-মিঠাই/আমরা খাব চমচম/তোমরা সে-সব পাবে না কো/পেলেও পাবে কমকম।' তাই তো মার্কিনীদের পরমাণু-অস্ত্র রাসায়নিক-অস্ত্র জীবাণু-অস্ত্র থরে থরে মজুত করতে বাধা নেই। কিন্তু ওইসব গণবিধ্বংসী অস্ত্র ইরাক মজুত করছে বলে শোরগোল তুলে, রাষ্ট্রপুঞ্জের তথাকথিত পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়ে ইরাককে পিষে মারার অজুহাত তৈরি করতে অসুবিধে নেই। ইরাক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুই তো বেরোল না। তবু এই প্রশ্ন ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়া-জাপান : কেউই করছে না, কোথায় গণবিধ্বংসী অস্ত্র? ঘোর সাদ্দাম-বিরোধী ইরাকি পরমাণুবিজ্ঞানী ড. ইমাদ খাদ্দুরি প্রবন্ধ লিখে জানিয়েছিলেন, ইরাকে হামলার পেছনে কোনো কারণ ছিল না। তবু নির্লজ্জতার বান ডেকেছে প্রভুত্ববাদের চাপরাশিদের মধ্যে। উলঙ্গ রাজার দিকে প্রকাশ্যে আঙুল তুলে যারা বলেছে 'রাজা তুই ন্যাংটো'—তাদের কণ্ঠস্বর ডুবে গেছে ক্রুজ মিসাইলের ভয়ংকর বিস্ফোরণে।

পেট্রোলিয়াম কোম্পানির মালিক বুশ পরিবার এখন আর ছুঁচ হয়ে ঢোকে না, সরাসরি ফাল হয়েই ঢোকে। ইরাককে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার পরেও স্পর্ধিত ইরাকিরা হাজারে-হাজারে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন : 'দখলদার বাহিনী, ইরাক ছাড়ো'। এই প্রতিবেদন লিখতে লিখতে জানলাম, মার্কিনী সেনাপতি বলছে কভি নেহি। আরও অ-নে-ক দিন এদেশের কলকব্জা ঠিক করার জন্যে আমরা থাকব। হল্লারাজার আরও সেনা ঢুকছে ইরাকে। কেননা বেয়াদব ইরাকিরা বলছে, ইরাক আমাদের। আমরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ চালাব! আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রত্নসম্পদ লুঠ হয়ে গেল ; ইতিহাসকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হলো! ন্যায়-নীতি-মানবতাবোধ মাটিতে মিশে গেল। ডলার ও ইউরোর যুদ্ধ শ্বেতাঙ্গদের রুটি ও মাখনের লড়াই ; উলুখাগড়ার প্রাণ গেল তাতে। হেনরি কিসিঙ্গারের কুখ্যাত বই 'ডাজ আমেরিকা নিড এ ডিপ্লোম্যাসি'র সরল বীজগণিত আরও একবার বাস্তবে দেখা গেল। না, আমেরিকার কূটনীতি চাই না,

আন্তর্জাতিক আইন চাই না, রাষ্ট্রসঙ্ঘ চাই না। যা-খুশি যখন খুশি যেমন-খুশি করাই যেহেতু বিধি। আমেরিকা যাকে চাইবে, প্রতিটি দেশের সরকার চালাবে সেই ব্যক্তি। সার্বভৌমত্ব এখন থেকে অতীতের মহাফেজখানার প্রত্নবস্তু কেননা গোটা পৃথিবীতে বুশায়ন হি কেবলম। জনমত বলে কিছু নেই ; যেহেতু মানুষ নামক প্রাণী থাকলেও মনুষ্যত্ব অবান্তর।

মার্কিন বাজেটে ঘাটতি উনিশ হাজার কোটি ডলার, মার্কিনীদের ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত ঋণের পরিমাণ পৌনে দু-লক্ষ কোটি ডলার। তাই ওদের অঢেল তেল চাই নইলে শক্তিমদমত্ততার মূল স্নায়ুকেন্দ্র টলে যাবে। ওদের ডলার চাই কাঁড়িকাঁড়ি যাতে ইউরো ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে না পারে। ওরা বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে কেননা ওদের মনস্তত্ত্বের গভীরে রয়েছে বিপুল ভয়। তাই বিশ্বায়ন, থুড়ি বুশায়ন-এর নামে সব কিছু একাকার করে দিচ্ছে ওরা। এই কালবেলায় তবু প্রতিরোধেও নতুন প্রকরণ তৈরি হচ্ছে। দাঁত-খিঁচানো পেশি-ফোলানো ভয়ঙ্করকে ভয় দেখানো ওই প্রকরণের অঙ্গ। না-মানুষী জান্তব কুশ্রীতার বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব জুড়ে স্বপ্নময় সম্ভোগের জাল ছড়ানোর বিরুদ্ধে, ঘরে ঘরে মহল্লায় মহল্লায় সংস্থায় সংস্থায় বুশায়নের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত তর্জনি তুলে দেখানো এবং সব ধরনের প্রতিবাদী মানুষের যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলাই আজকের দায়।

ইরাক যদি কালবেলার কৃষ্ণবিবরকে উন্মুক্ত করে থাকে, মানুষের পাশে মানুষ হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে, মানুষের জমায়েতে মানুষ খুঁজে নেওয়ার জন্যে জরুরি প্রস্তুতি তো শুরু হল এখন। নতুন নতুন পথে নতুন নতুন পাথেয় খোঁজা চলুক অবিরাম। আর, প্রতিটি মুহূর্তে চলুক বুশায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লড়াই, নিরবচ্ছিন্ন ক্রোধ ও ঘৃণার অঙ্গীকার।

ভাষা ও অস্তিত্ব

উনিশে মে, আমাদের উত্তরাধিকার

'হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ'—এই শিরোনামে এবার শিলচর শহরে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করা হলো। পঁচিশে বৈশাখ থেকে এগারোই জ্যৈষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। আঁখির দুটি তারা। নিজেদের নতুন ভাবে মনে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে : 'বাঙালিত্বই অন্বিষ্ট—হিন্দুত্ব নয়, মুসলমানত্ব নয়, অন্ধ ও বধিরদের সমাজে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারে একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশে মে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বন্দিত একুশে ফেব্রুয়ারি তবু তো উদ্‌যাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু ১৯৬১ সালের ১৯ মে তো ব্রাত্য ছিল ক-বছর আগেও। আসামের শিলচর শহরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় করতে গিয়ে ওইদিন এগারো জন শহিদ হয়েছিলেন, সে-খবর বহুলোক জানতেন না এই সেদিন পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহরত বাঙালিদের উপর স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক পর্যায়ে আসাম সরকারের পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল। এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আমাদের চেতনায় যতটা আলোড়ন তুলতে পারত, পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা দিতে পারত—তা কিন্তু হয়নি। আমাদের পারাপারহীন ঔদাসীন্যে এতটুকু চিড় ধরেনি কোথাও।

তবু উনিশে মে-র কাছে ফিরে যেতে হয়। নিষ্কর্ষ খুঁজতে হয় পুনর্নির্মাণের। ভাষা আন্দোলন চলমান এক প্রক্রিয়ার নাম : কোনো একটা বিশেষ তারিখ অন্য দিনগুলির তুলনায় উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, এইমাত্র। ভাষা-সংগ্রামের বহুমুখী মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন করে বুঝি, বৃহত্তর গণসংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হল ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বরকত-সালাম-জব্বারেরা শহিদ হয়েছিলেন বলেই ধাপে ধাপে তৈরি হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলা নামে দেশের জন্ম-লগ্ন। ইতিহাস ও ভূগোলের যৌথ আক্রমণে বরাক উপত্যকা (আসামের দক্ষিণ অংশে সাবেক কাছাড় জেলা) যেহেতু প্রান্তিকায়িত হয়ে পড়েছিল, তার গভীর সর্বাত্মক সংকট কখনো তেমন মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠেনি। বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঐতিহ্যাগত ভাবে শ্রীহট্ট বা সিলেট বৃহত্তর বঙ্গভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও ধূর্ত ব্রিটিশ ১৮৭৪ সালে তাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। এতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-নির্ভর রাষ্ট্রযন্ত্র রাজস্বখাতে অনেকটা লাভবান হল যদিও, 'বাঙালির আধিপত্য' নামক জুজুর ভয় দেখতে শুরু করল কেউ কেউ। ক্রমান্বয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধির বিষবৃক্ষে শুধু জল সেচনই করা হল। দেশ বিভাজনের সময় গণভোটে সিলেট আসাম থেকে সরে গিয়ে যুক্ত হল পূর্ব পাকিস্তানে। শুধু সাবেক সিলেটের পূর্ব প্রান্তের কিছু অংশ যুক্ত হল দেশভাগ পরবর্তী কাছাড় জেলার সঙ্গে। এই নতুন কাছাড় ভৌগোলিক- সাংস্কৃতিক-

ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গভূমিরই অংশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ভূমিও মমতা-বিহীন কালস্রোতে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিত। বহু শতাব্দী থেকে বাঙালিদের নিরন্তর প্রব্রজন চলেছে এখানে, বাংলাই এখানকার ভাষা—কী সাহিত্যে কী গণসংযোগের মাধ্যম হিসেবে। ইতিহাসের বিচিত্র জটিলতায় তা আসামের অঙ্গ হলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে এর কোনো আত্মিক সংযোগ কখনও ছিল না।

দেশ বিভাজনের পরে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্ব হারিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি এলেন বরাক উপত্যকায়। তাঁরা কয়েক প্রজন্মের ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়েছিলেন ; কিন্তু নতুন করে ভাষার অভিজ্ঞান হারাতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা সবাই উপভাষা অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন, এখনো বলেন। কিন্তু দেশ বিভাজনের আগে যেহেতু তাঁদের বাঙালিত্ব বা কথ্যভাষার স্বরূপ সম্পর্কে কখনো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, তেমনি বাস্তুহারা হয়ে বরাক উপত্যকায় আসার পরে নতুনভাবে প্রশ্ন ওঠার কোনো কারণ ছিল না। আসামের পশ্চিম-প্রান্তিক জেলা গোয়ালপাড়াকে অসমিয়াকরণ নীতির সহজলভ্য শিকারে পরিণত করার পরে কাছাড় সম্পর্কেও একই নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভাষিক সম্প্রসারণবাদীদের চক্রান্ত যখন কাছাড়ে প্রতিহত হল, অসম সাহিত্যসভার মতো উগ্র আগ্রাসনপন্থী সংস্থা ও সরকারি আমলাতন্ত্র কাছাড়ের বাঙালিদের ভাষাকে বাংলা নয় বলে প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগল। জনগোষ্ঠীর যেসব অংশ শিক্ষার অভাবে পশ্চাৎপর, ভীরু ও লোভী হয়ে উঠেছিল, তাদের নানাভাবে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদীরা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করতে চাইল। উপভাষা ও বিভাষার বৈচিত্র্যকে অসমিয়ার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করার জন্যে সরকারি পণ্ডিতেরা 'থিসিস' লিখলেন নানারকম। তাই বরাক উপত্যকার ভাষাসংগ্রামের অনেকগুলি দিক রয়েছে। এখানকার বাঙালিকে তার নিজস্ব জাতিসত্তা ও ভাষিক পরিচয়কে প্রমাণ করতে হচ্ছে তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে। বাংলাদেশে তা অন্তত করতে হয় না। আসলে মূর্খ যখন ধূর্ত ও কুচক্রী হয়ে ওঠে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। তাই ভাষা-সংগ্রাম নিয়ত নবায়মান সংকটের দিকেও তর্জনি সংকেত করে। বুঝিয়ে দেয়, এই সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান এবং স্তর থেকে স্তরান্তরে আক্রমণ মোকাবিলা করার ধরনও আলাদা-আলাদা।

এই প্রেক্ষাপট বুঝে নেওয়াটা খুব জরুরি। নইলে, 'আসামে অসমীয়া ভাষা চলবে না তো কি তামিল, তেলেগু চলবে' গোছের ফাঁপা সপ্রতিভতা দেখানোর রেওয়াজ চলতে থাকবে। সবচেয়ে পরিতাপের কথা, বাঙালিরাই তাঁদের অনেক ভুবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন ; এমন কী, দূরীকৃত অপর পরিসরগুলি সম্বন্ধে প্রায় নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। এইজন্যে ১৯ মে-র তাৎপর্য অনুধাবন করা সমস্ত বঙ্গভাষীর পক্ষে আবশ্যিক। নিছক কোনও দিবস উদ্‌যাপনের জন্যে নয়, জাতিসত্তা ও ভাষাসত্তার বহুস্বরিক নিষ্কর্ষ পুনঃপাঠ করার জন্যে ১৯ শের চেতনা হয়ে উঠতে পারে দর্পণের মতো। শাসকের তৈরি কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্র বাঙালির ভুবনকে বহুধা-বিচ্ছিন্ন করলেও সামূহিক

অস্তিত্বের বোধে পুনঃদীক্ষিত হতে পারি যদি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিভ্রান্তিকে অনেক কার্যকরী ভাবে প্রতিহত করতে পারব। এ ব্যাপারে বরাক উপত্যকার মতো প্রান্তিক জনপদের সংগ্রামী মানুষেরা অবিভাজ্য বাঙালি সত্তার নিরীক্ষা-সংকট-উত্তরণ সম্পর্কে মূল্যবান উপলব্ধির সংকেত যোগান দিতে পারেন।

২

কালের যাত্রার ধ্বনি সবাই শুনতে পান না : অস্বস্তিকর এই সত্য মেনে নিতে হয়। আত্মবিস্মৃতির আয়োজন আঞ্চলিক-জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে এত নির্বাধ যে মেকি ইংরেজিয়ানা ও মোটা দাগের হিন্দিয়ানা, বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মকে, প্রায়-সম্পূর্ণ অনিকেত করে দিয়েছে। ব্যক্তি-জীবন ও সামাজিক অস্তিত্ব থেকে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে আমরা এখন বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী ভোগবাদ ও পণ্যদেববাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছি। ১৯ মে-র এগারো জন শহিদের বুক-মাথা ফুটো-করে-দেওয়া বুলেটের হিংস্র শিস আমরা কেউ শুনতে পাই না। শুনতে পাই না ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট ও ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে শহিদ হওয়া আরও তিনজন মত্যুজিৎ তরুণের বার্তা। দেখতেও পাই না কোথায় অন্ধকারের শুরু আর কোথায় শেষ। আমরা বধির, আমরা অন্ধ। আমরা সেই জগদ্দল পাথর, সময়-শৈবাল যাদের ঢেকে দিয়েছে। তারিখ কি কেবলই তারিখ, ক্যালেণ্ডার থেকে ঝরে--যাওয়া যে-কোনো একটি পাতা?

'মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম আজি নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়'—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এরকমও বলা কঠিন। যদিও গত কয়েক বছরে বরাক উপত্যকায় ১৯ মে যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে এবং অন্তত কয়েক বছর ধরে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্য দু-তিনটে জেলা শহরে এদিন কিছু কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে—তবু বলা যায়, ১৯-এর চেতনা আজও প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। পায়নি কারণ দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো অবসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আজও হয়নি। আসলে ইতিহাসও মূলত এক প্রতিবেদন যাকে অনুভূতি দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে অধ্যবসায় দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। ইতিহাসের কাছে তেমন কোনও দায় বোধ করিনি বলেই এই সেদিন পর্যন্ত স্বরচিত হিম নীরবতার দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী ছিলাম আমরা।

মাত্র ক'বছর হল, বরাক উপত্যকায় ভাষা-সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য ও স্মৃতিচারণ মূলক বই বেরিয়েছে। এইসব উদ্যমের প্রশংসা করেও বলব, এদের একটিও পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা কোথাও নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব খুব প্রকট আর কোথাও নিরপেক্ষতার। ১৯৬১-এর ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে আসামের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সূচনাপর্বে হয়তো বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের প্রভাবে সেই বিভ্রান্তি অনেকখানি কেটেও গিয়েছিল। এই বিষয়টি জেনেশুনে যাঁরা চেপে যেতে চান, তাঁরা ভাষা-সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে সামান্যতম স্বীকৃতি দিতেও নারাজ। এর প্রভাব স্পষ্টত পড়েছে ভাষা-সংগ্রামের

ইতিহাস রচনায়। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার চিরাচরিত বিপ্রতীপতা কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের রাজ্যিক নেতৃত্বকে ভাষা-সংগ্রামের বাস্তবতা সম্পর্কে অসংবেদনশীল করে তুলেছিল—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির তথ্য-সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়নি। ১৯৯৪ সালে শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিভাগ প্রণালীবদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে এই জরুরি কৃত্যটি করতে পারতেন। কিন্তু এধরনের কোনও উদ্যম আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হল না কেন, তা ভেবে বিস্মিত ও বিষণ্ণ হই।

সবেমাত্র ইতিহাস প্রণয়ন শুরু হয়েছে। তাই হয়তো ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে বরাক উপত্যকার ভাষা-আন্দোলনে কীভাবে দুটি পর্যায় তৈরি হল, তার বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্লেষণগর্ভ প্রতিবেদন এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আসামের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত নির্দেশিকার প্রশ্নে গণআন্দোলন কিন্তু ১৯৬১-এর ভাষাসংগ্রাম থেকে চরিত্রগত ভাবে আলাদা। যতদিন পর্যন্ত সমস্ত পর্যায় ইতিহাসের আধেয় না হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান ভাষাসংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ হবে না। আরও কিছু অনাবশ্যক জটিলতাও স্থায়ীভাবে নিরাকৃত হওয়া উচিত। ১৯৭২-এর ভাষা-শহিদ বিজন (বাচ্চু) চক্রবর্তী যেহেতু গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতা ছিলেন এবং সে-সময় কোনো একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক, চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে ওই পর্যায়ের ভাষাসংগ্রামকেও অস্বীকার করেছেন কেউ কেউ। এ ধরনের পক্ষপাতপূর্ণ ও রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রবণ মনোভঙ্গি চল্লিশ বছর পরেও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে ; নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনায় আজও তা বড়ো বাধা। উল্টো দিক দিয়ে, উদ্যমের চূড়ান্ত অভাব রয়েছে জনগণের প্রগতিশীল অংশেও। স্মৃতিকথা লিখে উৎসাহ শেষ হয়ে যাচ্ছে এঁদের, প্রণালীবদ্ধ ঐতিহাসিক প্রতিবেদন রচনার কোনো চেষ্টা করেননি এঁরা। সব মিলিয়ে, বাংলাদেশের ভাষাসংগ্রামের প্রতিতুলনায় কেবল দ্বিমেরুবিষমতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে লাগাতার লড়াই করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উন্মোচন প্রক্রিয়া প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ক্রমাগত শানিততর হয়েছে। কিন্তু আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিনিধিরা যেহেতু কৌশলে বরাক উপত্যকার ভাষা-আন্দোলনকে ছিনতাই করে নিয়েছে বারবার, গণতান্ত্রিক চেতনার অন্তঃসার তেমন ভাবে বিকশিত হতে পারেনি। তেমনই মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেও তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি।

এই আত্মসমালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বস্তুত খোদ বরাক উপত্যকায় প্রতিবাদী চেতনা অস্তমিত। ইন্টারনেট জমানায় বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ পরিস্থিতি। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলিতে হাঁসজারু ও বকচ্ছপদের বাড়বাড়ন্ত। ভাবা যায়, এরা বাংলা বই পড়ে না, বাংলা গান শোনে না, বাঙালির উত্তরাধিকার নিয়ে এদের কোনো শ্রদ্ধা নেই। যে-কোনো মূল্যে সাফল্য-মৃগয়ায় টিকে থাকাই এদের একমাত্র নীতি ; এরা প্রকাশ্যে ভাষা-আন্দোলন ও

শহিদের স্মৃতিচারণকে বলে 'টিপিক্যাল সেন্টিমেন্টালিটি'। আত্মবিস্মৃত উত্তর-প্রজন্ম এইমাত্র জানে যে উনিশে মে শিলচর রেল স্টেশনে গুলি চলেছিল। মারা গিয়েছিল এগারোজন যাদের বছর-বছর ভাষা-শহিদ বলে প্রচার করা হয়। মোড়ে মোড়ে ধূসর ফটোতে মালা চড়ানো হয়, কয়েক ঘণ্টার জন্যে তৈরি বেদিতে ধূপকাঠি জ্বলে। গান-বক্তৃতা-কবিতা হয় এদিক-ওদিক। গত ক'বছর ধরে ক্যাসেট বেরোচ্ছে, পুস্তিকা বেরোচ্ছে। খবরের কাগজের কলমচিদের সেদিন অন্তত বিষয় খুঁজতে হয় না। বছরের বাকি তিনশ চৌষট্টি দিন যত রবি জ্বলুক না, আঁখি মেলে তাকায় না কেউ। পিঠ পুড়তে থাকলে শুধুমাত্র ফিরে শোওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করে। কিন্তু উত্তর-প্রজন্মের কথাই বা লিখছি কেন, আম-জনতার কাছেও বাংলা নামে দেশের উত্থান কোনো তাৎপর্য নিয়ে আসেনি। ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বন্দীশালা ভেঙে বাঙালি জাতি হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় উত্তরণ ঘটেনি। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পাননি কেউ। আপাত-সময়ের রঙিন মুখোশে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত প্রায় সবাই, বিশেষত বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীরা চূড়ান্ত আত্মপ্রতারক এবং কস্তুরীমৃগের মতো আপনার গন্ধে আপনি বিভোর। প্রকৃত সময়ের গভীর সংবেদনায় প্রাণিত হতে এখনও অনেক বাকি।

৩

মেকি নাগরিকতার দর্পে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বর্গের একটা বড়ো অংশের কাছে ভাষা-সংগ্রামের পরম্পরা কোনও তাৎপর্য বয়ে আনে না। উপভাষাগত পরিচয় কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। বাঙালি হয়ে ওঠার চেয়ে নো ম্যানস্ ল্যাণ্ডে দাঁড়ানো দোআঁশলা অস্তিত্ব হয়ে ওঠা বরং অনেক সহজ। এরা ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়ান এবং পরে ব্যাঙ্গালোর-হায়দ্রাবাদ কিংবা অন্য কোথাও পাঠিয়ে ডলারের স্বর্গরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার পাসপোর্ট সংগ্রহ করার স্বপ্ন দেখেন। ভাষা-সংস্কৃতি চেতনা নিয়ে এরা কিছুমাত্র চিন্তিত নন বলে অসমিয়াকরণ বা হিন্দিকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এদের কোনও বক্তব্য থাকে না। ফলে বিচিত্র স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত এখনকার বাঙালি সমাজ।

এর একটা বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তরঙ্গাভিঘাত থেকে দুটো চারটে ছোট ঢেউও এখানে পৌঁছায়নি। ভাষিক চেতনা বিকশিত হতে পারত শিক্ষাপ্রসারের আন্দোলন এবং তার সহযোগী দীপায়ন ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালিত হলো। এখানকার মধ্যবিত্ত বর্গের বিলম্বিত বিকাশ এবং নগরায়নের অতিধীর লয়ে গ্রাম-শহরের বিভাজনকে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে জগদ্দল পাথর করে তুলছে। তার ওপর মধ্যবিত্ত বর্গের উৎসগত চরিত্র অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় হিন্দু হিসেবে তাদের পরিচিতি এবং শিলচর-করিমগঞ্জের নাগরিক সমাজে তাদের উজ্জ্বল অবস্থান নিম্নবর্গীয় গ্রামীন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমাগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কৃষিভিত্তিক সামন্ত সমাজের স্বাভাবিক স্থবিরতার সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কূপমণ্ডূকতা যুক্ত হওয়ার ফলে ওই বিরূপতা ভুলভাবে সাম্প্রদায়িক চেহারা নিয়েছে। কিংবা দৈনন্দিন প্রয়োজনে

ব্যবহৃত নিজস্ব বিভাষার গোত্র-পরিচয় জানার কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকাতে সংঘবদ্ধ হীনমন্যতা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আত্ম-নিরাকরণে পরিণত হয়েছে।

এই আত্ম-অস্বীকৃতির ফলেই বাংলা ভাষা হয়ে পড়ছে দূরবর্তী কোনও নক্ষত্রের মতো ঝাপসা। নিশ্চেতন মন সবচেয়ে আগে উপনিবেশের দখলে যায়, তা বাইরের হোক কিংবা ভেতরের। বরাক উপত্যকার অন্তেবাসী গ্রামীন হিন্দু-মুসলমান এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। এদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বর্গের অনুপস্থিতি এবং ধর্মীয় কুহকের নির্বাধ বিস্তার নিজেদের বাঙালি বলে চিনতে দেয়নি। এছাড়া আরো একটা গুরুতর কথাও আছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় নাড়া বাঁধা বলে ভাষিক সম্প্রসারণবাদ ও অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদের সহজ শিকার বরাক উপত্যকা। একটু আগে বিভাষাগত পরিচয়ে যে-বিভ্রান্তির কথা বলেছি, তা এখানকার আধা-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই। সহজ পথে কিছুই এখানে অর্জনীয় নয় বলে সব কিছু বাঁকা পথে চলে। উপনিবেশীকৃত মনে কোনও প্রতিরোধ থাকে না। তাই শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত নির্বিশেষে একই নিয়ম প্রযোজ্য এখানে। ভাষা-সংগ্রামের উত্তাপ যত বেশি স্তিমিত হয়ে আসছে, আত্মসমর্পণের প্রবণতা বাড়ছে তত। যাদের কাছে বরাকভূমি সহজ মৃগয়াক্ষেত্র, তারা কিছু কিছু মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের তৈরি করেছে। এরাই ভাষা-চেতনার হননকারী। চতুর হিসেব কষে এরা উসকে দেয় সাম্প্রদায়িক অপচেতনাকে, অন্ধতাকে নিরঙ্কুশ করে রাখে নানা অজুহাতে এবং এরাই মূঢ়তাকে সম্বল করে। এরাই সাপ হয়ে ছোবল দেয় এবং ওঝা হয়ে বিষ ঝাড়তে আসে। এরাই বরাক উপত্যকার জনজীবনে বহুস্বরসঙ্গতির প্রবণতাকে নষ্ট করতে চায়। বাংলার বিভাষাকে অসমিয়ার গাঁটছড়ায় বাঁধতে চায় ; কেননা এতেই আধা-ঔপনিবেশিক রাজনীতি-অর্থব্যবস্থা-অপসংস্কৃতির পুষ্টি। এইসব মধ্যস্বত্বভোগীরা স্থানীয় মোড়ল কিন্তু আসলে রাজ্যিক কেন্দ্র ও দিল্লির মসনদের প্রতাপযন্ত্রের সেবক। এদের থাবার নিচে লুকোনো বাঘনখ সহজে চোখে পড়ে না সাধারণ মানুষের।

তাই ভাষা-সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের চেতনাকে জারি রাখার কঠিন লড়াই সামনে : এই বার্তা প্রতিবার নিয়ে আসছে উনিশে মে। নিশ্চয় মুখ্যত বরাক উপত্যকার আত্মবিস্মৃত বাঙালিদের জন্যে, কিন্তু গৌনত কি পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গভাষীদের জন্যেও নয়? এটাও ঠিক, বরাক উপত্যকাতেই শিশুপাঠ্য বইগুলিতে অবাধে চলছে বাংলা ভাষার বিদূষণ। অসমিয়া শব্দ ও বাক্যবন্ধ ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে চেতনাকে বাঁধতে পারে সহস্র শৈবালদল। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের দৌলতে মগজ ধোলাইয়ের আয়োজন নির্বাধ, এব্যাপারে দিল্লি-ওয়াশিংটন একজোট। মুছে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ -নজরুল-জীবনানন্দ-সত্যজিৎ-ঋত্বিক। শৈশব থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন সুকুমার রায়-উপেন্দ্রকিশোর-শিবরাম। কে আর খবর রাখে বিভূতিভূষণ-তারাশংকর-মানিকের কথনবিশ্ব কীভাবে জীবনের জয় ঘোষণা করে, কীভাবে ওয়ালীউল্লাহ-হাসান আজিজুল হক-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-শামসুর রাহমান-মোহাম্মদ রফিক অবিভাজ্য বাঙালি

সত্তার প্রতিবেদন রচনা করেন? একদিকে ভাষিক আগ্রাসন অন্যদিকে ধর্মীয়. পুনরুত্থানবাদের চোরাবালি। এদের সম্মিলিত যোগফল হল ভাষাচেতনার শীতলতা অর্থাৎ বঙ্গীয় সংস্কৃতির উত্তাপকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হওয়াতে এবং নানা ধরনের আক্রমণ সইতে সইতে আস্তিত্বিক অভিজ্ঞান সম্পর্কে নিস্পৃহতা। উনিশে মে তাহলে হয়ে উঠুক পুনরুজ্জীবনের প্রতীক ও নবনির্মাণের উৎস। আর, যেকথা বলতে চাইছি, বাঙালির সমস্ত ভুবনে ছড়িয়ে দিক সতর্কীকরণের প্রেরণা। কেননা আস্তিত্বিক অভিজ্ঞানের ওপর আক্রমণ দিনদিন বাড়ছে সর্বত্র। অন্তত গত এক দশকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও ভোগবাদের বিশ্বায়ন ক্রমাগত বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে সত্তার কোষে কোষে। সন্দেহ নেই যে আপৎকালীন পরিস্থিতি এখন সমগ্র বঙ্গভাষী পরিসরে। হয়তো অবস্থানগত দুর্বলতা ও পশ্চাৎপরতার জন্যে বরাক উপত্যকায় আশঙ্কার কালো মেঘ বেশি ভয়ঙ্কর। সুতরাং উনিশের চেতনা সমস্ত বাঙালির কাছেই বিশল্যকরণী হিসেবে গৃহীত হতে পারে। নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না, এ তো সাধারণ সত্য। সাম্প্রদায়িকতার সস্তা রাজনীতি দিয়ে নব্য উপনিবেশবাদের দোসর ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদের পতাকাবাহী আর্যাবর্তের বিপথগামী প্রতিভাবাদর্শ বাঙালি সমাজকে তার হাজার বছরের সংশ্লেষণ মূলক গ্রহিষ্ণু ও উদারনৈতিক ঐতিহ্য থেকে ধ্বস্ত করার জন্যে মরিয়া চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। পৌর সমাজ আজও সাধারণ ভাবে (বরাক উপত্যকার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল বাদ দিয়ে) বিকারগ্রস্ত হয়নি ; কিন্তু রাজনৈতিক সমাজে কিছু কিছু ট্রয়ের ঘোড়া ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। ভয়টা ওখানেই। আর এইজন্যেই উনিশের চেতনার প্রাসঙ্গিকতা। কবি-লিখিয়ে-চিন্তাজীবীদের হাতে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেও যেন, কখনও উঠে না-আসে নিরোর বেহালা। যেন ঘুঁটে পুড়লে গোবর না হাসে।

শুধু বরাক উপত্যকার জন্যে নয় উনিশে, যেমন একুশ ফেব্রয়ারি নয় কেবল বাংলাদেশের। উনিশের চেতনা নয় মৃণালভোজী সম্প্রদায়ের জন্যেও। ভালো বাঙালি হওয়ার জন্যেই উনিশে মে আমাদের জীবনের নবীন যাত্রা রচনায় উদ্বুদ্ধ করুক, নিয়ে যাক রূপ থেকে রুপান্তরে, প্রবল থেকে প্রবলতর উদ্ভাসনে। ভালো বাঙালি যে হতে পারেনি, ভালো ভারতীয়ও সে হতে পারবে না কখনও—ভালো মানুষও নয়। কেননা মৌলবাদের হিংস্র দাপট ও অজস্র প্ররোচনা সত্ত্বেও অবিচল থাকে যে-বাঙালি, উনিশের চেতনা তাকে ঘিরেই পুষ্পিত হয়। চর্যাপদের যুগে আমাদের জাতীয় চেতনার যে অভিজ্ঞান নির্ণীত হয়েছিল, সেই প্রতিবাদী মনন ও বোধ পুনরুজ্জীবিত করে একুশে ফেব্রুয়ারি আর উনিশে মে। উনিশের চেতনা মানে অপরাজেয় মানবিক পরিসর পুনরাবিষ্কার।

নির্বাসিত বাংলার টুটোফাটা দর্পণ

'মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/নির্বাসিতা তুমি/সুন্দরী শ্রীভূমি'—একথা লিখেছিলেন সেই মানুষটি, বাংলা-সংক্রান্ত কোনো কিছু লিখতে গেলে যিনি অবধারিত ভাবে চলে আসেন কলমের ডগায়। তো, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্ববঙ্গ থেকে ঔপনিবেশিক চক্রান্তে বিচ্ছিন্ন শ্রীহট্ট বা সিলেটের কথা লিখেছিলেন। উনিশ শতকে আসামের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আর ১৯৪৭-এর গণভোটের প্রহসনে আসাম থেকে সরে গিয়ে তা চলে গেল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে। এখনকার বাংলাদেশ। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতক ধরে সিলেট-সংলগ্ন কাছাড় জেলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হয়ে রইল বঙ্গীয় সংস্কৃতির পূর্বপ্রান্তিক শেষ জনপদ। মূল স্রোত থেকে সরে থাকার ফলে এখানে জন্ম নিয়েছে বদ্ধ জলরাশির অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা, সকারণ ও অকারণ অভিমান, আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সীমাবদ্ধ পরিসরে বিচরণের অভ্যাস, আত্মতুষ্টি ও উদ্যমহীনতা। তার ওপর এখানকার মানুষদের সাংস্কৃতিক ও ভাষিক অভিজ্ঞান মুছে ফেলার জন্যে চক্রান্তে লিপ্ত আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদ। রাজধানী দিসপুরে যে-শাসকই থাকুক, বরাক উপত্যকার দুখিনী বর্ণমালা তাদের চক্ষুশূল। ছলে-বলে-কৌশলে অসমিয়াকরণ প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়াতে এরা বদ্ধপরিকর। বরাক উপত্যকার আধা- ঔপনিবেশিক অবস্থান ঘুচল না তাই।

আসলে বরাকের প্রান্তিক বাঙালিদের জন্যে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। আর্যাবর্তের মৌলবাদী রাজনীতি হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের নীতি নিয়ে নিকৃষ্ট না-সংস্কৃতির নোংরা এঁদো ডোবার জল গিলিয়ে দিচ্ছে অহরহ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারো শহিদ প্রাণ দিয়েছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে। ১৯৭২-এর আরও একজন আর ১৯৮৬তে দুজন শহিদ হল। নিরবচ্ছিন্ন ভাষা-সংগ্রামের এই ভূমিতে অসমিয়াকরণ আর হিন্দিকরণ এখনও নির্বাধ। উপত্যকার তিনটি উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পরে। আসাম (অসম নয়) নামক প্রদেশের উপনিবেশ এই বরাক উপত্যকায় সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার যে স্বতঃসিদ্ধ, এই বোধ শানিত করবে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু 'যার শিল তার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া' নীতিতে কম -বেশি তিনটে প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি সত্তা ও বাংলা ভাষার মর্যাদা অটুট রাখার জন্যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে আজও—ইতিহাসের এ এক নিষ্ঠুর কৌতুক। আরও একটি বিচিত্র সমস্যা আছে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের জন্য। পশ্চিমবাংলায় এবং বাংলাদেশে এখনও অনেকে জানেন না এবং জানবার জন্যে কোনও আগ্রহ দেখান না, যে,

আসামের বরাক উপত্যকা ভাষাশহিদদের পবিত্র ভূমি। আর, রাজনৈতিক ইতিহাসের চক্রান্তে মূল বঙ্গভূমি থেকে বহিষ্কৃত ও দূরবর্তী হলেও এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সিলেটি উপভাষা ব্যবহৃত হলেও, এরা শতকরা একশ' ভাগ বাঙালি। নোয়াখালি-চট্টগ্রামের উপভাষা সবাই যেমন বুঝতে পারেন না (তেমনি বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার উপভাষাও), সিলেটিও তা-ই। কিন্তু উপভাষার এত বিপুল সমৃদ্ধি বাংলা ভাষারই গৌরব : এই মৌলিক কথা কলকাতার মহানাগরিক গ্রাম্যতায় বন্দী অনেক বাঙালি আজও অনুধাবন করেন না।

এক অদ্ভুত লড়াই আছে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের জন্যে। সিলেটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভাবে মান্য চলিত ভাষা উচ্চারণে বেশ কিছুটা বৈচিত্র্য এসে যায়। অভিজ্ঞ কানে কিন্তু বীরভূম-কোচবিহার-মালদহ কিম্বা খুলনা-পাবনা-রংপুরের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ঠিক ধরা পড়ে। এইজন্যে অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালিদের যদি আত্ম-পরিচয় ঝাপসা না হয়—তাহলে এখানকার মানুষদের কেন 'বাঙালি' বলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে? এই প্রমাণ অন্য কোথাও পেশ করতে হয় না, কলকাতার কূপমণ্ডূক সাংস্কৃতির মনসবদারদের কাছে করতে হয়। এ যে কত বড়ো অপমান ও বেদনার বিষয়, তা শুধু বরাক উপত্যকার বাঙালিরাই বোঝেন। অথচ কলকাতার কাছে বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্ব তো পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা মাত্র। ঘরে-বাইরে আক্রান্ত বাংলা ও বাঙালির জন্যে সামান্য সচেতনতাও কোথাও আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত এই মুহূর্তে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পতাকা যাঁদের শক্ত মুঠোয় ধরা রয়েছে, তাঁরা কেউ প্রতিষ্ঠানের সেবাদাস নন। কিন্তু সে-কথা এখানে নয়। কোন বেদনায়-অভিমানে-ক্ষোভে বরাকের বাঙালি কবি দিলীপ কান্তি লস্করকে লিখতে হয় এরকম, বরং সেদিকে লক্ষ করা যাক :

'আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন বললাম :
করিমগঞ্জ, আসাম ;
তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন : বাঃ বেশ সুন্দর
বাংলা বলছেন তো!
একজন শিক্ষিত তথা সাহিত্যিকের যখন এই ধারণা, তখন
আমি আর কী বলতে পারি।
ওঁকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম :
বাংলা ভাষার তেরো শহিদের ভূমিতে আমার বাস।
তখন তিনি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভির্মি
খাইয়ে দিয়ে বললেন :
ও! বাংলাদেশ? তাই বলুন।

সম্প্রতি 'দেশে' সুনন্দ সান্যাল, তাঁর মাতৃভাষা বিজ্ঞানের প্রবন্ধে বললেন :

'আমাদের বহুভাষী দেশে রক্তমূল্যে মাতৃভাষা চেনার
ঘটনা ঘটেনি।'

পুরো বয়ান উদ্ধৃত করলাম। আশা করি এটা সবাই অনুধাবন করবেন যে, সাধারণ নির্মিতির অনেক বাইরে এর অবস্থান। আসলে এটা নির্মিতিই নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির রক্তক্ষরণ থেকে সরাসরি উঠে-আসা আত্মভাষা। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বনির্ধারিত অভিভাবকেরা যাকে, এমন কী পশ্চাৎভূমি বলেও, চেনেন না—সেই বরাক উপত্যকার বাঙালিরা মাতৃভাষার জন্যে রক্ত ঝরানোর পরেও 'বেশি-বাঙালি'দের কাছে বাঙালি হিসেবেই গৃহীত হন না! ইংরেজি ভাষায় লন্ডনের কক্‌নি বুলি কিংবা অস্ট্রেলীয় বাচন অথবা ইয়াংকি বুলি নিয়ে কিন্তু সংশয় হয় না কারও। চীনা বা স্পেনীয় ভাষাতেও অজস্র বৈচিত্র্য স্বীকৃত। তাহলে বাংলার উপভাষাগত সমৃদ্ধিকে কেন্দ্রীয় অবস্থানের অহংকারে কেন অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করা হয়? এই একই ঔদ্ধত্য থেকে কলকাতায় প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য-সাহিত্যের বৃত্তে রচিত সাহিত্যকে সপ্রতিভ প্রচার-কুশলতা দিয়ে একমাত্র মান্য সাহিত্যসৃষ্টির শিরোপা দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় কিংবা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, ত্রিপুরায়, আসামের গৌহাটিতে ও বরাক উপত্যকায়, বিহারে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট পত্রিকার মধ্যে যাঁদের পাচ্ছি, তারা তাহলে কী? শুধু কী এই সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে লেখা-লেখা খেলায় মগ্ন তাঁরা যে 'they also serve who only stand and wait' ! তাদের উদ্দেশে কলকাতা ও ঢাকার মহানাগরিক সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা মাঝে-মাঝে প্রশংসার সিকি-আধুলি ছুঁড়ে দেবেন কিংবা পিঠ চাপড়ে দেবেন—এইজন্যে লেখেন 'মফঃস্বল'-এর কৃপাপ্রার্থী লেখকেরা? বরং তথাকথিত দূরপরিধির বাসিন্দা যাঁরা, প্রতিষ্ঠান-পুষ্ট কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্রয়লোভী অভ্যাস-জর্জরিত 'সাহিত্য'-এর চক্রব্যূহ থেকে বাইরে, তাদের ছোট পত্রিকার ওষধি-মালা থেকে উৎসারিত 'লেখা'য় পাই জীবনের কথকতা। প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের নামে এঁরা মিথ্যার বেসাতি করেন না, কৃত্রিম চাকচিক্য দিয়ে চালাকি ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন না, ফাঁপা ইমারত গড়ে নিয়ে কেনাবেচার বাজার তৈরি করেন না, প্রতিজীবন ও প্রতিবাস্তবের বেপরোয়া নির্লজ্জ সমাবেশ তৈরি করেন না। বরং দূর 'মফঃস্বল'-এর লেখায়, লোকায়ত পেশি ও লাবণ্য আর উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও সূক্ষ্ম কৌনিকতা নিয়ে, জীবনের যে-সব আশ্চর্য অনাবিষ্কৃত আয়তন উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে—সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠুন নিবিষ্ট পড়ুয়ারা।

একুশ শতকের সূচনাপর্বে বরং অপর পরিসরের লিখন-যোদ্ধারা একটি নতুন পর্যায় ও পদ্ধতির সূত্রপাত করুন। প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রিকতার বাইরে, কলকাতার উদ্ধত নাগরিক গ্রাম্যতার সংক্রমণ থেকে মুক্ত, যে-সব ছোট পত্রিকা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অথচ প্রচার-যন্ত্রের অভাবে একে অন্যের কাছে অপরিচিত—তারা সবাই নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সমাবেশ করুক। সুচিন্তিত কর্মসূচির ভিত্তিতে পরস্পরের কাছাকাছি এসে সমস্ত সহযাত্রীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করুক। এই পারস্পরিক জানা-শোনা সংহত হয়ে উঠলে, রণকৌশল-গত কারণে কলকাতায় মিলিত হোন লিখন-যোদ্ধারা। অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা-বিশ্বাস-ভাবাদর্শ এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাঁদেরই সুপরীক্ষিত

হবে, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জীবনঘনিষ্ঠ ও চিরসজীব ধারা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা যুদ্ধই, যদিও অসম যুদ্ধ। একদিকে সর্বগ্রাসী বিদূষণের স্নায়ুকেন্দ্র ও প্রসারণশীল পরিধি নির্মাতা বৃহৎ পুঁজি এবং তার আন্তর্জাতিক মোড়লপ্রভুর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত মগজ-ধোলাইয়ের ব্যবস্থা, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক রাজনীতির বহুস্বরিক বিচ্ছুরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লিখনযোদ্ধারা। যুদ্ধটা কঠিন, সত্যিই কঠিন। কারণ, ওই যোদ্ধাদের মধ্যেও কেউ কেউ লোভ ও অবসাদের হাতছানিতে কিংবা নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের ভিত্তিগত শৈথিল্যে যুদ্ধ আরম্ভ করেও শেষ রক্ষা করতে পারেন না। পিছিয়ে পড়তে-পড়তে একসময় চলাটা-ই থামিয়ে দেন। নয়তো শিবির পালটে ভিড়ের দৃশ্যে ঢুকে পড়েন। ফলে যাদের মশালচি হওয়ার কথা ছিল,তারা স্থিতাবস্থাপন্থীদের ঢোল-শোহরতে মৃদঙ্গবাদক হয়ে পড়ে।

বরাক উপত্যকার লিখিয়েদের যুদ্ধ আরও একটু কঠিন এইজন্যে, যে, প্রাক্-আধুনিক ও অবক্ষয়ী আধুনিক, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজিতন্ত্র এখানে সহাবস্থান করে। ফলে স্ববিরোধিতা ও অনন্বয় এখানকার মূলত মধ্যস্বত্বভোগী সমাজে এবং ব্যক্তি-অস্তিত্বে সবচেয়ে প্রবল। এই সব কিছুর মোকাবিলা করে প্রতিকূল পরিবেশে লেখার স্থাপত্য গড়ে তুলতে হয়। ছোট পত্রিকার সলতে যত পোড়ে, আগুন তত জ্বলে না। এক দশকের অনেক আগেই দল ভেঙে যায় এখানে। সাম্প্রতিক সময়-স্বভাব সম্পর্কে অন্ধতা যাতে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, মৌলবাদ ও আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদ সেই চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখে না। আধা-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে জীবিকার ক্ষেত্রগুলি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই সমাজ থেকে উঠে-আসা লিখিয়েদের এমন আত্মক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় যে তাঁরা চাইলেও সব-সময়ের-লিখিয়ে হতে পারেন না। অথচ আংশিক সময়ের লিখিয়ে হয়ে থাকায় ঈপ্সিত মাত্রায় যুদ্ধে যোগও দিতে পারেন না। অনতিক্রম্য এই কূটাভাস থেকে মুক্ত হতে-না-পেরে কেউ কেউ বহু হাত-ফেরতা ছদ্ম-আধুনিকতার রঙিন মুখোশ পরে নেন। অন্য অঞ্চলের লিখন-যোদ্ধাদের এত জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় কি? তবু এখানে চার দশক ধরে 'সাহিত্য' পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অতন্দ্র-শতক্রতু-ইত্যাদি-প্রতিস্রোত-শরিক এর মতো ছোট পত্রিকা কীভাবে যেন ধারাবাহিকতা বজায় রাখে! মশাল মিছিলে পুরনো কিছু অবয়ব ঝাপসা হয়ে গেলেও নতুন-নতুন অবয়ব অন্ধকার চিরে এগিয়ে যায়, এখনও!

বরাক উপত্যকার বাঙালি লিখিয়ের পক্ষে লেখা বেঁচে থাকার ঘোষণা, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভিজ্ঞান ; এ কোনো অবকাশ বিনোদন বা খামখেয়ালি কাজ নয়। তাই নিজেকে বঙ্গীয় ভুবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রমাণ করতে লেখেন কবি ও গল্পকারেরা। কোথাও প্রকাশন সংস্থার সমর্থন নেই, দুয়োরানির ছেলে-মেয়েদের প্রতি সুয়োরানির ছেলে-মেয়েদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য আছে বরং। তাই নির্বাসিত ঈশান বাংলার সমান্তরাল অপর অস্তিত্বের বেদনা ও অভিমান অতি সম্প্রতি অসাধারণ কথায়-সুরে-গায়কিতে ব্যক্ত হয়েছে—

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যে জলধি নদী
নির্বাসিতা নদীর বুকে
বাংলায় গান বাঁধি।

আরো একবার ফিরে যাই দিলীপ লস্করের কবিতায়। 'আত্মগাথা' নামক বয়ানের প্রথম নটি পঙক্তি এরকম :

'যে নদীর পারে আমার ঘর
তার নাম কুশিয়ারা।
আমরা আখকে কুশিয়ার বলি,
ভাষাটা বরাকী নয়, বাংলা উপভাষা
আমরা কথা বলি মাত্রাবৃত্তে, সমিল পয়ারে,
পয়ারকে ডিটান বলি
ডিটানে ডিটানে শ্রুতিকাব্য গড়ে ওঠে'

এত সব সত্ত্বেও মৌলিক এই প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হয় বরাক উপত্যকায় এবং বাইরে : বাংলা সাহিত্যের সর্বজনমান্য মানদণ্ড অনুযায়ী এখানকার কজন লিখিয়ে মর্যাদার দাবিদার হতে পেরেছেন? সাহিত্য-কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার সুবাদে অবরে-সবরে দুচারটে নাম উচ্চারিত হওয়াকে কি 'মর্যাদা' বলব! সামন্তপ্রভুরা মাঝে-মাঝে নিজেদের দূরের জায়গিরে গিয়ে, পরিতৃপ্তির মাশুল হিসেবে, সেইসব নাম নিয়ে আসবেন : এই কি 'পরিচয়' এর ব্যাকরণ? তবু বলব 'সাহিত্যের নামে কলকাতার রঙমহলে পাসপোর্ট-ভিসা যোগাড় করছে কেউ কেউ',—এই ভাবনা নিতান্ত ন্যক্কারজনক। কেননা লেখার শক্তিতে, দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায়ের জোরে, বরাক উপত্যকার কোনো কোনো কবি ও গল্পকার বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করতে পেরেছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, শঙ্করজ্যোতি দেব, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, মনোতোষ চক্রবর্তী, স্বর্ণালি বিশ্বাস, দেবাশিস তরফদার কবি হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি পাঠকদের কাছে কম-বেশি পরিচিত এখন। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে যে-লড়াই তা আংশিক সময়ের লিখনকর্মীদের পক্ষে অব্যাহত রাখা অসম্ভব। মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, শেখর দাশ, বদরুজ্জামান চৌধুরী, সুব্রত কুমার রায়, মলয়কান্তি দে—গল্পকার হিসেবে নিজেদের চেনাতে পেরেছেন। তবে যেহেতু এঁরা কেউই সব-সময়ের লিখনযোদ্ধা নন, তিনজন ছাড়া অন্য কারও গল্পসংকলনও নেই—এদের কণ্ঠস্বর বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে পৌঁছায় না। 'একটু উঠে একটু নেমে আমার কাছে দাঁড়াতে হয়'—কবির বাচন হিসেবে চমৎকার ; কিন্তু রচয়িতা-গ্রহীতার মধ্যে কে কেন উঠবে বা নামবে, এর মীমাংসা সহজ নয়। দূরতম 'মফঃস্বল' এর বাঙালি কবি-লেখক বলে শক্তিপদ-বিজিৎ-অমিতাভ কিংবা রণবীর-শেখর-সুব্রত নির্বাসিত ভূখণ্ড থেকে ছুটে ছুটে যাবেন চোখ-ধাঁধানো মন-মজানো প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রের দিকে : এটা হতেই পারে না। অতিসরলীকরণের এই পাটিগণিত এখন পুরোপুরি অচল।

বরাক উপত্যকায় প্রায় চার দশক ধরে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে যিনি বিকল্প সাহিত্যের আন্দোলনকে নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করেছেন, তিনি 'সাহিত্য' সম্পাদক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। কোনো বিজ্ঞাপন নেই, অনুকূল সমাজের সমর্থন নেই, বিশেষ কোনো পৃষ্ঠপোষকতাও নেই। অথচ 'সাহিত্য' পরপর বেরিয়েই চলেছে। এই নিরিখে জামশেদপুরের 'কৌরব' কিংবা কলকাতার 'কবিতা পাক্ষিক' এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ, এদের প্রধান ভরসা বৌদ্ধিক ও আর্থিক সমর্থনের নিশ্চয়তা। হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' তা কখনও পায় না ; অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সবটাই তার যুদ্ধ। রূপক এবং আক্ষরিক দুই অর্থেই। বিজিৎ 'সুরক্ষিত বন্দিশালা'নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ছাব্বিশ বছর আগে। যাঁরা অপর পরিসরের বাসিন্দা হিসেবে অকারণ হীনমন্যতার শিকার, ওই প্রবন্ধটি তাঁরা এখনও পড়তে পারেন। নিছক মফঃস্বলবাসীর বেদনা বলে তাঁর বয়ানকে লঘু করতে নয়, নির্বাসিত ঈশান বাংলার প্রান্তিকায়িত পরিসর থেকে উৎসারিত উচ্চারণ হিসেবে আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে।

বিজিৎ লিখেছিলেন : 'একথা আজকাল প্রায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক—অর্থাৎ সাহিত্য-বিচারে যাঁদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়েছে—জেনে গেছেন যে বর্তমান বাংলা কবিতার যা মূল্যবান অংশ তার অর্ধেকটা (হয়ত বেশি-ই বলা হলো) যদি বা কলকাতার বহু-পরিচিত কবিদের রচনা, বাকি অর্ধেক নিশ্চিতই রচিত হচ্ছে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু অখ্যাত অথবা অল্পখ্যাত কবিদের হাতে।'

বিজিৎ-এর মন্তব্যের পরিধি একটু সম্প্রসারিত করে বলব, 'অল্পখ্যাত' কিংবা 'অখ্যাত' গল্পকারদের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জীবন্ত ধারাগুলিকে শনাক্ত করা সম্ভব। তুলনামূলক ভাবে অনেক কম সংখ্যায় হলেও একথা প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য-সাহিত্যের গৎ-বাঁধা পথে যাঁরা চলেন, ছোট পত্রিকা থেকে তাঁরা অবধারিত ভাবেই ছিটকে বেরিয়ে যান। এদের কথা বিজিৎ ভাবেননি, আমরাও ভাবছি না। পেশাদার সাহিত্যিকদের কিংবদন্তিতুল্য ভাবমূর্তি কিংবা জীবনযাপন মফঃস্বলের তরুণদের আচ্ছন্ন করে, এটা ঠিক। কিন্তু অমুক চন্দ্র তমুকের মতো লিখতে যারা সচেতন বা অবচেতন ভাবে প্ররোচিত হয়, ভরাডুবিই তাদের নিয়তি। বরাক উপত্যকার শক্তিপদ বা শেখর নিজস্ব কাব্যভাষা বা গল্পভাষা যদি আবিষ্কার করতে না পারতেন, নির্মম সময় তাঁদের কবেই পথপ্রান্তে ফেলে রেখে যেত। লেখার জগতে কোনো মমতা, সহানুভূতি, পক্ষপাতিত্ব অচল। প্রতিইঞ্চি জমি প্রণালীবদ্ধ মেধাবী অধ্যবসায় দিয়ে অর্জন করতে হয়। বিজিৎ 'সাহিত্য' পত্রিকায় তা করেছেন। আর তাই তাঁকে নিছক বরাক উপত্যকার পরিধিতে বিচার করা চলে না। বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বালুরঘাটের 'মধুপর্ণী' সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, মেদিনীপুরের 'অমৃতলোক' সম্পাদক সমীরণ মজুমদার, বগুড়ার 'নিসর্গ' সম্পাদক সরকার আশরাফ, গৌহাটির 'একা এবং কয়েকজন' সম্পাদক উদয়ন বিশ্বাস ও 'পূর্বদেশ' সম্পাদক অখিল দত্ত, ঢাকার 'একবিংশ' সম্পাদক খোন্দকার আশরাফ হোসেন, কলকাতার 'এবং

মুশায়েরা' সম্পাদক সুবল সামন্ত, 'তমসুক' সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায় এবং এরকম আরো কয়েকজনের গৌরবময় অভিযাত্রায় তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে যান।

বিভিন্ন পর্যায়ে বরাক উপত্যকার ছোট পত্রিকার জগৎ থেকেই তো পেয়েছি উদয়ন ঘোষ, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ এবং বিশেষত রণজিৎ দাশের মতো কবিকে। প্রথম তিনজন সূচনাপর্বে চোখ ধাঁধিয়েও আংশিক সময়ের লিখনকর্মী হওয়াতে সৃষ্টি-প্রকল্প থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু রণজিৎ নিজেকে মুহূর্মুহু বিনির্মাণ করে বাংলা কবিতার আবহমণ্ডলে অন্যতম প্রধান জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠতে পারলেন। শান্তনু 'নিজের জন্যে আয়না আনতে আনতে মাঝপথেই গুঁড়িয়ে' দিয়েছিলেন ; আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য পরিত্যক্ত হল বলে এই বাচনও কোথাও পৌঁছাল না। প্রান্তিক মানুষের উচ্চারণে সময় ও পরিসরের অনন্বয় কত নতুন তাৎপর্য এবং অভিনব উপস্থাপনা-পদ্ধতির উৎস হয়ে উঠতে পারে, তাও জানা হল না। এ কেবল ব্যক্তিগত অবসাদের বৃত্তান্ত নয়, প্রান্তিক পরিসরের মধ্যবিত্তবর্গীয় বৌদ্ধিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা এভাবে চিহ্নায়িত হল যেন। বৃত্তবন্দী কক্ষপথ চূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি জাগিয়েও শুধুমাত্র যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের অন্ধবিন্দুর দুর্মর উপস্থিতি কল্পনাপ্রতিভাকে শুষে নেয়—এই বার্তা কেবল বরাক উপত্যকার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। সমস্ত প্রান্তিক পরিসরের সৃষ্টি-প্রয়াসীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণও। আর, পাশাপাশি, বৃত্তবন্দিত্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন বলে রণজিৎ তারুণ্যের অহংকারে যেমন লিখেছিলেন (রোম থেকে শিলচর একটানা রেলপথ হবে)—সেই চিহ্নায়িত সার্থক হয়ে উঠল। ঘটাকাশ মিশে গেল মহাকাশে। বরাক উপত্যকায় যাঁরা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে রয়ে গেলেন, তাঁদের পক্ষে শান্তনু ও রণজিৎ যেন দুই মেরুর দুটি সংকেত হয়ে উঠলেন। যাঁরা বহুমাত্রিক ভাবে মহাকাশের বার্তা ধারণ করতে পারলেন পরিসর-লালিত আধারে, তাঁরাই বাংলা ভাষার আঞ্চলিক লাবণ্যের প্রতিমা গড়তে পারলেন। কেউ বা মনোযোগী হলেন লোকায়ত চালচিত্রে, কেউ বা চালচিত্রে সময়ানুভবের আন্তর্জাতিক চিহ্নায়ক মুদ্রিত করতে চাইলেন।

প্রতিবেশী ত্রিপুরায় ছোটগল্প ও উপন্যাস যেমন অপর পরিসরের সমান্তরাল অস্তিত্বকে কিছু কিছু সার্থক পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত করে চলেছে, সেই মাত্রায় না-হলেও বরাক উপত্যকায় অনিশ-শতক্রতু-অক্ষরবৃত্ত-প্রতিস্রোত-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যের লক্ষণীয় বিন্যাস-প্রতিন্যাস গড়ে উঠেছে। শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী-মিথিলেশ ভট্টাচার্য-বদরুজ্জামান চৌধুরী-অরিজিৎ চৌধুরী-দেবব্রত চৌধুরী-মলয়কান্তি দের-র মতো গল্পকারদের নিজস্ব গল্পসংকলন আজও প্রকাশিত হল না—এ কোনো বিস্ময় নয়। অনীহা ও উদ্যমহীনতার হিমানী সম্প্রপাতে নিঃশব্দে ডুবে যায় সব অধ্যবসায়। বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প কিংবা উত্তরপূর্বাঞ্চলের গল্প : এই দুটি সংকলন এখানকার সবেধন নীলমণি। আবারও লিখতে হচ্ছে, আংশিক সময়ের লেখক হয়ে থাকতে থাকতে এখানকার গল্পকারদের মধ্যে কুয়োবাসীর যাবতীয় ভনিতা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। শেখর দাশের 'কোষাগার', রণবীর পুরকায়স্থের 'বোকা কাশীরাম কথা', সুব্রত কুমার রায়ের 'আরশিনগরের রূপকথা', অমিতাভ দেবচৌধুরীর

'বাজে খাতা' রয়েছে এই প্রবণতার বিপ্রতীপে। এই সংকলনগুলি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের পুড়ুয়াদের হাতে যদি ঠিকমতো পৌছাত, নিঃসন্দেহে এই সত্য প্রমাণিত হত যে এপার বাংলা ওপার বাংলা ছাড়াও রয়েছে নির্বাসিত অপর বাংলা। তার লেখাপত্রে জীবনের মননের উপলব্ধিতে ভিন্নতর মাত্রা নান্দনিক বিচারেই সহযাত্রীর মর্যাদা পেতে পারে। এদের না-জেনে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা অপরাধ।

'গল্পপঞ্চদশী' নামে লেখিকাদের একটি সংকলনও রয়েছে। নারী-পরিসর এতে কতখানি উপস্থিত, তা হয়তো তর্কের বিষয়। কিন্তু জীবনের ভেতরে রয়েছে আরেক জীবন, সেদিকে আমরা তাকাই কিন্তু দেখি না তাদের—এই বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব গল্পকারদের বয়ান থেকে। ঝুমুর পাণ্ডে এই জগৎ-অন্তবর্তী জগতের সবচেয়ে জোরালো প্রতিনিধি। 'গেরাম থানের মেয়েটি ও দুলিয়া' নামক গল্পসংকলনে বরাকের স্বল্প-আলোকিত সামাজিক পরিসরের টুকরো-ছবি পাওয়া যায়। এবছর শারদীয় দৃষ্টিপাত পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ঝুমুরের বিপরীত মেরুতে রয়েছে স্বপ্না ভট্টাচার্যের ছোটগল্প। নারী-পরিসরের উন্মোচনে সচেষ্ট তিনি। বরাক উপত্যকার কথাসাহিত্য ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে এঁদের সমবায়ী উপস্থিতিতে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এখানে অবতারণা করা যায়। দেশবিভাগের রক্তাক্ত ক্ষত এবং সেই ক্ষত নিরাময়ের ব্যর্থ চেষ্টা : শুধুমাত্র এই বিষয়টি থেকে অসামান্য কিছু উপন্যাস রচিত হতে পারত এখানে। ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছিল এই উপত্যকায় ; পূর্বপাকিস্তান থেকে এবং পরে আসামের ভাষাদাঙ্গায় দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু-হওয়া মানুষেরা এসেছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে। পায়ের নিচে জমি খুঁজে পাওয়ার লড়াই চালাতে গিয়ে উদ্বাস্তু-প্রজন্ম উৎখাত হল নৈতিকতার বোধ থেকেই। আধা-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে আপসের হাজার পথ খুলে যায়, ভাবাদর্শ অবান্তর হয়ে পড়ে। একদিকে পরিকল্পনাশূন্য নগরায়নের চাপ, অন্যদিকে সুবিধাবাদিতা ও সার্বিক অবক্ষয়ের চোরাবালি : ব্যক্তি-অস্তিত্বে না আছে কেন্দ্র, না আছে পরিধি। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে যেমন আদি পাপ, ছিন্নমূল প্রজন্মগুলির জন্যে তেমনি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও তজ্জনিত দেশবিভাগ। আজও মাথার উপর আকাশ নেই তাই, পায়ের নিচে নেই জমি। ব্যক্তির বিচূর্ণায়ন এবং তার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়ার দৃশ্য ও অদৃশ্য সংগ্রাম মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিষয় হতে পারত।

কেন হল না এতদিন : এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে শেখর দাশ লিখেছেন তিনটে উপন্যাস ; মোহনা, বিন্দু বিন্দু জল, রাঙামাটি। এদের মধ্যে 'বিন্দু বিন্দু জল'-এ দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু-প্রজন্মের সার্বিক ক্ষয় উপন্যাসীকৃত হয়েছে। এর আগে কিছু কিছু বড়ো গল্পে উপন্যাসায়নের বিচ্ছিন্ন কিছু চেষ্টা হয়েছিল। মিথিলেশ ভট্টাচার্য, বদরুজ্জামান চৌধুরী, শেখর দাশ তা করেছিলেন। অতি সম্প্রতি অমিতাভ দেবচৌধুরীর ' উপন্যাসের খোঁজে' প্রব্রজনের বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে উপন্যাসের পদবি দিতে চেয়েছে। যেহেতু রচনা মাত্রেই 'লেখা' নয়, দু-একজন পূর্বসূরির প্রয়াসকে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করছি না। তবু এইসব দৃষ্টান্ত থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বরাক

উপত্যকার সৃষ্টিশীল মন অপর পরিসরের সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প দিয়েই লিখনবিশ্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করে গেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা আর বিকল্প বয়ান বিকল্প বীক্ষণ এই চেষ্টার মৌল চালিকাশক্তি। আধিপত্যবাদী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জানাতেই লেখা, বেঁচে থাকা, হয়ে ওঠা। বাংলার, বাঙালির অতি উদ্ভাসিত অবয়ব যে কুহকমাত্র, এই জেনে সেই কুহক নিরাকরণ করতে লেখেন শক্তিপদ, শেখর। যতক্ষণ এই সত্য জানতে পারছি না, ততক্ষণ কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের মরীচিকায় বুঁদ হয়ে থাকছি। চিত্রভানু ভৌমিক, শেখর দেবরায়, প্রদীপ নাথ, দেবব্রত চৌধুরী, আশুতোষ দাস-এর মতো নাট্যকার এই বরাক উপত্যকার জীবনে ব্যাপ্ত বিচিত্র লীলাভঙ্গ থেকে অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের বিপ্রতীপে দাঁড়ানোর বয়ান খুঁজে নিচ্ছেন—এও কম তাৎপর্যবহ নয়। প্রতীচ্যের আধুনিকোত্তর প্রবণতার উল্টো মেরুতে গিয়ে আবহমান দেশজ সংস্কৃতির জমিতে উত্তরায়ণমনস্ক উত্তর আধুনিক চেতনার বিশল্যকরণী নিয়ে আসছেন যাঁরা নাট্যপাঠকৃতিতে, তাঁদের সঙ্গে চিত্রভানুদের আত্মীয়তা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

তুলনামূলক ভাবে প্রবন্ধে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে বরাক উপত্যকা। সুজিৎ চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দেবলস্কর : সামগ্রিক প্রেক্ষিতের নিরিখে এই তিনজন উল্লেখনীয় কেবল। কেননা সাধারণ আলোচনা আর প্রবন্ধ এক কথা নয়—এ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এখনও প্রকট। অবশ্য এটা কেবল বরাক উপত্যকার বিশেষত্ব নয় ; সাধারণ ভাবে সমগ্র বাংলা সাহিত্য এবং ছোট পত্রিকার অণুবিশ্বও একই দোষে ভুগছে। পিটুলিগোলা জল আর দুধ একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রায় সর্বত্র। প্রবন্ধ লেখার জন্যে যে দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায়, ধৈর্য, পরিশ্রম ও অন্তর্দীপ্ত বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য চাই, তা একদিনে তৈরি হয় না। তাছাড়া চাই বিকল্প ভাববিশ্ব ও বিকল্প বয়নপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর মননজাত প্রস্তুতি। অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার ক্রমিক উন্মোচন যেখানে প্রত্যাশিত, সেই ছোট পত্রিকাই শমীগর্ভে আগুন ধারণ করতে পারে। বরাক উপত্যকায় ছোট পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশনা না-থাকার ফলেই সম্ভাব্য প্রাবন্ধিকদের দেখা মেলে নি।

এবার ফিরে যেতে পারি বিজিৎকুমারের প্রাগুক্ত প্রবন্ধে। তিনি নতুন সাহিত্য-চিন্তা, আদর্শগত প্রতিজ্ঞা ও সৃষ্টিধর্মী তন্নিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। ছোট পত্রিকার লেখকদের এইসব অভিজ্ঞান ছাব্বিশ বছর আগে যতখানি সত্য ছিল, এখনও ততটুকু সত্য। বিজিৎ লিখেছেন : 'লিটিল ম্যাগাজিনগুলোর জন্ম হয় কোনো একটা আদর্শগত প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সমাজ সচেতনতা নিয়ে ভাঙচুর, বিদ্রোহ, আন্দোলন—মোট কথা সাহিত্যে একটা নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে আসা, একটা সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রকাশিত হয় লিটিল ম্যাগাজিনগুলো। এদের পাঠক নির্বাচিত এবং প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, বেঁচে থাকা অনিশ্চিত, অকালমৃত্যুর হার খুব বেশি। তবু একটার পর একটা জন্ম চলছেই নতুন সাহিত্য-ভাবনা নিয়ে, রিলে রেসের মতো এক হাত থেকে অন্য হাত হয়ে এগিয়ে চলেছে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের যা কিছু গৌরবের ধন।' ওই শেষের কথাতেই রয়েছে অপর পরিসরের লিখনবিশ্বের

অন্তঃসার। বরাক উপত্যকার বাংলা লেখালেখিও অন্যান্য অপর পরিসরের সহযাত্রী লিখন-যোদ্ধাদের জীবনশস্যের মতো সমগ্র বাংলা সাহিত্যের গৌরব ভাণ্ডারকে অনবরত ঋদ্ধতর করে চলেছে। বিজিৎ-এর বয়ানের প্রতিধ্বনি করে লিখতে চাই : 'আসলে সাহিত্য প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সঠিকভাবে করতে না পারলে একটি পেশাদার পত্রিকা কিংবা একটি বিশেষ প্রকাশনা সংস্থার মৃত্যু যদি বা ঘটানো যায় সেখানে আরো দশটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তবুও থেকে যাবে। সুতরাং মূল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাকেই চিনতে হবে, চেনাতে হবে।...বর্তমানের সুরক্ষিত বন্দিশালা ভেঙে গুঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যকে স্বাধীন এবং সাহসী করার দায় সেইসব অগ্রসর লেখকদের হাতে যাঁরা একান্তভাবেই লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহু সৎ লিটিল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের জগতে একটা চোরা-স্রোতের মতো কাজ চলছে—এখন প্রয়োজন সেই স্রোতকে প্রবলতর করা।'

হ্যাঁ, নিশ্চয়। 'স্বাধীন' এবং 'সাহসী' সেইসব লিখিয়েরা রয়েছেন অপর পরিসরেই, বিশেষত বরাক উপত্যকার মতো প্রান্তিকায়িত নির্বাসিত বাংলায়, যাদের কাছে আজ 'বাংলা' অভিধাই পরকীয়া হয়ে গেছে। তবে 'চোরাস্রোত' নয় ; কেননা গত ছাব্বিশ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য সাহিত্য গজভুক্ত কপিত্থবৎ খোসামাত্রসারে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের দান যারা উল্টে দিয়েছে, অপর পরিসরের সেইসব লিখনযোদ্ধাদের এখন নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে হবে। আর দেরি নয়। এখনই শুরু হোক বাংলা সাহিত্যের বিকল্প ইতিহাস রচনার কাজ। তথাকথিত পরিধির পাঠকৃতি ছদ্ম-কেন্দ্রের ভ্রমপাঠের কালো মুকুট খসিয়ে দিক। বরাক উপত্যকার পদাতিকেরা সাংস্কৃতিক রাজনীতির ধূর্ত কৌশলকে নানাভাবে চিনেছেন। এবার সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে ওই চেতনার বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দিন তাঁরা। ভাঙন পিছনে থাক, সম্মুখে নির্মাণ। তাই, আসন্ন ওই শুশ্রূষার বার্তা।

প্রান্তিক বাঙালির বিহ্বল বয়ান

না, কোনও ধরনের নাটকীয়তা তৈরি করার জন্যে এমন শিরোনাম দিইনি। কিংবা 'আমাকে দেখুন' বলে নাকিকান্না জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও নেই। বিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশকে এত বেশি সংশয় ও আঁধি তৈরি হয়েছে যে বিহ্বলতাও উপযুক্ত শব্দ নয়। কৃষ্ণবিবর এখন আগ্রাসী জীবনের প্রতিটি স্তরে। যন্ত্র-প্রযুক্তির অতিবিজ্ঞাপিত উদ্‌ভাসন, বিশ্বায়নের তুমুল কোলাহল, আত্মবিস্মৃতির উৎকট মাদক আমাদের শেকড় উপড়ে ফেলছে অহরহ। চৈতন্যে মড়ক এখন ; ভ্রূক্ষেপ কিছুতেই নেই কারও। চোখের সামনে তাসের ঘরের মতো বহুদিনকার বিশ্বাস ভেঙে পড়তে থাকলেও গণ্ডারের চামড়ায় আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে না। জ্ঞানী কুচক্রীদের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে প্রলাপ বকলেও কোনও অস্বস্তি হয় না। অন্তর্ঘাতকের ছুরির আস্ফালন দেখতে দেখতে এখন আর ডি এক্স বিস্ফোরণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তবু সেই পুরনো পি পু ফি শু নীতি আঁকড়ে রয়েছি। মেনে নিচ্ছি মূর্খের প্রগলভ ঔদ্ধত্য ; এমন কি আমাদের মাথার উপরের ছাউনি আর পায়ের নিচের জমি কেড়ে নিতে চাইলেও কোনও আপত্তি করছি না কেউ।

একুশ শতকের প্রথম দশকও শেষ হতে চলেছে। বিশ শতক ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দ নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক কথাই লিখেছেন, বলেছেন। কিন্তু এক হাজার বছরের সাংস্কৃতিক অর্জন জাতিসত্তার অভিজ্ঞান যে নিতান্ত অবহেলায়, মাত্র কয়েক দশকের আত্মঘাতী অবিমৃষ্যকারিতায়, ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি : এ বিষয়ে তেমন কোনও সচেতনতাই দেখলাম না। বিশ শতকে পৃথিবীর অন্যত্র কিন্তু ইতিহাসের ভ্রান্তি সংশোধিত হতে দেখেছি। বহুধাবিচ্ছিন্ন যাযাবর ইহুদিরা নিজেদের রাষ্ট্র পেয়েছে ; অতলান্ত বিস্মৃতি থেকে তুলে এনে মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানিতে রাষ্ট্রীয় সীমানা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে ; ঔপনিবেশিক চক্রান্ত মোকাবিলা করে ভিয়েতনাম বিভাজনকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মরীচিকায় বিভ্রান্ত বাঙালি আর হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বের চক্রব্যূহ থেকে বেরোতে পারল না। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট আর্যাবর্ত-কেন্দ্রিক ভারতীয় রাজনীতি বাংলাকে দেশবিভাজনের হাঁড়িকাঠে বলি দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ-মন্বন্তর-দাঙ্গা পেরিয়ে-আসা বাঙালি বুঝতেই পারেনি, কী চিরস্থায়ী সর্বনাশের বন্দোবস্ত করছে আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক সমাজ। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হল, লক্ষ লক্ষ বাঙালি কয়েক পুরুষের ভিটেমাটি ও ঐতিহ্য থেকে উৎখাত হয়ে অর্জন করল 'উদ্বাস্তু' বিশেষণ।

কোথায় গেল সেইসব বাস্তুহীন জনতা? আসামে-মেঘালয়ে-ত্রিপুরায়-পশ্চিমবঙ্গে। বাষট্টি বছর পরেও এঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিসরে জলবিভাজনরেখা ডিঙিয়ে

যেতে পারেননি। স্থানীয় ও বহিরাগত—এই দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচিত্র দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত এখনও তেমন করে বিশ্লেষিত হয়নি। যদি হয় কখনও, দেখা যাবে, স্থানীয় মানুষ যেখানে বাংলা ভাষায়, কিংবা কোনও উপভাষায় কথা বলেন—সেইসব ক্ষেত্রেও বিড়ম্বনার শেষ নেই বাস্তুহীন মানুষের জন্যে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিনিময়ের বদলে অদ্ভূত প্রতিরোধের মোকাবিলায় শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে তাঁদের। দীর্ঘ সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের পরে যখন এঁরা নতুন বসতি করেছেন, তখনও 'উদ্বাস্তু', ইংরেজি-নবিশ বাচনে 'রিফুজি', বিশেষণ গায়ে লেগে রয়েছে ডাকটিকিটের মতো। এঁদের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে শ্লেষ-বিদ্রূপ-তাচ্ছিল্য-অবহেলা-অপমান। 'আমরা' এবং 'ওরা'র বেড়া পাকাপোক্ত হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে। ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে এদের লোক-দেখানো কদর এবং সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। সামাজিক সমস্যা অবধারিত ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায়। দেশবিভাজন খ্রিস্টিয়দের আদি-পাপ এর মতো ছায়া ফেলে এখনও। কোনও দিন কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেনি, বাঙালি হয়েও বঙ্গভূমির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ থেকে কেন তাঁদের চলে আসতে হয়েছিল : সাধ করে কি কয়েক পুরুষের অর্জন ও অভ্যাস থেকে সরে এসেছিলেন তাঁরা!

কিন্তু যেখানে অন্যভাষার মানুষেরা রয়েছেন, সেখানে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, আরও বেদনাময়। আসামে বারবার বঙ্গালখেদা আন্দোলন হয়, নামটাই শুধু আলাদা। কতবার যে ঘর পুড়েছে আশ্রয়সন্ধানী বাঙালির, কতবার যে উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁরা—এর কোনও ইয়ত্তা নেই। অপরাধ একটাই : এঁদের মাতৃভাষা বাংলা। কিছু কিছু পণ্ডিত গবেষক নিরাপদ ছোঁয়া-বাঁচানো দূরত্ব থেকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞজনোচিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে গর্বোদ্ধত বাঙালির দখলদারি মনোভঙ্গিতে উত্যক্ত হয়েই নাকি বঙ্গালখেদার মতো 'স্বাভাবিক' প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এইসব বিজ্ঞজন অবশ্য এই খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন না যে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে শান্তিরক্ষক পুলিশের গুলিতে আসামের শিলচর শহরে শহিদ হয়েছিল কেউ কেউ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারো জন শহিদদের কথা পশ্চিমবঙ্গের 'সচেতন' মানুষেরা জানতেন না এই সেদিন পর্যন্ত। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এই দিনটি উদ্‌যাপন করছেন কেউ কেউ। তার আগে পর্যন্ত 'ভাষাশহিদ দিবস' বলতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বুঝতেন শুধু ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে। আসামে যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি থাকেন, কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এর হদিশ জানতেন না।

আমাদের বাংলা ভাষা যে শুধুই মান্য চলিত নয়, এ ভাষায় রয়েছে অজস্র লোকায়ত বিভঙ্গ—প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষী মানুষজনের বসতভূমিতে, জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে যায় বলে উপভাষা-বিভাষার সমৃদ্ধি অতুলনীয়—এখবর রাখেন না পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গেই বীরভূম-পুরুলিয়া-মুর্শিদাবাদ-মালদহ-কোচবিহারে কত না উপভাষার লাবণ্য-বিথার! আসামে-ত্রিপুরায় এবং অবশ্যই বাংলাদেশের জেলায়-উপজেলায় বাঙালির

ভাষা-উপভাষা-বিভাষার সমৃদ্ধি পৃথিবীর ভাষাভুবনে বাংলাকে অনন্য করে তুলেছে। কিন্তু কলকাতা-কেন্দ্রিক কিছু বাঙালির কাছে মান্য চলিতের বাইরে সব কিছুই দূরবর্তী ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য অপর। 'ওরা' ব্রাত্য, ওদের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করা চলে। এমন কী, 'ওদের' অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও ক্ষতি নেই কিছু।

২

এই বিমূঢ়তার একটা অভিব্যক্তি দেখেছি অতি সম্প্রতি। বাংলা ভাষার স্বয়ম্ভূ অভিভাবক হিসেবে উদ্ভূত একটি বৌদ্ধিক গোষ্ঠী ফতোয়া জারি করেছেন, বহির্বঙ্গে যত বাঙালি আছেন তাঁরা সেইসব রাজ্যের সরকারি ভাষায় নিজেদের নিঃশেষে মিলিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান। রবীন্দ্রনাথ কি এ ধরনের মনোভঙ্গিকে 'অজগর সাপের ঐক্যনীতি' বলেছিলেন? আসামে অসমীয়া সম্প্রসারণবাদ, বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে হিন্দু ফ্যাসিবাদ, ত্রিপুরায় উগ্র আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গে আর্যাবর্তের ধর্মীয় মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই বুঝি জাতীয় সংহতির চরম হবে? বাংলা ভাষা ও বাঙালি নিয়ে কথা বলার কোনও নৈতিক অধিকার এদের কাছে আছে কি? নেই, কারণ এদের জন্যেই বাঙালির পরিসর ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। স্বেচ্ছায়, সানন্দে নিজেদের ঘাড় এঁরা এগিয়ে দিচ্ছেন গিলোটিনের দিকে। অবশ্যই সেই গিলোটিন চালানোর দায়িত্ব তাদের হাতে রয়েছে, ইতিহাসে যারা অজস্র অসংখ্যবার বাঙালিত্বের পরিসরকে খর্ব করে এসেছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত-এক সাহিত্যপত্রে নামজাদা এক প্রাবন্ধিকের পিলে-চমকানো রচনা পড়লাম। তাঁর মতে, রাষ্ট্র বা রাজ্যের সীমা তো কিছুদিন পর-পর 'বদলে যেতেই পারে'। আবারও যদি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র পাল্টে যায়, মহাভারত এমন কী আর অশুদ্ধ হবে! বলিহারি! নিজের হাত দিয়ে নিজেরই নাক-কান কাটতে এত দক্ষতা বাঙালি ছাড়া আর কার থাকবে। এই যুক্তিতে গোর্খাল্যাণ্ড হোক, ঝাড়খণ্ড হোক, গৌড় হোক, মল্লরাজ্য হোক, পশ্চিমবঙ্গ বলে কিছুই না থাকুক, ক্ষতি কী? বুদ্ধিজীবীদের চুল-চেরা বয়ান বিশ্লেষণ, মেধাবী বিষাদ ও উল্লাস একই রকম থাকবে। 'মিথিলা পুড়ে গেলেও আমার কিছুই পুড়বে না'—রাজা জনকের এই উচ্চারণে বৈদান্তিক মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইদানীং বঙ্গজ পণ্ডিতকুলের বদান্যতায় নব্যমায়াবাদের বাড়বাড়ন্ত দেখছি। এঁদের আরেকটি সর্বজনীন প্রবণতা হল, নিজের চিন্তাকে অকাট্য মনে করা এবং অন্যদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ও উদাসীন থাকা ; চরম বিচ্ছিন্ন গজদন্তমিনারে বসে এঁরা ভাবনার অপরতার প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে অন্য সমস্ত অবস্থানকে অনবরত তিক্ত আক্রমণ করে যান।

আত্মহননে মাতোয়ারা ও চূড়ান্ত একদেশদর্শী এইসব বুদ্ধিজীবীরা যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির যুক্তি দেখান, তাঁরা কি ইতিহাস ও ভূগোলের সব অনুপুঙ্খ লক্ষ করেন কিংবা একই যুক্তি পশ্চিমবঙ্গ বহির্ভূত বাঙালির ক্ষেত্রেও (আসাম-ত্রিপুরা) প্রয়োগ করেন? বোধহয় না। গোর্খাল্যাণ্ডের সীমানা সমভূমি পর্যন্ত যাতে প্রসারিত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ ভাবে নতুন বসতি তৈরি করা হয়েছিল। এ বড় বিপজ্জনক

চতুরতা যার শেষ কোথায় তা বলা কঠিন। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সংস্কৃতির সত্যকে আচ্ছন্ন করে বলেই তো সংকট ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যা ছিল মূলত বৌদ্ধিক বিচারের বিষয়, উপভাষাতত্ত্ববিদ ভাষা-বিজ্ঞানীর গভীর বিশ্লেষণে যার সমাধান হতে পারত—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে তা-ই পর্যবসিত হল বাংলার অঙ্গচ্ছেদ ঘটানোর দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায়। নিজবাসভূমে পরবাসী হওয়ার তীব্র গ্লানিময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাঁদের কোনওদিন যেতে হয়নি, তাঁরাই ইদানীং আগুন নিয়ে খেলছেন। বুঝতে পারছেন না যে, এতে অচিরেই নিজের নাক-কান খোয়াতে হতে পারে এবং পরিণামে আবহমান বাংলার যাত্রাভঙ্গও ঘটে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই যে বিশ শতকে ধাপে ধাপে বাঙালি জাতিগত ভাবে নিজেদের জন্যে দুরূহতম সংকটের বলয় রচনা করেছে। সেদিকে নজর দিয়ে আমরা নতুনভাবে সামূহিক পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারতাম। আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার কারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেইসব অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল খুব। কিন্তু তা আমরা করছি না। ঔপনিবেশিক চক্রান্তে বাংলার রাষ্ট্র-সীমা হতে নির্বাসিত শ্রীভূমির সংলগ্ন বরাক উপত্যকার অধিবাসী হিসেবে কোনও কোনও বাঙালি রয়েছেন বিচিত্র অবস্থানে। যেন 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে' জাতীয় পরিসরে থাকার ফলে ঔপভাষিক অঞ্চলের অধিবাসীদের বারবার নিজেদের অনস্বীকার্য বাঙালিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করতে হয়। শুধু অসহিষ্ণু ও পীড়নপ্রবণ সরকারের কাছে নয়, নিজের মাতৃভাষার অন্য শরিকদের কাছেও। এই গ্লানির অসহনীয়তা মান্য চলিত-ভাষী সংস্কৃতি-কেন্দ্র সংলগ্ন জনেরা কোনও দিন বুঝতে চান না। তবু এটাও মূল সমস্যার তুলনায় গৌন। বরং যে-তীব্র সংকট বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎকেই বড় প্রশ্ন-চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এখনই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। খণ্ডিত হোক বা সীমাবদ্ধ, উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে যে রেনেসাঁস এসেছিল আর সেই সূত্রে দেখা গিয়েছিল দীপায়ন ও যুক্তিবাদ, শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে সেইসব স্তিমিত হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদ। বিশ শতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানা ধরনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি সহস্র ধারায় বিকশিত হল ঠিকই ; কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের পটভূমিও দৃঢ়তর হল। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় প্রতীচ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও মূল্যবোধে দীক্ষিত বাঙালি লেখাপড়া করেও কেবল হিন্দু বাঙালি বা মুসলমান বাঙালি হল। শুধু 'বাঙালি' পরিচয়ে দাঁড়ানোর জন্যে যে ধর্ম-নিরপেক্ষ চেতনাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে কর্ষণ করা দরকার ছিল, তা করা হল না। বীভৎস দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করে বাঙালি নিজের মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত হতে দিল এবং হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বকে বরণ করে নিল। ১৯৫২ সালে কেউ কেউ ভুল শোধরানোর পালা শুরু করলেন যা ১৯৭১-এ যৌক্তিক পূর্ণতা পেল। কিন্তু মৌলবাদের শেকড় না উপড়ানোর ফলে বাঙালিত্ব-বিরোধী অপশক্তি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিশ শতক পেরিয়ে যখন একুশ শতকে এলাম, দেখা গেল, পূর্বপাকিস্তানের

বা তার থেকে জন্ম-নেওয়া বাংলাদেশে ইতিহাস যেন উল্টোপাকে ঘুরতে শুরু করেছে।

ভুল ইতিহাস যখন রচিত হতে থাকে, সমাজ-প্রযুক্তির বিধি অনুযায়ী তাতে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ হয়ে নব্বই এর দশকে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সংস্কৃতি-সেনানী ও বুদ্ধিজীবীরা বারবার তেমন হস্তক্ষেপ করেছেন। ইতিহাসের বিপ্রতীপ গতি তাঁরা মেনে নেননি। কিন্তু অতি সম্প্রতিকালে সমাজ-সংবিদ থেকে উঠে-আসা কোনও ইতিবাচক সামূহিক প্রতিক্রিয়া যেন দেখা যাচ্ছে না। সময়-মন্থনের প্রক্রিয়াও কি স্তব্ধ হয়ে গেল তবে? বিশ্বব্যাপ্ত মৌলবাদ যে এককেন্দ্রিক নয়া উপনিবেশবাদের প্রশ্রয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বাঙালিত্ব কি বাংলাদেশে তার কাছে সাময়িকভাবে হলেও হার মেনেছে? এ তো গেল বাংলা ভাষাভাষীদের একটা বড় তরফের সংকট। অন্য বড় তরফের সমস্যা তৈরি হয়েছে এইজন্যে যে তাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বীক্ষায় নিঃশব্দে একটা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটে গেছে। বিনা প্রশ্নে সর্বজনীন মান্যতা পেয়ে গেছে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত এই পরাপাঠ যে তা মূলত হিন্দু বাঙালির সাহিত্য। এইজন্যে ইউসুফ জুলেখাই হোক বা মীর মশারফ হোসেন ও কায়কোবাদ কিংবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস—পশ্চিমবঙ্গে রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে এদের জন্যে বরাদ্দ হয় নামমাত্র পরিসর। আসলে সচেতনভাবে বাঙালিকে খুঁজলেও অবচেতন ভাবে হিন্দু বাঙালি কিম্বা মুসলমান বাঙালিদের খোঁজা হয়। সত্যি কথা বলতে কী, খোঁজা হয় শুধু মুসলমান কেননা মুসলমান ও বাঙালি—এই দুটি শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করার রেওয়াজ এই সেদিন পর্যন্ত ছিল না। নইলে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র কি লিখতেন বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের ফুটবল খেলার কথা?

মুশকিল এখানেই যে বাঙালি তার নিজস্ব সমৃদ্ধ লোকায়ত ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে শেখেনি। শিষ্টজনদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে লোকজীবন তো কৃষ্ণ মহাদেশ! এত বিশাল-সমান্তরাল পরিসর সম্পর্কে নাম-মাত্র কৌতূহল ছিল বলে সৃষ্টি ও নির্মিতিতে এক ধরনের কূপমণ্ডূকতা ও একবাচনিকতা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অথচ সেখানেই ছিল হিন্দু-মুসলমানদের পক্ষে নির্দ্বিধায় পরস্পরের শরিক হওয়ার সুযোগ। শেকড়ে জলের সহযোগ ছিল না বলেই হয়তো মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণের তাগিদে কল্পিত আকাশের কৃত্রিম নির্মাণ দেখা গেল। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মোহে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতি মনোযোগী হলেন না কেউ। হিন্দু বাঙালি আর্য-মহিমায় নিষ্ণাত হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইল ; রাজপুত ও মারাঠা বীরদের গৌরব-কাহিনি প্রচার করে সমকালীন গ্লানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিল। ফলে বাঙালিত্ব নয়, হিন্দুত্ব হল তার স্বাজাত্যবোধের ভিত্তি। স্বভাবত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে যারা নিকট আত্মীয়, সেই মুসলমানদের ভাবতে শিখল বিজাতীয় শত্রু বলে। অন্যদিকে মুসলমান বাঙালি যে কয়েক পুরুষ আগে বর্ণাশ্রম প্রথার পীড়নে কিংবা রাজধর্ম গ্রহণ করে বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে ধর্মান্তরিত হয়েছে—এই তথ্য ভুলে গিয়ে সুদূর

অতীতের মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে মিথ্যা আত্মীয়তা গড়ে তুলতে চাইল। আরবি ও পারসিক কাহিনির ছায়ায় খুঁজে নিতে চাইল। মানসিক আশ্রয়। সাহিত্যের নির্মিতি আর জীবনের যথাপ্রাপ্ত বাস্তব হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির পক্ষে এত দ্বিমেরু-বিষম ছিল যে কোনওভাবেই এদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু মানসিক বিরুদ্ধতা কোনও পক্ষই কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। কেননা হিন্দু হিন্দুই রয়ে গেল এবং উত্তরোত্তর আরও 'শুদ্ধতর' হিন্দু হয়ে ওঠার জন্যে আর্যাবর্তের ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে বাঙালিত্বের স্বাভাবিক অভিজ্ঞানগুলি মুছে ফেলতে লাগল। আর, মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক মুনাফার জন্যে, তাদের দেশজ শেকড় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টায়, মাতৃভাষা সম্পর্কেও বিরুদ্ধতা তৈরি করতে থাকলেন। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে দেওয়ার বদলে আত্মবিস্মরণ সংক্রমিত করার মরিয়া চেষ্টা চলতে লাগল। কী মুসলমান কী হিন্দু—ধর্মতন্ত্রের কাছে সংঘবদ্ধ সমর্পণ শুধু অন্ধতা ও অসহায়তা উৎপাদন করে। ধর্মকে যারা কাজে লাগায়, বদ্ধতাই তাদের অস্ত্র ও অন্বিষ্ট ; একমাত্র সদর্থক ভাষা-চেতনাই দিতে পারে মুক্তি। তাই ভালো বাঙালি যে হতে পারে, সে-ই ভালো মানুষ হয়ে ওঠে। হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বের দিকে বেঁকে গেলে সেই পথ চোরাবালিতেই শেষ হয়। বাঙালি যে আন্তর্জাতিক মানবচেতনার উপাসনা করে, নিছক হিন্দু বা মুসলমান হয়ে উঠলে তা কখনও সম্ভব নয়। এইজন্যে নয়া ঔপনিবেশিক প্রতাপের বিশ্বকেন্দ্র গত তিন-দশক ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে চতুরভাবে হিন্দু ও ঐশ্লামিক মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। খাঁটি বাঙালি যে কখনও মৌলবাদী হতে পারে না, তা বাঙালির ইতিহাস ঠিক মতো অনুশীলন করলেই বোঝা যায়। তাই আর্যাবর্ত-মধ্যপ্রাচ্য-সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্য—এই তিন অক্ষশক্তির একটাই লক্ষ্য : বাঙালিত্বকে ধ্বস্ত করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তুষের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া। বাঙালি চেতনায় যাবতীয় মিথ্যার প্রকৌশলের বিরুদ্ধে একটা সহজাত প্রতিরোধ আছে বলেই ওই অক্ষশক্তি পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে ও বাঙালির অন্যভুবনে তাদের আক্রমণকে কখনও শিথিল করে না। তবু সর্বাত্মক বিদূষণের বিরুদ্ধে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ যে আজও প্রতিরোধের লড়াই-এ নেতৃত্ব দিচ্ছে, এতেই বাঙালির প্রবল আত্মিক শক্তি প্রমাণিত। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি—এর কারণ, রাজনৈতিক লড়াই ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি তখন শানিততর করে চলছিলেন। চলমান ইতিহাসের অস্থির পটভূমিতে দাঁড়িয়েও বাঙালির প্রগতি-ভাবনা এখনও চেতনাকেন্দ্র সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। বহুস্তর বিন্যস্ত সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পরিধি ও ভিন্ন ভিন্ন উপকেন্দ্র সম্পর্কে মনোযোগী হয়েও মূল ভাবকেন্দ্রকে চিরজাগ্রত রাখার ব্যাপারে প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গ অমনোযোগী ছিল না কখনও।

বস্তুত এইজন্যে প্রত্যাশাও অনেক। কোথাও অন্ধবিন্দুর আশঙ্কা লক্ষ করলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হয়। ভারতীয়ত্ব 'নির্মাণ' করতে হয়, কিন্তু বাঙালিত্ব সহজ ও

স্বতঃস্ফূর্ত। চৈতন্য থেকে লালন পর্যন্ত যে-ধারা প্রবহমান, তাতে বাঙালিত্বের আধার ও আধেয়কে বিশ্বমানবিক চেতনায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে। ভারতীয়ত্বের ধারণায় বাঙালি যে অভূতপূর্ব বস্তুগত ও চিন্তাগত উপাদান সরবরাহ করেছে, সেই ইতিহাস অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে বুঝব, এর রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু যতটা প্রকট, সাংস্কৃতিক অন্তর্বস্তু ততটা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির বোধকে ক্রমাগত চেষ্টায় নির্মাণ করতে গিয়ে বারবার উদ্ধত প্রতাপের কবলে পড়তে হয়েছে। অথচ এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে কেউ কখনও আন্তরিক বিশ্লেষণ করেননি। এতে সবচেয়ে বিপদ যাদের হয়েছে, সেইসব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাঙালিদের কথা আগে লিখেছি। এবার আরও একটু স্পষ্ট করে লিখতে চাই, আসাম-ত্রিপুরা-মেঘালয়- বিহার-উড়িষ্যা-উত্তরপ্রদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সেইসব বাঙালিদের কথা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা ধার করে বলা যায়—এদের ঘর নেই—আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে। এদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনও মানচিত্র নেই। তাই এরা কেবল সমাজতত্ত্ববিদদের অন্তর্দেশীয় প্রব্রজনের বিষয়।

৩

এঁদের জন্যে বাঙালিত্ব অটুট রাখার কোনও পথ খোলা নেই। আসামের লোক-গণনায় স্থানীয় রাজনীতির চাপে একদল বাঙালিকে বলতে হয় 'আমাগো ভাষা অহইম্যা', অন্যদের ক্ষেত্রে কোনও জিজ্ঞাসাবাদের তোয়াক্কা না করে তাদের লেখানো হয় 'নব অসমীয়া' বলে। সর্বশেষ আদমসুমারিতে মোল্লাতন্ত্রের এক দাপুটে রাজনৈতিক প্রতিনিধি আসামের অভিবাসী মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছে, মাতৃভাষা বাংলা ছেড়ে দাও—অসমিয়া পরিচয় লেখাও। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হয়, হচ্ছে। বারেবারে। প্রশাসনিক সন্ত্রাসবাদ উগ্র চেহারা নিয়ে দেখা দেয় যখন, একাধিক প্রজন্ম ধরে আসামে বসবাসকারী বাঙালিদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, হচ্ছে বিদেশি শনাক্তকরণের নোটিশ। কিংবা হালে বরপেটায় উগ্র অসমিয়া সম্প্রসারণবাদের ঠ্যাঙারে পুলিশবাহিনী সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে গুলি করে মেরেছে অভিবাসী বাঙালি মুসলমানদের। এ আরেক অশনি-সংকেত। বাসস্থানের, শিক্ষার ও জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদের, আরও হবে একই অবস্থা মেঘালয়-মনিপুর-মিজোরাম-অরুণাচল-নাগাল্যাণ্ডে। আসামে বাংলা ভাষার পাঠ্য বইতে সচতুরভাবে ভাষার শুদ্ধতায় অন্তর্ঘাত করা হয় অসমিয়া শব্দবন্ধ ও বাক্যগঠনরীতি ব্যবহার করে। উপনিবেশীকৃত মন নিয়ে প্রান্তিকায়িত বাঙালি এই বেপরোয়া বিদূষণকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্য খেটে-খাওয়া ও ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি। মেঘালয়েও তা-ই। সুতরাং বাঙালিদের সামনে দোঁ-আশলা অসমিয়ায় বা হিন্দি-ভাষীতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কী পথ আছে? বাঙালিত্বের কর্ষণ যখন বিপজ্জনক, হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্বের পথই খোলা থাকে শুধু।

বৈদ্যুতিন গণ-মাধ্যমের মধ্য দিয়ে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান তত্ত্বের বৌদ্ধিক সন্ত্রাসে

বাঙালিত্ব ও বাংলা ভাষা কোনঠাসা। তার ওপর রয়েছে ইংরেজি-মাধ্যম পাঠশালাগুলির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে-পড়া মেকি সাহেবিয়ানার দৌরাত্ম্য। ইংরেজি তো নিশ্চয় শিখব আমরা। কিন্তু হীনমন্যতা নিয়ে বাঙালিরা ইংরেজিয়ানার পেছনে ছুটেছেন, তাতে বকচ্ছপ ও হাঁসজারুদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে শুধু। শৈশব জুড়ে এখন হরেক রকম কমিকস, কৈশোরে টিন-এজারদের রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার, আর যৌবনে যৌনতা ও হিংস্রতার ককটেল। এটা অবশ্যই সর্বভারতীয় সমস্যা ; কিন্তু আত্মবিস্মৃতির চক্রব্যূহে বন্দী বাঙালির জন্যে তা বিশেষ সমস্যাও বটে। বিশ শতকে দেশ স্বাধীন হল, বিচিত্র কূটাভাসে স্বাধীনতার মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ বাঙালি নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে গেল তবু তাঁরা ভারতীয়তার নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'আরণ্যক' এর সেই স্মরণীয় বাক্যটি ফিরে ফিরে আসে : ভারতবর্ষ কোন দিকে? পচা গলা সামন্ততন্ত্র যেখানে জাতপাত-ধর্মান্ধতা-কুসংস্কারের অন্ধকূপ তৈরি করে রেখেছে, যেখানে হরিজন পোড়ানোর মোচ্ছব চলে,সতীদাহ প্রথা পায় রাষ্ট্রীয় প্রতাপের সমর্থন, নির্বাচনী ঢাকেকাঠি পড়া মাত্র ধর্মীয় উন্মাদনার জিগির তোলা হয়—তা-ই তো প্রকট ভারতবর্ষ। কেননা সংখ্যার জোরে এই শক্তি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাট সামলায় এবং তাদের রুচি ও সংস্কৃতি মাফিক জাতীয় সংহতির বুলি কপচায়। এই ভারতীয়তায় 'দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে' নেই ; মাৎস্যন্যায় আছে শুধু। চৈতন্য-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-লালন যে ভারতবর্ষের নির্মাতা, বাঙালি তো তারই উত্তরাধিকারী। সাম্প্রতিক ইন্টারনেট আর ই-মেলের জমানাকে আধিপত্যবাদীরা ব্যবহার করে গণেশের দুধ খাওয়ার বৃত্তান্ত আসমুদ্র হিমাচলে ছড়িয়ে দিতে। উপগ্রহ-প্রযুক্তিকে কাজে লাগায় অহরহ মধ্যযুগীয় অপচেতনাক বিনোদনের মোড়কে পরিবেশন করার জন্যে। এই ভারতীয়তার নির্মাণই তো হচ্ছে অষ্টপ্রহর। ইংরেজি পড়ে নানা ধরনের প্রযুক্তিতে যত কৃতবিদ্যই হোক এখনকার প্রজন্ম, বিশ্বায়িত ভোগবাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্পই নেই তাদের। সুকুমার-উপেন্দ্রকিশোর কিংবা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, নজরুল-জীবনানন্দ, অবনীন্দ্র-সুলতান, কমলকুমার-ইলিয়াস যে বহুস্বরিক বাঙালিত্বের স্থপতি—তার তাৎপর্য অনুশীলনের তাগিদ দিন দিন কমে আসছে।

তবু এই দুস্তর মরুই শেষ কথা হতে পারে না। চলমান ইতিহাসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে দ্বিরালাপের সম্ভাবনা, পুনর্নির্মাণের আর্তি। শুধু তাকে খুঁজে নিতে হয়। বিশ শতকের অন্তিম প্রহরে যেমন দেখা গেছে নবজাগরণের উদ্যম, শুধু চিন্তাবিত্তে ঋদ্ধ হওয়ার জন্যে নয়—বাস্তব পরিসরে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যেও। আপনার গন্ধে আপনি বিভোর বৌদ্ধিক বর্গীয় কস্তুরীমৃগেরা থাকুন একান্ত নিজস্ব চারণভূমিতে ; বহুধাবিচ্ছিন্ন সাধারণ বাঙালির কাছে জীবনচর্যা ও মননবিশ্বের নতুন স্থাপত্য-সম্ভাবনার বার্তা যদি পৌঁছে দেওয়া যায়—নবজাগরণ বাস্তবায়িত হবে নিশ্চয়। ঐতিহ্য ও বর্তমানের দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে এখনও সংশয় রয়েছে ; নানা ভুবনের বাঙালির বিচিত্র জটিল সমস্যা এখনও অভিনিবেশের বিষয় হয়নি। হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব নামক মহাসন্দর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার মতো আকরণোত্তর বিন্যাস এখনও আধুনিকোত্তর পর্যায় সত্ত্বেও

খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাঙালিত্বই যে খাঁটি ও সার্থক বিকল্প, এই উপলব্ধিতে পৌছানোর কার্যকরী পথ তৈরি করা যায়নি এখনও। নবজাগরণের উদ্যম যদি মৌলবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-অভ্যন্তরীন আধিপত্যবাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য আক্রমণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে পারে, তাহলে প্রতিরোধের সম্ভাবনা আপনি তৈরি হবে। আরোপিত সমন্বয়পন্থা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যপ্রীতি হতে পারে আমাদের বিশল্যকরণী। সংশয়-দ্বিধা-দোলাচল শুধু বৌদ্ধিক, লোকমনের নয়। তাই বাংলা ও বাঙালির মনের কথা বেজে উঠেছে একতারায়-দোতারায় :

'নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম
একই মায়ের পূত।'

সত্যি কি 'একই মায়ের পূত' প্রান্তিক বাঙালিরাও যাদের না আছে নিজস্ব মানচিত্র না আছে আঙিনার নিশ্চয়তা? এই সংশয় সহজে দূর হয় না বলেই বয়ানে আসে বিহ্বলতা। তবু তৃষ্ণা জেগে থাকে 'একই বরণ দুধ' এর শরিক হওয়ার জন্যে। কোনও তাৎপর্যই সংগ্রাম ছাড়া অর্জনীয় নয়। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নানা ভুবনের বাঙালিদের সংগ্রাম নানা ধরনের। আরোহী ও অবরোহী পথে চলতে চলতে সংগ্রামের প্রকরণ তো শিখে নিতে হয় । পুনর্বিন্যস্ত করতে হয় অস্তিত্বের প্রকল্পও। ইন্টারনেটের অধিপরিসরে ভাষাশূন্য বুদ্বুদপুঞ্জের তীব্র মাদকে ওই প্রকল্প কি আচ্ছন্ন হয়ে যাবে অথবা নতুন আঙ্গিকে দেখা দেবে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা : এই প্রশ্ন মীমাংসিত হবে অদূর ভবিষ্যতে।

আপাতত প্রত্যুত্তরযোগ্যতার নির্মাণ শুরু হোক বাঙালির বহুবাচনিক পরিসরে।

বাংলা ভাষার বিপন্নতা

কেন এই শিরোনাম? একুশ শতকের গোড়ায় কি এমন কিছু নতুন ও জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে যে এবিষয়ে আরও একটি প্রতিবেদন জরুরি হয়ে পড়েছে! বিপন্নতা কি আলাদা ভাবে বাংলা অথবা যে-কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল-ভিত্তিক ভাষার অথবা বাঙালি জাতির? আরও একটি গোড়ার প্রশ্ন এসে যায় : বিপন্নতা কী এবং কেন! প্রতীত বাস্তবতা (Virtual reality)-র পর্যায়ে চিহ্নায়নের সন্ত্রাস যখন কার্যত নিশ্চিহ্নায়নের তোড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব কিছু, একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রাগ্রসর ও অতি-পশ্চাৎপর সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিসর—সংযোগের প্রয়োজন ও তাৎপর্য পুরোপুরি উন্মূল হয়ে পড়ছে। তাহলে সংযোগের সবচেয়ে মৌলিক মাধ্যম ভাষায় কি অবান্তর হয়ে পড়ছে ভাষার সন্ততি চিহ্নের উদ্ধত আধিপত্যে? বিশ্ব জুড়ে অন্তর্জাল এখন বৈদ্যুতিন ইশারায় সংবাদ বিনিময়ে অভ্যস্ত করে তুলছে আমাদের। অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে, কার্যত মুহূর্তের মধ্যে, সূচিমুখ জ্ঞাতব্য পৌঁছে দিচ্ছে যে-কোনো প্রান্তে। মেদহীন ভারহীন শাখা-প্রশাখাহীন তথ্যের বুদ্বুদ উন্মীলিত ও নিমীলিত হচ্ছে মুহূর্মুহূ। বাংলা ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন, বিশ্বায়নের এই সাম্প্রতিকতম অভিঘাত বিপুল ও অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তাঁদের ভাষা-চেতনায় অর্থাৎ বাচনিক লক্ষ্য- আধার-আধেয়-কৃৎকৌশল-পরিধি-সম্ভাব্য বিচ্ছুরণ সম্পর্কিত ধারণায়। বিপন্নতা তৈরি হচ্ছে এইসব অনুষঙ্গে।

এই পৃথিবীতে ছাব্বিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, আন্দামান এবং ইংল্যান্ডে আমেরিকায় এঁদের বসবাস। স্বভাবত বাঙালি জাতিসত্তা সম্পর্কে সবাই সচেতন নন, কেউ কেউ আবার পুরোপুরি অনবহিত ইদানীং। তবু চান বা না চান, ভাষার মধ্য দিয়ে বহমান ঐতিহ্য এঁদের সবাইকে ঋদ্ধ করে। নিদালির ঘোরের মধ্যে সোনার কাঠির স্পর্শ যোগান দেয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি কেন জাতিসত্তার সম্ভাবনা সম্পর্কে উদাসীন এবং তার ভাষাচেতনা কেন কখনও কখনও আঁধিতে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে : এই প্রশ্ন মীমাংসা দাবি করে। ভারত রাষ্ট্রের লাগাম যাদেরই হাতের মুঠোয় থাকুক না কেন, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয়দের প্রবক্তারা উপনিবেশ কায়েম রাখতে চায় বাঙালির মনে এবং সুকৌশলে তাদের ভাষা-চেতনায় বেনোজল ঢুকিয়ে বিদূষণে অভ্যস্ত করে ফেলে। এর উৎকট দোসর ভাষিক সম্প্রসারণবাদ আসামে অসমিয়াকরণের মধ্যে কীভাবে সক্রিয়, তার খবর অনেকেই রাখেন না। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত আসামের বাঙালিরা। সরকারি মদতে বেপরোয়া আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদীরা আসামের বহু ঐতিহ্যসম্পন্ন বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়কে অসমিয়া-মাধ্যম বিদ্যালয়ে

পাল্টে নিয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে ছিন্নমূল বাঙালিদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের আদমসুমারিতে নব-অসমিয়া বলে দেখিয়েছে। একুশ শতকের প্রথম আদমসুমারিকে ওরা আরো বেপরোয়া ভাবে অসমিয়াকরণের কাজে লাগিয়েছে নাৎসি কায়দায়। বরাক উপত্যকার রক্তের মূল্যে বাঙালিরা মাতৃভাষার মর্যাদা আপাতত রক্ষা করতে পারছে। কিন্তু সেখানেও সরকারি মদতে খিড়কিদুয়ার দিয়ে অসমিয়া চাপানোর চেষ্টা চলছে ; পাঠ্য বইগুলিতে সরকারি পুস্তক পর্ষদের ভাড়াটে কলমচিদের দিয়ে অসমিয়া শব্দ, বাক্‌বিধি ও নিম্নমানের বিষয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ফলে বাঙালি শিশু-শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষা-চেতনাকে ঠিকমতো বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে না। বরং ভুল ভাষারীতি শিখছে বানানে। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার বদলে তাদের ভাষা-মনস্তত্ত্বকে পঙ্গু ও বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে।

বাঙালিরা পরস্পর সম্পর্কে যত উদাসীন, নিরাসক্ত ও আত্মঘাতী কুযুক্তিতে আস্থাশীল—তত আর কেউ নয়। ঐতিহাসিক কারণে দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি বাঙালিরা শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রুটি-মাখন নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারার লড়াই হল, তার ফলে বহু লক্ষ বাঙালি সাত প্রজন্মের ঘর হারাল। ঘরের সঙ্গে হারাল সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জমি ও আকাশ, বিশ্বাস-স্থৈর্য-সংলগ্নতাবোধের আলো-হাওয়া-রোদ। তবু, তখনও শেষ হল না স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে যাওয়ার যন্ত্রণা। আসামে-আন্দামানে-দণ্ডকারণ্যে মেঘালয়ে-মরিচঝাঁপিতে-দিল্লিতে বারবার বাঙালিকেই কেন ধনে-জনে-প্রাণে বিপন্ন হতে হয়? শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলে, এই অপরাধে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন পুলিশ বাহিনী নিছক অসমিয়া সম্প্রসারণবাদীদের প্ররোচনায়, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সত্যাগ্রহরত তরুণ-তরুণীর উপর গুলিবর্ষণ করেছিল আসামের শিলচরে। ১১ জন শহিদ হয়েছে মাতৃভাষার জন্যে, ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ঘটনার পরে এই দ্বিতীয়বার। সেখানেই কিন্তু ইতিহাস থেমে যায় নি। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জে ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট একজন এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই আরও দুজন বাংলা ভাষার উপর নিগ্রহ রুখতে শহিদ হয়েছেন। তবু, হায়, বাঙালিদের মধ্যেই এমন অনেকে আছেন যাঁরা বরাক উপত্যকার আত্মিক অভিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেন না, জানতে চানও না। এ অঞ্চল যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের চক্রান্তে ১৮৭৪-এ এবং পরে ১৯৪৭-এর গণভোটে প্রভুত্ববাদীদের ধূর্ত কৌশলে বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—তার প্রথমটার খবর রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামে অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া বঙ্গজনেরা জানেন না। জোর করে বরাক উপত্যকাকে আসামের লেজুড় করে দেওয়া হলেও ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক-ভাষিক নিরিখে বরাক উপত্যকা বৃহত্তর বঙ্গভূমির (সাম্প্রতিক বিহার, পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে) অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব এখানকার বাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষার বিপন্নতা তার ভাষিক-আস্তিত্বিক-রাজনৈতিক সত্তার সংকটেরও অভিব্যক্তি।

ইতিহাসের বয়নে নানা ধরনের অন্ধবিন্দু থাকে। কখনও তাদের প্রশ্রয় দিই আর

কখনও এড়িয়ে চলি। বাংলা ভাষার আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা যেভাবে গড়ে উঠেছে, তারও যথার্থ অনুশীলন করিনি আমরা। করলে হয়তো ওইসব অন্ধবিন্দু থেকে অন্তর্দৃষ্টির উদ্‌ভাসনে পৌঁছানো যেত। সমাজ-ভাষাতত্ত্ব বা ভাষামনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই এইজন্যে। দরকার বাঙালিত্ব সম্পর্কে অনুভূতির, বাঙালি হয়ে ওঠার দীর্ঘ ও উচ্চাবচতাময় ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাম পাঁচালী, ইউসুফ জুলেখা হয়ে রবীন্দ্রনাথ, লালন, মহাশ্বেতা, ইলিয়াসে বহমান ভাষাচেতনা স্বভাবে দ্বিবাচনিক ও অনেকান্তিক। নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও গ্রামীন সজীবতায় বারবার যে বহুবাচনিক আদল ফুটে ওঠে, তাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট নিরিখে ব্যাখ্যা করতে চাইলে মৌলবাদী ভাবনায় খপ্পরে গিয়ে পড়ব। হিন্দু ও মুসলমান, শহুরে ও লোকায়ত বর্গ মিলে একটাই ভাষাবিশ্ব বাঙালির। কয়েকটি শব্দ বা বাগ্‌বিধির প্রয়োগ বা অপ্রয়োগ হয়তো ভাষা-ব্যবহারের হিন্দুয়ানি বা মুসলমানি নির্দেশ করে। কিন্তু সমাজভাষাতাত্ত্বিক এইসব চিহ্নায়কের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে ভুলে যাব লোকায়ত মনীষার এই দিগ্‌দর্শক উচ্চারণ : 'নানান বরণ গাভীরে ভাই/একই বরণ দুধ'। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, বাঙালির ভাষাপরিমণ্ডলে কোথাও নিম্নচাপ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। দমকা হাওয়ার দু-তিনটে ঝাপটা টের পাচ্ছি, হয়তো ঝড় উঠবে কিংবা তার আগেই দুর্যোগের ভিন্ন একটি রূপ দেখতে পাব আমরা। একদিকে বিশ্বায়নের নামে আধিপত্যবাদী সমগ্রায়ন অর্থাৎ তথ্য-বিনোদন প্রযুক্তির সর্বাত্মক সন্ত্রাসে বাঙালির ভাষাচেতনার বৈশিষ্ট্য ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে লোকায়ত পরিসরকে প্রান্তিকায়িত করে বকচ্ছপ ও হাঁসজারু প্রতিভাষাদের রমরমা দিনদিন নির্বাধ হয়ে উঠছে।

হ্যাঁ, এটা শুধু বাংলা ভাষারই সমস্যা নয়। কিন্তু তবু আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তিত হতে হচ্ছে এইজন্যে যে কোনো আসন্ন বা চলমান যুদ্ধ থেকে অন্য কারও ভরসায় সরে থাকা যায় না। অন্য ভাষাভাষীদের একই যুদ্ধ হয়তো, কিন্তু তাঁদের যুদ্ধ তাঁরা করতে থাকুন, আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই করতে হবে, কোনো অজুহাতেই তা মুলতুবি রাখা চলবে না।

২

আসলে, স্বাধীনতার নামে দেশবিভাগ বাঙালি জাতির আদি পাপ। আর, সেই পাপের ছায়ায় আক্রান্ত বাংলা ভাষা। 'দিজ্জই কান্তা খা পুনবন্তা'র পর্যায় কিংবা তারও আগে সুতনুকা প্রত্নলিপির সময় থেকে সূক্ষ্মভাবে ও বহুধা বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা যেভাবে বহতা নদীর মতো ক্রমশ নাব্য হয়ে উঠেছে—স্পন্দনময় লোকজীবনের ঐশ্বর্য স্বীকরণের প্রক্রিয়াই তাতে প্রমাণিত। ছোট-বড় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আর্য-অনার্য-লৌকিক উপকরণ আত্মস্থ ও পুনর্নির্মাণ করতে করতে বাংলা ভাষা আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় আধিপত্যবাদী বর্গ মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতে চায়।

প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গের ভাষাকে সাংস্কৃতিক রাজনীতিগত বাধ্যবাধকতায় 'সংশোধন' করে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যদি নিম্নবর্গীয় চেতনার নিরিখে পুনঃপাঠ করি আজ, ভাষার সংগঠনে প্রতাপ ও অন্তেবাসীর দ্বন্দ্বের ইতিহাসও বুঝে নিতে পারব। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন সময় আধিপত্যবাদের আগ্রাসী মনোভাব ভাষা-ব্যবহারকারীদের জন্যে বিপন্নতা তৈরি করেছে ; কিন্তু সেই বিপন্নতার মোকাবিলা করেই এগিয়েছে বাংলা ভাষা। রণকৌশলগত কারণে কিছু কিছু পুরনো উপাদান বর্জন করতে হয়েছে, আবার কিছু কিছু নতুন প্রবণতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যতদিন এই দ্বিবাচনিকতার অবকাশ থাকে, ততদিন ভাষা মরা নদীর সোঁতা হয় না। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে পারসিক উপকরণ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধই করেছিল যদিও এইসব বিজাতীয় উপাদান মেনে নেওয়ার পেছনে সক্রিয় ছিল বৈষয়িক বুদ্ধি ; ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের কাছাকাছি যাওয়ার মনস্তাত্ত্বিক তাড়না।

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে মুৎসুদ্দি বর্গের পোয়াবারো হলেও তাদের নতুন ভাষা-বিন্যাস অনিবার্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের অন্যান্য অংশে। বাংলা ভাষার গ্রহিষ্ণুতা তার ধারণ-ক্ষমতাকে কতদূর অবধি বাড়াতে পেরেছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা সাহিত্যের দুরন্ত গতিবৃদ্ধিতে তার প্রমাণ মেলে। প্রতীচ্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত বৌদ্ধিক বর্গ যদিও প্রথম দিকে ইংরেজিকে বাংলার প্রতিপক্ষ হিসেবে হাজির করে মিথ্যা লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রমশ মুষলের মতো ব্যবহার কমে গিয়ে তুলির মতো ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এতে শেষ পর্যন্ত লাভবান হল বাংলা ভাষা। তখনও কয়েক দশকের জন্যে বিপন্নতার ঘূর্ণিবার্তা তৈরি হয়েছিল; কিন্তু ধুলো ও আঁধি একসময় সরে গেল। তেমনই রাজনীতির ধর্মীয়করণের ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবাষ্প যখন ছড়াতে শুরু করল, ইসলামি বাংলা নামক কাঁঠালের আমসত্ত্ব দিয়ে ভাষার অন্য আরেক ধরনের বিপন্নতা সূচিত হল। এর আগে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, উপনিবেশবাদ সংস্কৃত-পারসিক-ইংরেজি ভাষার প্রতাপমূলক উপস্থিতি দিয়ে যা করতে পারেনি, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তাই করতে সমর্থ হল। একটু আগে যাকে আদি পাপ বলেছি, সেই দ্বিজাতিতত্ত্ব-ভিত্তিক দেশবিভাগ বাংলা ভাষায় কার্যত অতলান্ত বিপন্নতার সূচনা করেছে। চর্যাপদেরও আগে থেকে যে-ভাষার বহুরৈখিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, এবার সেই ভাষার ব্যবহারকারীদের মধ্যে তৈরি হল সংশোধনাতীত বিচ্ছেদের প্রাচীর।

'সংশোধনাতীত' বলছি এইজন্যে যে বাঙালি আর নিজেকে একই জাতি-গোষ্ঠীর আবেগ-সিঞ্চিত অনুভূতি-নিবিড় অবস্থানে দেখতে পাচ্ছে না। সহস্রাধিক বছরের চলমান ঐতিহ্যবোধে হস্তক্ষেপ করল ধর্ম। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান—এই দুটি অভিজ্ঞানে কোথাও কাহ্নপা নেই, চণ্ডীদাস নেই, মধুসূদন নেই, জীবনানন্দ নেই, ওয়ালীউল্লাহ নেই, অবন ঠাকুর নেই, সুনীতি চাটুজ্জে নেই, শহীদুল্লাহ নেই। পাকিস্তানের পাঁজর থেকে বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ার পরেও আদিপাপ ঘুচল না। হাসান আজিজুল হক-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সত্ত্বেও নয়। নইলে একুশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশের মুখে আবারও পাকিস্তানি মুখোসের উকিঝুঁকি দেখতে পেতাম না। যতদিন বাঙালি হিন্দু

বাঙালি আর মুসলমান বাঙালি হয়ে থাকবে, শুধু বাঙালি হতে শিখবে না—ততদিন বাংলা ভাষার বিপন্নতা কাটবে না। প্রাগুক্ত ওই আদি-পাপ শুধু বাঙালির ভূমি, মনন ও হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করেনি, তথাকথিত হিন্দুস্তানের বাঙালিদের বহুধা-বিচ্ছিন্ন করেছে। ছিন্নমূল বাঙালির প্রব্রজন শুরু হয়েছে ধিক্কার-গ্লানি-লাঞ্ছনা-অপমানের বিস্তারের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত টলোমলো, তার মানচিত্র যে-কোনো দিন বদলে যেতে পারে। বহু বাংলাভাষী পণ্ডিত এখন বাংলা ও বাঙালির 'সংকীর্ণ' পরিচয়ে বাঁচতে নারাজ। হিন্দুত্ববাদীরা (প্রচ্ছন্ন বা প্রকট) যে আর্যাবর্তের প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়, এই সত্য আজ অন্ধের কাছেও স্পষ্ট। অথচ ওই পণ্ডিতেরা দেখেও দেখেন না, বুঝেও বোঝেন না যে আজকের ভারতবর্ষে শাসকশক্তি অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদের প্রতিনিধি।

অত্যন্ত চতুরভাবে এই প্রভুত্ববাদী শক্তি সমস্ত ধরনের গণমাধ্যমকে কব্জায় নিয়ে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া চালু করেছে। বাংলা ভাষার ঘোর শত্রু এরা। কার্যত ঘোষিতভাবেই বহুধা-বিচ্ছিন্ন বাঙালির নিজস্ব ভূগোল নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদেশি খেদাও মানে বাঙালি খেদাও। আমাদের পণ্ডিতেরা এবিষয়ে 'এথনিসিটি' 'ডায়াস্পোরা' 'সোস্যাল টেনশন' ইত্যাদি লক্ষ্য করে আপ্লুত হন ; কিন্তু কোদালকে সোজাসুজি কোদাল কখনো বলেন না। এঁদের বাঙালিত্ব যেহেতু বাস্তব জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত (কেননা এঁদের ঘর নেই, আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে), বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিসরে দেখতে পাই অদ্ভূত অনিশ্চয়তা ও লক্ষ্যহীনতা। যখন বাংলা ভাষার বিপন্নতা নিয়ে ভাবি, নিজস্ব ভূগোলবিহীন এইসব বাঙালিদের বাচনিক অভিজ্ঞতাকে কি বাদ দেব প্রত্যাখ্যাত, অপ্রয়োজনীয় ও ফালতু 'অপর পরিসর' বলে? এঁদের দৈনন্দিন ব্যবহার এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োগে কোনো ধরনের কৌনিকতা ও উচ্চাবচতা খুঁজব কিনা—এ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য চাই। অথবা খণ্ডিত বাঙালি সত্তার ভাষা-ব্যবহার, তার সংকট ও সম্ভাবনা বা সম্ভাবনা-শূন্যতা নিয়ে বয়ান তৈরি করে ভাবতে হবে যে এটাই ব্যতিক্রমহীন সর্বজনীন সত্য। তবে বাংলা ভাষার প্রাণকেন্দ্র বলে কলকাতা মহানগরকে যদি ধরে নিই, সেখানে কি বয়ে চলেছে শুধুই সুপবন? প্রচুর বাংলা বই বেরোচ্ছে, ঢাউস পত্রিকা বিনোদন-পণ্য হয়ে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে, লিটিল ম্যাগের টেবিলগুলিতে তুফান উঠছে। কোথাও কোনো সমস্যার ছায়া নেই, যথাপূর্বম্ তথাপরম্। বিপন্নতা কি তবে কেন্দ্রচ্যুত ও কেন্দ্রবহির্ভূত ভাষা-ব্যবহারকারীদের?

লাগাতার কয়েক বছর কলকাতা বইমেলার দম-আটকানো ধুলো-ছিটোনো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, এত লাখ-লাখ যদি ক্রেতা-পাঠক, তাহলে ছোট পত্রিকাগুলোর নুন আনতে পান্তা ফুরোয় কেন? কেন স্ট্যাণ্ড প্যাভিলিয়নে আর টেবিলে-টেবিলে অক্রেতা আড্ডাবাজদের ছেঁড়াখোঁড়া জমায়েত শুধু? 'সারী, তুমি কার'? 'ওগো বাংলা ভাষা, তুমি কার?' মনে আসে বিল্‌কের সেই মৃত্যুহীন এপিটাফের দুটি পঙক্তি : 'Rose oh the pure contradiction, delight !/Of being no ones sleep under so many lids.' মনে হয়, ইউরেকা, এই তো পেয়ে গেছি বাংলা ভাষারও চমৎকার লাগসই এপিটাফ। 'প্রত্যেকের চোখের পাতায়, তবু কারও নিদ্রা নও তুমি!' কারা যেন

সেদিন আক্ষেপ করছিলেন, ইংরেজি-মাধ্যম ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, থুড়ি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বাচ্চারা বাংলায় কথা বললে মা-বাবারা 'আনকালচার্ড' বলে প্রমাণিত হয়। এই লজ্জা পাওয়ার ভয়ে এখনকার 'সচেতন' মা-বাবারা সদাসতর্ক। তবে আর বাংলা বই কে পড়বে, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, শিবরামের ওপর ধুলো জমবে। জমুক। 'সার্ফ অ্যাক্সেল হ্যায় না' গোছের ভঙ্গিতে দেখিয়ে দেওয়া যাবে ঝুড়ি-ঝুড়ি কমিক্স। না, হল না। কম্পিউটার গেমস আর কেবল এনিমেশনস। তাই কফি হাউসে হোক আর বইমেলার টেবিলে হোক, তিরিশ-পঁয়তিরিশের নিচে কাউকে তীর্থের কাক হতে দেখি না। ভাষার দোকানদারি এখনও করছেন মধ্যবয়স্ক ও প্রৌঢ় জনেরা।

৩

অতএব ভাষার ভবিষ্যৎ থাক, ভবিষ্যৎ অতীত নিয়ে কথা বলাই সমীচীন। অন্তর্জালের নব্যসংযোগ প্রকরণে সমস্তই অধিপরিসর, প্রতীত বাস্তবে ভাষাও প্রতীত চিহ্নায়ন প্রকরণের বুদ্বুদ। ইংরেজি-মাধ্যমে যাঁরা কোনো-এক ভবিষ্যতের জন্যে মুদ্রা-উৎপাদক মানবযন্ত্রদের জড়ো করছেন আজ, ইংরেজি ভাষা নিয়েও তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ইংরেজিটা সাহেবসুবোরা বলে, ওটা স্ট্যাটাস-সিম্বল তাই। ইউরোপ-আমেরিকায় সেটেল্ করার জন্যে 'স্পোকেন ইংলিশ'-এ রপ্ত হওয়া চাই। নইলে হিব্রু-জাপানিও চলত। বাংলা মানে 'হোপলেস'দের ভাষা, তা পড়েই বা কে, লেখে-ই বা কে! ট্যাগোর-সঙ দিয়ে সাহেব-সুবোদের মধ্যে যদি 'এলিট' হওয়া যায়, মন্দ কী! নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল যখন, বাংলা ভাষার মতো 'ফানি' ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলেও ট্যাগোর একেবারে যা-তা ছিল না বোধহয়! এই তো বাংলা ভাষার বর্তমান হাল-হকিকৎ, তার ভবিষ্যৎ অতীত নির্ধারিত হবে আত্মঘাতী বাতুলতার নিরিখে। আর, যাঁরা প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছেন ভাষার বহমান ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, গত তিন দশকে মহামারীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে-যাওয়া সমবেত আত্মহনন সম্পর্কেও তাঁদের ভাবতে হবে এখন। বাংলার প্রতি উপেক্ষা হয়ে-যাওয়া সমবেত আত্মহনন সম্পর্কেও তাঁদের ভাবতে হবে এখন। বাংলার প্রতি উপেক্ষা এবং ইংরেজি-কেন্দ্রিকতার প্রতি লোলুপতা মূলত সময়ের অসুখের অভিব্যক্তি। সর্বত্র ব্যাপ্ত প্রতাপের ফড়ে হওয়ার জন্যেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে সব নীতিবোধ ত্যাগ করে ক্যাবারে নর্তকীদের মতো নগ্ন হয়ে পড়েছে এই প্রজন্ম। স্পিলবার্গের ছবির শিশু ডায়নোসোরদের মতো পিল পিল করে অধিপরিসরের খোলা ভেঙে, শূন্য থেকে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে, বেরিয়ে আসছে কালচারাল বাসটার্ডেরা।

ফলে প্রশ্নটা আর বাংলা ভাষায় সীমিত নেই। প্রশ্নটা এখন নির্মানবায়ন নিয়ে। মাতৃভাষার বিপন্নতা তাই কুলশীলগোত্রহীন সময়ের বিপন্নতা। এ সময় সাংস্কৃতিক, এ সময় রাজনৈতিক। ভারতীয় উপমহাদেশে অতিদ্রুত থাবা বসিয়েছে যে বিশ্ব-আধিপত্যবাদের উলঙ্গ রাজার দল, তাদের কাছে ভাষা-চেতনা মূল্যবোধ কিছু ভাঙা কাঁচের টুকরো মাত্র। আর, তাদের পার্ষদেরা নিয়েছে ধূর্ত বিদূষকের ভূমিকা। যখন

ভাষা-নীতি-ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাবাদর্শ : সমস্তই আপেক্ষিকতার বুদ্বুদ এবং অধিপরিসরে প্রতীত ধারণামাত্র, সেই আধুনিকোত্তর প্রতিভাষার পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে মানবিক স্বভাবে দীপ্যমান থাকার জন্যে নতুন লড়াই শুরু করতে হচ্ছে। এ সময় যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের জিগির তোলে, তারা কুচক্রী। ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালিরা বাংলা ভাষায় জীবনস্পন্দন অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে ওই লড়াই শুরু করুক ওই কুচক্রীদের জমায়েতের বিরুদ্ধে। এছাড়া অন্য পথ নেই কোনো।

৪

বিশ শতকেও বাংলা ভাষার একটা লড়াই ছিল। বস্তুত ছিল উনিশ শতকেও। কিংবা, আঠারো ও অন্যান্য শতকে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এর স্বরূপ আলাদা। সমাজের বিয়োগ পরিস্থিতি যেমন বিপন্নতার স্রষ্টা, তেমনই নিষ্ক্রমণের তাগিদও সমাজের মধ্যে তৈরি হয়। ভাষা-প্রয়োগের ধরন বদলে যায় কখনও, নতুন উপকরণ যুক্ত হয় কখনও বা। সর্বদা এই রূপান্তর দৃশ্যগ্রাহ্য হয় না কেননা ভাষার ছায়াতপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সবচেয়ে বড় কথা, অর্থবোধ হওয়ার পদ্ধতিও বিনির্মিত হয় মূলত ভাষার সংযোগ সম্ভাবনাকে আরও শানিত ও প্রসারিত করার জন্যে। সংযোগ-ক্ষমতা শিথিল বা রহিত হওয়ার আশঙ্কাই তো ভাষার সবচেয়ে বড়ো বিপন্নতা। কখনো ভেতরে কখনো বাইরে আর কখনো একসঙ্গে ভেতরে ও বাইরে ওই বিপন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা তাই স্বতশ্চলভাবে ভাষায় শুরু হয়। বিশ শতকের ঔপনিবেশিক আধুনিকতা তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছাল, তারপর ক্রমশ দেখা গেল তার অবক্ষয়ী প্রবণতা। বাংলা ভাষার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ নন শুধু, আরও বেশ কয়েকজন বাচনিক স্রষ্টার অসামান্য দক্ষতা দেখতে পেলাম তখন। দেখলাম বৃত্তবন্দিত্ব আর অবসাদও।

এবার বিশ্বায়নের সূত্রে এসেছে নতুন প্রত্যাহ্বান, নতুন বিপন্নতা। একটু আগে যেমন লিখেছি, বাংলা ভাষাকে এদের মোকাবিলা করার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে নিজেরই মধ্যে। একটুখানি কি ঔচিত্যের স্বর এসে গেল? সম্ভবত ভাষাপ্রয়োগের নিরন্তর পুনর্বিন্যাসে অনিবার্য তার উপস্থিতি। মানববিশ্ব অভূতপূর্ব আক্রমণের মুখোমুখি বলেই ভাষা দিয়ে নির্মানবায়নের সন্ত্রাসকে প্রতিহত করতে হবে এখন। চতুর শত্রু তাই আমাদের নিরস্ত্র করতে চাইছে ভাষা-স্বভাবকে ধ্বংস করে দিয়ে। সর্বগ্রাসী বিয়োগপর্বের সাম্প্রতিক এই গোলকধাঁধায় নিক্ষিপ্ত হয়েও বলব , ভাষা অদাহ্য, অনির্বাণ। যখন পুরনো সব সংকেত ভোঁতা হয়ে যায়, ভাষা নিজেই নিজের কোরকগুলি মুকুলিত করে। একুশ শতকের অধিপরিসরে হয়তো তার আত্মখননের পদ্ধতি অভাবনীয় হতে পারে, এইমাত্র।

বিপন্নতার নতুন নতুন ধরন দেখা দিচ্ছে, দিক। মানুষের নির্যাসবাহী ভাষা পাল্লা দিক তার সঙ্গে, হয়ে উঠুক সেরা অস্ত্র, যা একই সঙ্গে লক্ষ্যসন্ধানী ও লক্ষ্যভেদী।

উপভাষা, লঘুসংস্কৃতি, অপর পরিসর

যে-ভাষা যত বেশি সমৃদ্ধ, উপভাষার ঐশ্বর্যে সে তত ধনী। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কোনও ভাষা যখন যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়, এলাকা ভেদে তাতে দেখা যায় বৈচিত্র্য। ধ্বনিগত ও রূপগত কিংবা পদান্বয় ও শব্দভাণ্ডারের ভিন্নতা যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় আপাত-গ্রাহ্য হয়ে ওঠে, আমরা উপভাষার আদল ফুটে উঠতে দেখি। মূল ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যুগপৎ সত্য। সামাজিক ইতিহাসের চাপে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কোনও বিশেষ অঞ্চলের আর্থরাজনৈতিক সমৃদ্ধি যখন অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের পেছনে ফেলে দেয়—অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে কেন্দ্র ও পরিধির সম্পর্ক। গঠনগত সামগ্রিকতা সত্ত্বেও সংস্কৃতির কেন্দ্রাভিগ প্রবণতা অনস্বীকার্য। আবার দ্বিবাচনিকতার নিয়মে বিকেন্দ্রায়ন প্রক্রিয়া দেখা দেয় প্রান্তিক অঞ্চলে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা ভাষার একই অঙ্গে এত রূপ এইজন্যে। রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের নৈসর্গিক বৈচিত্র্যই সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ভিন্নতার উৎস। ওই সব ঐতিহ্যগত এলাকাতেই নয় কেবল, জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় বাংলা ভাষার প্রায়োগিক ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় তার প্রায়-অনন্ত বৈচিত্র্যে। এদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষারূপ যে শিষ্ট বাংলা হিসেবে সর্বজনমান্য হয়ে উঠল, এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে সামাজিক প্রতাপের আনুকূল্য। রাজধানীর আশেপাশে কেন্দ্রাভিগ সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির পরিপোষক ভাষা যতখানি পরিশীলিত হয়, দূরবর্তী প্রান্তিক অঞ্চলে কখনও তা হওয়া সম্ভব নয়। স্থিতিস্থাপকতার বদলে ওই সব এলাকায় প্রকট হয়ে ওঠে অস্থিরতা ও পরিধি-সংলগ্ন বিচ্ছুরণ। আকরণ-আভিমুখ্যের পরিবর্তে আকরণোত্তর প্রবণতা কেন্দ্রীয় ভাষার শিষ্ট রূপটিকে বজায় রাখতে পারে না। উপভাষার বিশিষ্ট ধরন তাই প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নেয় এবং সেই স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক মান্যতা ও প্রতিষ্ঠা দেয়।

বাংলা ভাষায় পুরুলিয়া-বীরভূম-কোচবিহার অঞ্চলের উপভাষায় কেন্দ্রীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু প্রান্তিক অঞ্চলগুলির মৌখিক বাক্‌ব্যবহারে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট। অবশ্য মনে রাখতে হয় একথা যে, স্বাতন্ত্র্য অচল অনড় অপরিবর্তনীয় নয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ছিল স্তিমিত গতি ; আর্থসামাজিক পরিসরে আজকের মতো তীব্র জটিল অভিঘাতও দেখা যায়নি। ফলে উপভাষা অঞ্চলের ধীর স্থির আকরণেও কোনও বড় মাপের সমস্যা অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু গত তিন দশকে অভূতপূর্ব তথ্য-প্রযুক্তির বিস্ফোরণ বিশ্বায়নের মাদককে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিয়েছে। উপভাষা ব্যবহারকারীর চেতনাবিশ্ব ফলে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, স্বভাবত ভাষাবিশ্বও অটুট থাকেনি। আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের পূর্বাগত প্রেক্ষিত

কার্যত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। শিষ্টায়নের প্রবণতা আগেও ছিল উপভাষা অঞ্চলে ; ইদানীং তা অতিমাত্রায় প্রকট। আরও একটি কথা এইসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। শিষ্ট চলিত ভাষার কেন্দ্র অন্তত পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে পুরুলিয়া-বীরভূম-কোচবিহার থেকে খুব একটা লক্ষণীয় দূরত্বে নেই। কার্যকরী অপরতার বোধকে বিকৃতভাবে, রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে, উসকে দিয়ে ইদানীং যদিও উত্তরবঙ্গে 'কামতাপুরি' নাম নিয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক উপভাষার সম্পর্ক অস্বীকার করা হচ্ছে—ক্ষীণ বা অস্তিত্বহীন সংযোগের সংকট ওই অপর পরিসরে ছিল না কখনও। কিন্তু নোয়াখালি-চট্টগ্রাম-সিলেট এবং অবিভক্ত কাছাড় (সাম্প্রতিক অভিধা অনুযায়ী বরাক উপত্যকায়) বসবাসকারী প্রান্তিকায়িত বাঙালিদের জন্যে সংযোগের অভাব জনিত সংকট জ্বলন্ত বাস্তব। অপর পরিসরের উপলব্ধি এইসব অঞ্চলে তাই অর্জিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। উপগ্রহ-প্রযুক্তির সমুদ্রোচ্ছ্বাস এবং শিষ্টায়ন প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য এখনও বাস্তব ও অপরিহার্য সত্য।

২

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়েও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বরাক উপত্যকা ঔপনিবেশিক শক্তি ও আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদী বর্গের যৌথ কুটিল চক্রান্তে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন হয়েছি আমরা, ভারতবর্ষের বাকি অংশের সঙ্গে ; কিন্তু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সঙ্গে লড়াই আজও থামল না। আজও ছেদ ঘটল না আত্মঘাতী মূঢ়তার, আত্মবিস্মৃতির, নির্লজ্জ সমঝোতা ও তোষামোদ প্রবণতার। বরাকের সমাজে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে গেছে বিবেকহীন পশ্চাত্তাপশূন্য দালাল-মানসিকতার বিষ। এই নিবন্ধ যখন লিখছি, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় পড়লাম, আগামী লোকগণনায় আসামের বঙ্গভাষীরা যাতে নিজেদের অসমিয়া বলে পরিচয় দেন—সেই অনুরোধ জানিয়েছে বাঙালি মা-বাবার কয়েকটি কুলাঙ্গার সন্তান। পুরনো দিনে বলা যেত, এইসব উচ্ছিষ্টজীবী মানুষ নামধারী ইতর প্রাণীদের মুখে আঁতুড়ঘরে নুন দেওয়া হয়নি কেন? এরা এবং এদের মুষ্টিমেয় সাঙ্গপাঙ্গরা অসমিয়া কেন, জুলু-হটেনটট বলে নিজেদের প্রচারিত করুক। কিছু আসে যায় না। এইসব দুকান-কাটা লোকগুলো খবরের কাগজে ঠিক এখনই বিবৃতি দিচ্ছে কেন? সামনেই আসামে নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়বে বলে? নাকি, কারণ আরও গভীরে! হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের স্তবপ্রচারকেরা দিনে রাত্রে বেনো জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক মদতে। চ্যানেলে চ্যানেলে উগ্র কুৎসিত নীল বিষ প্রতীচ্যায়িত হিন্দিয়ানির সূত্রে না-পৃথিবীর হাতছানি আর উন্মত্ত ভোগবাদ দিয়ে বাঙালিত্ব ও মনুষ্যত্বের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে চাইছে। সৎ অসমিয়াদের জন্যেও একই বিপদ আজ। কিন্তু অসম সাহিত্য সভার পাণ্ডারা দেয়ালের লিখন পড়তে না পেরে একচক্ষু হরিণের মতো পুরনো হরতন-ইস্কাবন দিয়ে খেলতে চাইছেন। বঙালখেদা আন্দোলন থেকে বহিরাগত বিতাড়ন উৎসব দিয়ে এঁরা

আসামকে ক্রমাগত টুকরো করেছেন, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে আগুন জ্বালিয়েছেন। তবু এরা পণ করেছেন, অসমিয়াকরণ আর খিড়কি-দুয়ার দিয়ে নয়, সদর দরজা দিয়ে করবেন। এদের শিক্ষা হবে কি? এদের জন্যে সময়ের কোনও ভাষা নেই, নতুন পাঠ নেই কোনও।

আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হওয়ায় এবং উনিশে মে নতুন মর্যাদায় পালিত হওয়ার সম্ভাবনায় অন্ধকারের হায়েনা শেয়ালেরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার ওপর, চিরঘুমন্ত বাঙালি নবজাগরণ-এর উদাত্ত আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গে নিদালির ঘোর কাটিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বাংলা ভাষা কেবল হিন্দুর নয়, কেবল মুসলমানের নয়। হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির মিথ্যা পরিচয়ের গোলকধাঁধার বিরুদ্ধে একুশ শতকের উদয়-মুহূর্তে নতুন চেতনার বিচ্ছুরণ শুরু হয়েছে—এই সত্য অনুভব করে টনক নড়েছে বিবরবাসীদের। ভাড়াটে কলমচিরা তক্কে-তক্কে ছিল, নবজাগরণের তাৎপর্য নিয়ে উপভাষা অঞ্চলের প্রান্তিক বাঙালিরা ঠিক কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে, এ নিয়ে তাদের একটি শব্দও খরচ করতে দেখিনি। কিন্তু খেঁকশেয়ালেরা রাজকীয় জোব্বা পরে নেওয়ার জন্যে হুক্কা-হুয়া শুরু করা মাত্র ওই কলমচিরা একটুও দেরি না করে বারো হাত কাঁকুরের তেরো হাত বীচি নিয়ে বিজ্ঞজনোচিত ভাষ্য লিখতে শুরু করেছে। যে-বিষয় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, তা মনোযোগের অযোগ্য, তড়িঘড়ি তার টীকা-ভাষ্য করার অর্থ কি ঘোলাজলে মাছ শিকারের জন্যে কাউকে কাউকে উসকে দেওয়া? এতে নিজেদের অবস্থান হাস্যকর হয়ে গেলেও কিংবা নিজেদের মুখ পুড়ে গেলেও কিছু যায় আসে না—এই কি মনোগত অভিপ্রায়?

তাহলে পঁচিশে বৈশাখের সকালেই ভাষিক সম্প্রসারণবাদী ও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদীরা শিলচরে গান্ধীবাগের চত্বর দখল করতে থাকুক। আমাদের বুকে বসে আমাদেরই দাড়ি উপড়াতে থাকুক উদ্ধত প্রতাপে, আগ্রাসনবাদীরা আমাদের শিলনোড়া দিয়ে আমদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙতে থাকুক। শিলচর সহ বরাক উপত্যকার সমস্ত জনপদে দিনরাত বাজতে থাকুক চটুল বিহুগীতি ও জৈব প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি-দেওয়া হিন্দি ভাষার কোলাহল। পিঠ পুড়ে পুড়ে অস্থিমজ্জায় আগুন ধরে গেলেও ফিরে শোয়ার কথকতা চালিয়ে যাই আমরা। উনিশে মে ফিরে যাক ব্যর্থ নমস্কারে। আমরা তো সিলেটিতে কথা বলি, শিষ্ট বাংলায় বলি না। বাংলার আর কোনও উপভাষা অঞ্চলে অন্তত এটা দেখব না, বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে শিষ্ট চলিত ব্যবহার করলে আড়াল থেকে কেউ বিদ্রূপ করছে। 'দেশি কুকুর বিলিতি কুকুরের বুলি আওড়াচ্ছে' বলে মূর্খতম উপহাসে একে অপরের শরিক হচ্ছে। পুরুলিয়া-বীরভূম-কোচবিহার-বাঁকুড়া-বগুড়া- চট্টগ্রামে কখনও এই অভিজ্ঞতা হবে না যে, আনুষ্ঠানিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে কেউ প্রকাশ্যে নিজের উপভাষায় ভাষণ দিচ্ছে। উপভাষার নিজস্ব কিছু বাগ্‌বিধি, স্বরন্যাস কিংবা উচ্চারণভঙ্গি থাকতে পারে—এইমাত্র। অন্যত্র এটা কল্পনারও অগোচর যে, নিজেরই ভাষার শিষ্টরূপে সড়গড় হওয়ার জন্যে কেউ

সচেতন চেষ্টা করবে না। কিন্তু বরাক উপত্যকার পাঠশালাগুলিতে বাংলা বর্ণমালাও উপভাষার স্পর্শদোষ এড়াতে পারছে না।

ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ধাপে-ধাপে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তাদের মগজে ও অভ্যাসে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে এই সংস্কার যে বাংলা যেমন খুশি ব্যবহারযোগ্য। কেননা প্রতিটি স্তরে প্রতিটি বিষয়ে টেক্সট বইগুলিতে বাংলা ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে পরিকল্পনা মাফিক বিকৃত করা হচ্ছে। অথচ পাঠ দান একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয় ; এতে প্রচুর সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতির স্তরও রয়েছে। সেসব বিঘ্নিত হয় যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্বিচারে সর্বত্র কেবল ধ্বস্ত মর্দিত বাংলাকে বা উপভাষাকেই প্রকাশ-মাধ্যম করে তোলেন। শিষ্ট চলিত ফলে হয়ে উঠেছে আবশ্যিক অথচ কম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকল্প মাত্র।

এই ছাত্রছাত্রীরা, এমন কি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও, যখন জীবনের প্রয়োজনে বৃহত্তর বাঙালি পরিমণ্ডলে যান—দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য কেউ হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এ কি আমরা ভাবতে পারি যে, উত্তরবঙ্গ (শিলিগুড়ি) কিংবা বর্ধমান বা বিশ্বভারতী বা বিদ্যাসাগর (মেদিনীপুর) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠকক্ষে ঢোকার আগে এটা বলে দিচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের, 'তোমরা বাপু আমাদের সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে অন্তত উপভাষা ব্যবহার করো না। দ্যাখো, তোমরা বাংলা পড়তে এসেছ এবং আমরাও বাংলা পড়াতে এসেছি। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে কিংবা তার বাইরেও, মত বিনিময়ের জন্যে শিষ্ট চলিত শুদ্ধভাবে ব্যবহার করতে শেখো'! এ এক উদ্ভট পরিস্থিতি শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিনা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। বাংলা ভাষাকে চেতনার প্রতিটি কোষে-কোষে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং সর্বত্রব্যাপ্ত আক্রমণের চক্রান্তকে প্রতিহত করতে চাই, তাহলে পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝতেই হবে। সিলেটি উপভাষা থাকুক আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে। উনিশে মে-একুশে জুলাই-সতেরো আগস্টের রক্ত-রাঙা পথ তো সিলেটি উপভাষার জন্যে তৈরি হয়নি, বাংলা ভাষার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যে হয়েছিল। আমরা যেন মর্যাদার তাৎপর্য ও প্রায়োগিক দিকটা তলিয়ে ভাবি। নইলে আমরাই দায়ি হব দুঃখিনী বর্ণমালার অষ্টাবক্র দশার জন্যে।

৩

বরাক উপত্যকায় খবরের কাগজগুলিতে বাংলা ব্যবহারের নামে যথেচ্ছাচার চলছে। সংবাদপত্রে কাজ শুরু করার আগে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা না থাকায় দু-তিনটে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে সাংবাদিকদের কারও কোনও মাথাব্যথা থাকে না। বাক্য তৈরিতে কোনও মাথা-মুণ্ডু নেই ; অসমিয়া কিংবা হিন্দি কিংবা সিলেটি শব্দ বা বাগ্‌বিধি ইচ্ছেমতো ব্যবহৃত হচ্ছে। বানানের কথা তো না বলাই ভালো। কয়েক দিন যেতে না যেতেই এরা নিজেদের এত কেউকেটা বলে ভাবতে শুরু করে যে ঔদ্ধত্য হয়ে যায় মাত্রাছাড়া। পেশাগত উৎকর্ষের জন্যেও

যে ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পুনঃশিক্ষিত হতে হয়—প্রতাপের ছায়ায় লালিত হয়ে এঁরা এই সত্য ভুলে যান। শেষ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণে এঁরা বাংলা ভাষাকেও নিজেদের সেবাদাসী বলে ভাবতে শুরু করেন। মুশকিল হচ্ছে, রোজ এদের কলম-নিঃসৃত বাক্যরাশি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। জনসাধারণের ভাষারুচিকে এরা দলিত, মথিত ও বিকৃত করে দিচ্ছে। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। আর বললেই বা শুনবে কে? এই যে বিচিত্র পরিস্থিতি, তা-ও প্রান্তিক অঞ্চলের উপভাষায় আনখশির প্রোথিত থাকার ফলেই উদ্ভূত হচ্ছে। আলোর চেয়ে ছায়ার রমরমা যেখানে, স্বভাব সেখানে আচ্ছন্ন হয় সহজে : জাতীয় স্বভাব, ভাষার স্বভাব, অনুভূতির স্বভাব—সর্বত্র সুস্থতার চেয়ে বিকার বড় হয়ে ওঠে। চিন্তা ও উপলব্ধিতে কেন্দ্র নেই কোনও, আছে কেবল লাগাম-ছাড়া বয়ে যাওয়া। আছে 'ঠেকার কাজ' কুলিয়ে দেওয়া। উপভাষার শৌর্য ও সৌন্দর্য, প্রাকৃতায়নের স্পন্দন যেখানে বাচনে অভূতপূর্ব গভীরতা যোগ করতে পারত, সেখানে তার বদলে দেখা যায় উপ-সংস্কৃতির লঘুতা ও হীনমন্যতা। দুঃখিনী বর্ণমালার অষ্টাবক্র দশা তাই অবধারিত।

অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের বিষক্রিয়ার অভিব্যক্তিগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'বৈশিষ্ট্য' বলে বন্দিত ও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে এইসব অভিব্যক্তির দ্বিবাচনিক সম্পর্ক বিচার না করে যখন তাদের মান্যতা দেওয়া হয়, বুঝতে হবে এ কেবল জাতে ওঠার মেড ইজি বা সহজ পাঠ মাত্র। যা আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করিনি, তা প্রসাধনের বিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। আমাদের এই অনাগরিক উপভাষা-অঞ্চলে প্রাকৃতায়ন, ঐতিহ্যমনস্কতা, আদিকল্প থেকে আহৃত চেতনা, ধীরস্থির নিসর্গসাপেক্ষ চিহ্নায়ন প্রকরণের গ্রন্থনা কেবলমাত্র সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির লক্ষণমাত্র নয় ; এ আমাদের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট ধরন। যেসব অপরিহার্য কারণে এবং কেন্দ্রীকৃত প্রতিবেদনের আধিপত্যবাদী তাড়নায় শিষ্ট চলিতভাষী এলাকায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতাবাদের আদল ক্রমশ আদর্শায়িত হয়েছিল, উপভাষাভাষী বরাক উপত্যকার বাঙালিদের জন্যে সেসব কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিক ছিল না। তবু বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরে নিজেদের ব্রাত্য লঘুসংস্কৃতি কিংবা উপসংস্কৃতির অনুসারী বলে ভেবেছি বলে আমরা জন্মসূত্রে অর্জিত এবং অভিজ্ঞতায় ও উপলব্ধিতে পুনঃস্বীকৃত অভিজ্ঞানকে পশ্চাৎপরতার দৃষ্টান্ত মনে করে মরমে মরে রইলাম। নিজেদের বিকল্প জীবনবীক্ষার নিবিড়তা, লাবণ্য ও গৌরবের তাৎপর্য আবিষ্কার করার বদলে বহু হাত-ফেরতা আধুনিকতাবাদের উদ্ভট রঙ মেখে নিলাম। গাজনের হরগৌরীর মতো নয়, সাকার্সের ক্লাউনের মতো। অথচ উত্তর আধুনিকতার ফসল গোলায় তোলার মতো ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত, শ্রাবণের মেঘ নিয়ে আকাশ ছিল উন্মুখ, উপভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য লোকায়ত ঐতিহ্যের বীজতলি ছিল আগ্রহী কৃষকের অপেক্ষায়। আমাদের কবিতায় ও ছোটগল্পে মাঝে মাঝে তার ঝিলিক দেখা গেল শুধু। কিন্তু অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ আমাদের শেখাল আত্ম-অবমাননা, স্বভূমির প্রতি উপেক্ষা, মিথ্যা কেন্দ্রীকরণের প্রতি মোহ। আর, হাল আমলে আধুনিকোত্তর প্রতিজগৎ ও প্রতিচেতনার

আলেয়া-উচ্ছ্বাসে নিজেদের বিশ্বায়িত করার জন্যে হঠাৎ উৎকট আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছি আমরা।

উত্তর-আধুনিকতার বীজতলিকে খুঁজতে হয় না, উপভাষার সহগামী লঘুসংস্কৃতির মধ্যে তা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত। কেন্দ্রীয় এলাকার তুলনায় আমাদের অপর পরিসর বিকেন্দ্রায়নের শতজল ঝরনায় উচ্ছ্বসিত হতে পারে। অথচ আজ কোনো ভগীরথ সেই ঝর্নার ধ্বনিকে জটাজাল ভেদ করে আমাদের উৎসুক ইন্দ্রিয়ের কাছে নিয়ে এল না। আমাদের আপাত-বিচ্ছিন্নতা মূল সংস্কৃতির সমস্ত বেগবান ধারাকে সমান মাপে প্রাসঙ্গিক করে তোলেনি। দ্বীপবাসী যেভাবে ঊর্মিমালার দিকে তাকায়, আমরাও সেভাবে সময়ের ক্রূর উদাসীন উচ্ছ্বাসের পানে তাকিয়েছি। আমাদের ওই তাকানোয় অভ্যাস ছিল, দেখার আশ্চর্য ছিল না। চিরকাল যারা স্রোতের উপান্তে থাকে কিংবা নিবদ্ধ থাকে বেলাভূমিতে, সমগ্র বহমানতা সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা তৈরি হয় না। অথবা সমগ্রের পরিধিতে আদৌ কোনও অবস্থান উপ-সংস্কৃতির দ্যোতনাসম্পন্ন প্রত্যাখ্যাত ও দূরীকৃত অপর পরিসরের পক্ষে সম্ভব কিনা—এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়েও মাথা ঘামায় না কেউ।

বীরভূম বা মালদহের আঞ্চলিক উপভাষায় যেসব বাঙালিরা কথা বলেন, তাঁদের কিন্তু বাঙালিত্ব প্রমাণ করতে হয় না। চট্টগ্রাম-নোয়াখালির উপভাষার প্রকট স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও জাতিসত্তা নিয়ে অনাবশ্যক জটিলতা দেখা যায় না। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির সাংস্কৃতিক রাজনীতির শিকার হওয়ার ফলে বারবার সিলেটি উপভাষী মানুষের উপর নেমে এসেছে বানিয়ে-তোলা অস্তিত্বের সংকট। বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসন দিয়ে আসামের সঙ্গে সিলেটকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আসামের আধিপত্যবাদীরা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লুব্ধতা ছাড়তে পারেনি, কিন্তু মেধার উৎকর্ষ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেও মেনে নিতে চায়নি। সিলেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবিভক্ত কাছাড়ও একই কারণে আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদীদের কাছে চক্ষুশূল। বাংলার সংস্কৃতিবিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এই অঞ্চলের মানুষজন যাতে শক্ত মেরুদণ্ড নিয়ে মর্যাদা দাবি করতে না পারে, এজন্যে ধূর্ত চক্রান্তের জাল বিছানো হয়েছে সর্বত্র। এর সর্বশেষ উৎকট নিদর্শন হল, কিছু বেতনভুক উচ্ছিষ্টজীবী দালালদের দিয়ে বাঙালিদের উদ্দেশ্য আহ্বান জানানো—তারা যেন আগামী লোকগণনায় অসমিয়াকে নিজেদের মাতৃভাষা বলে ঘোষণা করে।

গোটা আসাম জুড়ে বাঙালিরা প্রধানত কোনও না কোনও উপভাষায় কথা বলেন। এতে মূর্খদের পোয়াবারো, কারণ, অসমিয়ার অপভ্রংশ বলে সমস্ত অপর পরিসর এবং তাদের স্থানিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করার অজুহাত বানানো যায়। সমস্ত বাংলা মাধ্যমের স্কুলকে কবেই মুছে ফেলা হয়েছে ; নয়া অসমিয়া নামক কাঁঠালের আমসত্ত্বও তৈরি করা হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি থেকে বহুদূরে থাকার ফলে এবং সাম্প্রতিক গৈরিকীকরণের পর্যায়ে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পরিণতিতে দূরবর্তী অপরেরা নিজেদের গোত্রপরিচয় ভুলে যেতে বসেছে। বিনিময়ে পাচ্ছে

ভিটেমাটি থেকে উৎখাত না হওয়ার আশ্বাস এবং ভুক্তাবশিষ্ট এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে নেওয়ার চমৎকার স্বাধীনতা।

৪

এইজন্যে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূবনেও আসামের পলায়নবাদী ভীরু বঙ্গভাষীরা নিজেদের জন্যে কোনও পরিসর তৈরি করতে পারেনি। আসল কথা, তৈরি করতেও চায় নি। এখানেই বরাক উপত্যকার উপভাষাভাষী বাঙালিদের অভিজ্ঞান ও দুর্বলতা যুগপৎ স্পষ্ট। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে মনে, আমরা কি একই সঙ্গে মাতৃভাষার বাইরে ও ভেতরে? কিন্তু কেন এই বিচিত্র সসেমিরা অবস্থান? তবে কি সর্ষের মধ্যেই কোথাও ভূত রয়ে গেছে? বিশেষত গত দুই দশকের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলার বদলে আমরা ঘরে ঘরে জতুগৃহ গড়ে তুলেছি। এই দুই দশকে মায়েরা বাবারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের কিম্ভূত-কিমাকার 'শুদ্ধ' বাংলা শেখাচ্ছেন। এতে ভঙ্গিটা শুধু শিষ্ট বাংলার কিন্তু উচ্চারণপ্রণালী ও স্বরন্যাসে স্পষ্টতই উপভাষার ধরন। এমন কি বাক্যগঠনেও উপভাষার ছাপ। এতে তৈরি হচ্ছে কেবল হাঁসজারু ও বকচ্ছপ বাংলা ভাষা।

গত চার দশকের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সেইসব ছেলে-মেয়েরাই বিকট বাংলা বলে থাকে যারা তাদের বাড়িতে 'শুদ্ধ' ভাষা বলার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছে। এরা মনে মনে উপভাষাকে তাচ্ছিল্য করতে শেখে অথচ বিশিষ্ট বাংলার মূলস্রোতে স্বচ্ছন্দভাবে যোগও দিতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে উপভাষায় ও শিষ্ট বাংলায় দক্ষ হতে চাই শুধু সতর্কতা ও সংবেদনশীলতা। এরাই যখন গল্প লেখে, কবিতা লেখে, প্রবন্ধ লেখে, নাটক লেখে কিংবা বাচন-নির্ভর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়—তাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব পদে পদে শিল্পরস ও সৃষ্টির লাবণ্যকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। কারণ ভাষা যখন নানা ধরনের প্রকাশমাধ্যমের আকর, সূক্ষ্মতা ও গভীরতা সেইসব অশিক্ষিত-পটু জনদের জন্যে পুরোপুরি দুষ্প্রবেশ্য হয়ে যায়। এরই অনিবার্য পরিণতিতে নিজেদের স্থানিক উপসংস্কৃতির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য এবং অপর পরিসরের শৌর্য ও লাবণ্যময় সম্ভাবনা পুরোপুরি অনধিগম্য হয়ে যায়। এরই সূত্র ধরে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণের তাড়নায় কূপমণ্ডূকতাই হয়ে ওঠে সর্বজনীন প্রতিরক্ষা ব্যূহ। একদিকে ছিঁড়ে যায় আমাদের শেকড়, অন্য দিকে মুছে যায় আকাশ। না পারি উপভাষার সহজ লাবণ্য ও খর চলিষ্ণুতার সূত্রে উপসংস্কৃতি ও অপর পরিসরের তাৎপর্য অনুধাবন করতে, না পারি নিজেদের বৃহত্তর চারণভূমিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যে উপযুক্ত করে তুলতে। বঙ্গীয় পরিমণ্ডলের সবচেয়ে প্রান্তিক অঞ্চলের উপভাষাভাষী হিসেবে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে দীর্ঘ ও কঠোর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয় তাৎপর্য। পদে পদে তাতে স্খলিত হওয়ার আশঙ্কা ; কিন্তু সব ধরনের ভ্রষ্টতার হাতছানি এড়িয়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারি সম্ভাবনার স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে। এভাবেই তো পৌঁছেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সৈয়দ মুজতবা আলি ও ভূদেব চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস, অপূর্ব চন্দ ও অমিতাভ চৌধুরী, অশোকবিজয় রাহা ও

জগদীশ ভট্টাচার্য এবং এরকম আরও কেউ কেউ। তা হলে কোন অকারণ হীনমন্যতা ও আত্মপ্রতারণার মোহে নিজেদের আকাশকে সঙ্কুচিত করে আমরা বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সাহিত্যকর্ম ও সংস্কৃতিপ্রক্রিয়ার জন্যে ছোট মাপের মানদণ্ড তৈরি করি?

৫

বহু বছর আগে 'সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলিনী'র সভাপতির অভিভাষণ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) দিতে গিয়ে ভুবনমোহন দেবশর্মা যেসব কথা বলেছিলেন, সেই প্রতিবেদন পুনঃপাঠ করতে হবে আজ। সেই অভিভাষণের কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি : 'আমরা বাঙালি। বঙ্গভাষা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। আমাদের দেহে-দেহে বাঙালির রক্ত প্রবাহিত। আমাদের মস্তিষ্কে-মস্তিষ্কে বাঙালির চিন্তাস্রোত। বঙ্গ-ভারতি! তোমার বিজয়শঙ্খ পতিত সমাজের পাপ-তাপ দূর করুক।...মগধ, মিথিলা, শ্রীহট্ট ও উড়িষ্যায় একদা বাগ্‌বীণার একটি মাত্র তার বাজিত। কিরূপে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, আমাদের সুরমা উপত্যকার কথ্যভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।...সাহিত্যের সমগ্র শক্তি একমাত্র উহার কেন্দ্রস্থলে আবদ্ধ থাকিলে দেশের সর্বত্র সত্বর উহার অভ্যুত্থান ঘটিবে না ; আমাদের বিরাট জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। আগে ভাষা, পশ্চাৎ সাহিত্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য লইয়া কিছু দিন পূর্বে একটা সন্দেহবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। কোনো কোনো পাশ্চাত্য লেখকের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইয়াছিল—শ্রীহট্টের বাগব্যবহার বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র এবং শ্রীহট্টের নিজের কোনো 'সাহিত্য' নাই!...বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সমাজের কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বাংশে একরূপ নহে।...প্রত্যেক জেলার উচ্চশ্রেণী বা শিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষা বঙ্গের আদর্শ ভাষার অনুরূপ ; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষা জেলায় জেলায় কিয়ৎ পরিমাণ বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত; শব্দ-প্রয়োগ অপেক্ষা উচ্চারণগত বৈচিত্র্যই অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। অশিক্ষিত লোকের কথ্যভাষা হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া পূর্বকথিত পাশ্চাত্য মনীষীগণের অবলম্বিত প্রণালীতে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলে বলিতে পারা যায়, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এমন কি, জেলার বিভিন্ন অংশে ভাষার বিভিন্ন আদর্শ প্রচলিত।...বিভিন্ন জেলার নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহারা মূলত অভিন্ন এবং অখণ্ড বঙ্গভূমির সাহিত্যিক ভাষার একই গতিপথ চিরকাল নিয়মিত রহিয়াছে।..ভাষা ও সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।...এই সম্বন্ধটুকু ছিন্নভিন্ন হইতে কেহই সম্মতি দিতে পারেন না। অখণ্ড বঙ্গভাষা শতখণ্ডে বিভক্তা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্প্রসার খর্ব্বীকৃত হইবে এবং সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমদের সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালা। উহার ঢাকাই-রঙ্গপুরী শ্রীহট্ট-যশোহরী সংস্করণ নাই। সাহিত্য হইতে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা সরাইয়া ফেলিয়া অখণ্ড বঙ্গভাষার উপাসনা করাই বঙ্গসাহিত্য সেবকের ধ্রুব লক্ষ্য। বঙ্গভাষার উপাসনায় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পাশ্চাত্য মন্ত্রটি স্মরণ রাখিতে

হইবে There is neither Greek nor Jew but Christ is all অর্থাৎ খ্রিস্টভক্তের গ্রীক বা য়ীহুদী নাই সব খ্রিস্টান। বঙ্গভাষারও শ্রীহট্টনদীয়া নাই, অখণ্ড বঙ্গভূমি জুড়িয়া সব বাঙ্গালা'।

ভাবতে অবাক লাগে, ৯৩ বছর আগে এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল। ভুবনমোহনের অভিভাষণ আজকের আত্মবিস্মৃত বরাকবাসী বাঙালি বারবার পুনঃপাঠ করুন। বিশেষত নিম্নরেখাঙ্কিত বাক্যগুলি মন্ত্রের মতো পুনরুচ্চারণ করুন। তাহলে এই সত্য স্পষ্ট হবে যে, ভুবনমোহনের সময়ে যেমন 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য লইয়া'...সন্দেহবাত্যা বয়ে গিয়েছিল, সেই 'সন্দেহবাত্যা' সাংস্কৃতিক রাজনীতির আয়ুধ হিসেবে কয়েক বছর পরপর ব্যবহৃত হচ্ছে। অবিভক্ত কাছাড়কে অসমিয়াভূত গোয়ালপাড়া বানানোর চক্রান্ত, ৬০ সালের বঙ্গালখেদা, ৭২ এবং ৮৬ সালে আঞ্চলিক উপনিবেশবাদীদের চোঁয়া ঢেঁকুর, ৭৮-৭৯ থেকে ৮৫-৮৬ পর্যন্ত বহিরাগত তাড়ানোর উগ্রতা এবং সম্প্রতি আসামবাসী বাঙালিকে অসমিয়া করে নেওয়ার উদ্ভট পরিকল্পনা—সমস্ত ক্ষেত্রে ভুবনমোহনের 'সন্দেহবাত্যা' কখনও ঘূর্ণিবায়ু, কখনও দাবানল, কখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়ে দেখা দিয়েছে। ভুবনমোহনকে সাংস্কৃতিক রাজনীতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল ৯৩ বছর আগে, আমাদেরও করতে হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে পাঠ্যপুস্তক এবং খবরের কাগজের ভাষায় বিদূষণ ঘটানোর দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 'সাহিত্য'-এর সম্পাদক কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। এই বিদূষণ এখন আরও কালান্তক মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। এর মোকাবিলা করতে হবে সুদৃঢ় ভাবাদর্শগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। ভুবনমোহনের প্রবন্ধ আমাদের আয়ুধ হোক। বিশেষত নিম্নরেখাঙ্কিত অংশ হোক আমাদের জপমন্ত্র। বরাক উপত্যকার উপভাষাভাষী কবি-লিখিয়েরা 'জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র সাহিত্যভাণ্ডার' এর মূর্খ ধারণাকে ভুবনমোহনের মতোই প্রত্যাখ্যান করুন। বিহারের সিংভূম অঞ্চলে কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলের জীবনযাপন ও বাগ্‌বৈভব ব্যবহার করেন বলে কি গল্পকার অনিল ঘড়াই, স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে অথবা বাঁকুড়া-বীরভূমের ছাপ আছে বলে কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র-সৈকত রক্ষিত এবং কবি নির্মল হালদারকে অথবা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনের রূপকার অভিজিৎ সেনকে আমরা নিছক 'স্থানীয়' লেখক বলি? বাস্তব অলঙ্ঘ্য, উপভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সেই বাস্তবের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা ও ইশারা খচিত হয়ে থকে। সমস্ত কিছুকে আত্তীকৃত করেই গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার সাহিত্য-ভুবন।

আজ কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী-শঙ্করজ্যোতি দেব-বিজয়কুমার ভট্টাচার্য-স্বর্ণালী বিশ্বাস কিংবা গল্পকার শেখর দাশ-মিথিলেশ ভট্টাচার্য-বদরুজ্জামান চৌধুরী-সুব্রতকুমার রায়-রণবীর পুরকায়স্থ কিংবা প্রাবন্ধিক সুজিৎ চৌধুরী কি নিছক বরাকের লেখক হিসেবে পরিচিত? দেবীপ্রসাদ সিংহ গৌহাটিতে, দুলাল ঘোষ আগরতলায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় কলকাতার মফঃস্বলে, দেবেশ রায় কলকাতায়, সেলিনা হোসেন ঢাকায়, হাসান আজিজুল হক রাজশাহীতে, উদয়ন ঘোষ আসানসোলে, কমল চক্রবর্তী

জামশেদপুরে, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় নৈহাটিতে লিখছেন—এসব তথ্য উৎসুক জনেরা জানতে চাইবেন হয়তো। কিন্তু প্রশ্নাতীত সত্য হল, এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ভাষার লেখক। নিশ্চয় 'ভাষা ও সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার...দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ...ছিন্নভিন্ন হইতে কেহই সম্মতি দিতে পারে না।' এবং প্রত্যেকে 'অখণ্ড বঙ্গভাষার উপাসনা' করে চলেছেন যেহেতু 'উহার ঢাকাই-রঙ্গপুরী, শ্রীহট্ট-যশোহরী সংস্করণ নাই'। তাই রণজিৎ দাশ-জয় গোস্বামী-রাহুল পুরকায়স্থদের কবিতা কামরুজ্জামান কামু-মাসুদ খান-খোন্দকার আশরাফ হোসেনদের কবিতার পাশাপাশি যখন পড়ি, এঁদের উপভাষাগত অভিজ্ঞান বা জেলাগত অবস্থান নিয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করি না। কারণ, 'অখণ্ড বঙ্গভূমি জুড়িয়া সব বাঙ্গালা'।

তবু কেন বরাকের বাঙালিদের আজও সীমাহীন মূর্খতা ও নষ্টামির বিরুদ্ধে লড়তে হয় অবিভাজ্য বাঙালি সত্তার শরিক হিসেবে নিজেদের তর্কাতীত অবস্থান প্রমাণের জন্যে? ইতিহাসের এ এক নিষ্ঠুর কৌতুক। আমাদের জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। একদিকে হিন্দি-হিন্দুত্ব-হিন্দুস্থানের তত্ত্ব, অন্যদিকে ঐশ্লামিক মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান নিরেট চাপ। আবার একদিকে অসমিয়াকরণের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার ও ধূর্ততা এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদী চক্রের ইঙ্গিতে সিলেটি জাতীয়তাবাদের সুড়সুড়ি। সম্প্রতি লন্ডনে ছাপা একটি বই নজরে পড়ল, যেখানে বাংলাদেশে শোষিত ও প্রান্তিকায়িত সিলেটিদের বাঙালি পরিচয় থেকে সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। প্রবাসী সিলেটিরা এই বার্তা ক্রমশ ছড়িয়ে দিচ্ছেন বৃহত্তর শিলচরের নানা এলাকায়। এখনও অবশ্য এই বক্তব্যে খুব একটা ডালপালা গজায়নি। কিন্তু ঘরপোড়া মানুষেরা সিঁদুরে মেঘের লক্ষণ দেখলে শঙ্কিত তো হবেই। মোদ্দা কথা হল, ভুবনমোহনের সময়ের মতো এখন 'জাতীয়তার বন্ধন শ্লথ করিয়া অবশেষে গৃহে-গৃহে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বীজ ছড়াইয়া' দেওয়ার আয়োজন অব্যাহত। কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিকর্মীরা উপভাষা, লঘুসংস্কৃতি ও অপর পরিসরের ইতিবাচক সম্ভাবনার দিক কর্ষণ করুন। কিন্তু সেইসঙ্গে অনুমোদনযোগ্য লক্ষ্মণরেখার শাসনও অনুধাবন করুন। নইলে নেতি ও উৎকেন্দ্রিকতা তাঁদের সমস্ত সৃষ্টিমূলক উদ্যমে বরফজল ঢেলে দিতে পারে।

বিশেষত নাট্যকর্মীরা যেন ওই লক্ষ্মণরেখার মর্ম বুঝতে পারেন। প্রাকৃতায়ন ও ঐতিহ্যমনস্কতা নিশ্চয় অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের পঙ্কশয্যা থেকে তাঁদের উত্তরণ ঘটাবে। আর, উত্তর আধুনিক চেতনার মর্মকোষ থেকে তাঁরা দ্রাক্ষামোচনও করবেন। কিন্তু উপভাষা ও তার সহগামী লঘু সংস্কৃতির অবশ্যমান্য সীমান্ত তাঁদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ুক আগে। শিষ্ট ভাষা যেসব ধূসর ও ধুপছায়া অঞ্চলের দ্যোতনা পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না, উপভাষা তার সঙ্গে সেতু বন্ধন করুক। অপর পরিসরের অকর্ষিত ও অনাবিষ্কৃত ভূমিতে বীজাধান করুক উপভাষা-বাহিত লঘু সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলি। কিন্তু সেসব থাকুক অন্তর্বয়ন হিসেবে, কদাচিৎ অন্তর্বয়ন মূল প্রতিবেদন হতেও পারে বটে, কিন্তু তা সর্বজনীন ও সর্বত্রগ্রাহ্য হতে পারে না। উপভাষা অঞ্চলে যাঁরা সৃষ্টির

উদ্যান রচনা করেন, সামঞ্জস্যবোধ তাঁদের সবচেয়ে সেরা অবলম্বন। সবুজ ঘাস ও গুল্মলতা অলঙ্করণ হিসেবে সুন্দর নিশ্চয়, কিন্তু তার বৃদ্ধিও মাত্রাতিরিক্ত নয়। মাত্রার বাইরে গেলে তা উদ্যানের পুষ্পাসারকে আচ্ছন্ন করে, তখন তাকে বলি আগাছা। তেমনি উপভাষা-বাহিত লঘু সংস্কৃতির চেতনা আমাদের অপর পরিসরকে সৃষ্টির তাৎপর্যে মণ্ডিত করুক। একদেশদর্শী ভাবে আমরা যেন মূল ভাষাবিশ্বের প্রতিবন্ধক না হই।

এমন যদি হয়, বীরভূমের সাহিত্য কিংবা চট্টগ্রামের সাহিত্য হয়তো বগুড়ার সাহিত্য কিংবা কাছাড়-সিলেটের সাহিত্যের সঙ্গে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবে। প্রকাশ্যে অথবা প্রচ্ছন্নভাবে। বিশ্বায়নের দাপটে আমাদের আকাশ ঝাপসা, মাটি টলোমলো। এ সময় সামূহিক বাচন পুনরুদ্ধারের, পুনরাবিষ্কারের। সাংস্কৃতিক রাজনীতির মোড়লেরা নানা অজুহাতে ছদ্মসন্দর্ভের বিভ্রম তৈরি করে চলেছে। বিভ্রম থেকে উৎপাদিত হচ্ছে অলীক ব্যবধানের অবভাস। বাংলা ভাষার পতাকাতলে সমবেত হওয়ার এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ। এ সময়ের বার্তা অন্তহীন দ্বিরালাপেরও। অতএব উপভাষার সঙ্গে ভাষার, একক বাচনের সঙ্গে সামূহিক বাচনের নতুন নতুন দ্বিরালাপের ক্ষেত্র আমরা যেন আবিষ্কার করতে থাকি। যে যেখানে আছি সেখানকার আলো-হাওয়া-রোদের চাহিদা অনুযায়ী। মূর্খ শয়তানের দল আমাদের সমবেত নবজাগরণে পরাভূত হবেই হবে। আমাদের আছে উনিশে মে, আমাদের আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আছে একুশে জুলাই, আছে সতেরোই আগস্ট।

আমাদের গন্তব্যও এক। খণ্ডিত অস্তিত্ব থেকে পূর্ণ অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের যাত্রা। উপভাষা আমাদের শৌর্য ও লাবণ্য, আমাদের লজ্জা ও দুর্বলতা নয়। শুধু চাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মাত্রাবোধ। ভুবনমোহনের কথা মনে রেখে বলব, 'বঙ্গবাণীর অঙ্গচ্ছেদের শঙ্কা' আমাদের আজও রয়ে গেছে। আমরা জানি, 'শ্রীহট্টের কথ্যভাষা পুরাতন গৌড়ীয় বঙ্গভাষারই প্রতিকৃতি'। আমরা তার শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুস্বরিক বাচনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব। অনধিকারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'আমরা যে ভাষায় মাতৃস্তন্য পান করিয়াছি, তাহা অবিশুদ্ধ ভাবিতে পারি না।' কিন্তু এই শুদ্ধতার বোধ অর্জনের জন্যেও চাই যোগ্যতা। 'সাহিত্যদেহের রুধিরের অভাব' দূর করার কথা ৯৩ বছর আগে ভুবনমোহন বলেছিলেন, এই সঙ্কট তো আজও রয়েছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তখনও সত্য ছিল এই উচ্চারণ—'ধনপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের উন্নত সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদের গৃহদেবতা রক্ষা পাইবেন না'। এখনও তা সত্য। আমাদের সীমায়িত অবস্থান কি শতাব্দী ধরে দৃষ্টিশক্তিকেও ক্ষীণ করে রেখেছে? 'সাহিত্য শুধু ভাষার প্রাণ নহে, সমাজেরও প্রাণের অভিব্যক্তি'। ঠিক। তাহলে মাত্রাতিরিক্ত উপভাষা-চেতনাই কি আজও আমাদের গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে? বড় আকাশ আমাদের হাতছানি দিয়েছে কিন্তু দাঁড় ছেড়ে বেশি দূর উড়তে পারিনি। ডানার ব্যবহার শিখিনি নাকি যথাপ্রাপ্ত পরিসরের অপরতা অদৃশ্য শেকল পরিয়ে দিয়েছে আমাদের?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কী লিখি, কী লিখতে চাই

সময় যখন জহ্লাদ

গিলোটিন নির্মম উদাসীনতায় কাজ করে চলেছে। ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে পড়ছে, প্রকরণ থেকে অন্তর্বস্তু, বয়ান থেকে অন্বিষ্ট। কেউ বা ইচ্ছে মতো কুড়িয়ে নিচ্ছে মুণ্ড এবং যে-কোনও ধড়ে জুড়ে দিচ্ছে। তেমনি প্রকরণ এবং বয়ান যেন স্বয়ম্ভু ; যে-কোনোভাবে তাদের প্রয়োগ করা চলে। দৈনন্দিন জীবনে মাটি ও আকাশের অনুপাত হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আঁধি-প্লাবন-ভূমিকম্প-হিমানি সম্প্রপাত ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার যথাপ্রাপ্ত আকরণগুলিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি স্থপতি স্বয়ং আত্মস্থাপত্য ধ্বংসের নেশায় উন্মাদ, বিভোর। এখন কেন্দ্র নেই কোনো, পরিধিও নেই। যে-কোনো বিন্দুতে আরম্ভ হতে পারে, শেষ হতে পারে যেখানে-সেখানে। হনন-উৎসবে মত্ত পৃথিবী। অস্তিত্ব আর জ্ঞান কৃষ্ণবিবরের গ্রাসে ; সমস্তই আপাত এখন, সব কিছু গোলকধাঁধা।

প্রতিবাস্তবের কুহক

কখনও মনে হয় বার্গম্যানের চিত্রনাট্যের ভেতরে ঢুকে পড়েছি, কখনও বা লুই বুনুয়েলের চিহ্নায়িত দৃশ্যকল্প কল্লোলিত হতে দেখি। জীবন-জগৎ-বাস্তব সম্পর্কে ধারণা ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে গেছে এতদিন। জটিলতা ও গ্রন্থিলতা তৈরি হয়েছে নিয়মমাফিক। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ধারণার কাঠামোও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অকল্পনীয় দ্রুততায়। জগৎ মুছে যাচ্ছে প্রতিজগতের সন্ত্রাসে, জীবন ডুবে যাচ্ছে প্রতিজীবনের চোরাবালিতে, প্রতিবাস্তবের তীব্র আবর্ত গিলে খাচ্ছে বাস্তবকে। সভ্যতা প্রমাণিত হচ্ছে খোলস বলে, বর্বরতাই তার শাঁস। তাই সন্ত্রাসকে এখন হার মানতে দেখছি আরও বড়ো সন্ত্রাসের কাছে। বিশ্ব একনীড় হচ্ছে মানবিকতার উত্তাপে নয়, প্রতাপের চরম উদ্ধত আগ্রাসনে। এখন কে আর বলে ধানসিঁড়ি নদীর কথা, কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। আমাদের লেখালেখি কি কুহকের কথকতা করবে এখন, যখন জীবনের পাঠকৃতি থেকে গলে-গলে পড়ছে পুঁজ-কফ-শ্লেষ্মা-পিত্ত মাখানো নিরাবেগ মেধা।

গভীর গভীরতর অসুখ এখন

আমরা বয়ে যাচ্ছি। দশকের পরে দশক, শতকের পরে শতক ধরে। বয়ে যেতে-যেতে নিজেদের সময়ের সংরূপ নিজেরাই নির্মাণ করছি, পরিসরের সংজ্ঞা তৈরি করছি। সব

কিছুর সম্মিলিত চাপ শুষে নিচ্ছে আমাদের লেখা। শুষে নিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে না তার হয়ে ওঠা, সম্ভাব্য কোনও মাত্রাবোধের প্রতি ইশারাও করছে। কিন্তু তবু কিছু কিছু অন্ধবিন্দু অবারিত হয়ে পড়ছে। আমরাই আমাদর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ছি অহরহ। সুখের শরিক অসুখ, স্মৃতির শরিক বিস্মৃতি, গতির শরিক স্থিতি, মুক্তির শরিক রুদ্ধতা। কী ব্যক্তি-সত্তায়, কী সামূহিক সত্তায় কৃষ্ণবিবরের উপস্থিতি প্রকট হয়ে পড়ে তাই চূড়ান্ত উদ্ভাসনের মুহূর্তে। এই কূটাভাস আগেও ছিল ; কিন্তু ইতিহাস-প্রত্যাখ্যানের আধুনিকোত্তর প্রবণতা সাম্প্রতিক কালে ওই কূটাভাসকে সমুৎপন্ন সর্বনাশের বার্তাবহ করে তুলেছে। বিমানবায়নের বিকট হিংস্র চেহারা বিশ শতকের শেষ দুটি দশকে উত্তরোত্তর নির্বাধ হতে দেখেছি। তবে ইদানীংকার নির্মানবায়ন প্রক্রিয়া ধূসরতম নেতির আকারগ্রাসী পরিণাম-গ্রাসী উপলব্ধিকে যেভাবে সক্রিয় করে তুলছে, তাতে সভ্যতা-সংস্কৃতি-লিখনবিশ্ব জুড়ে ব্যাপ্ত নিশ্চিহ্নায়নই সর্বেসর্বা। কী লিখব এখন, কেন লিখব, কার জন্যেই বা লিখব!

চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ

লেখা ঘটে যায়, হয়ে যায়। তবু। সময়ের চক্রকে ক্লান্ত বিধুর বিপর্যস্ত হয়েও লেখা 'ঘটনা' হতে পারে। এখনও। কেননা, মালার্মে কবিতার ঘটনাস্থল হিসেবে যা উল্লেখ করেছিলেন, তা তো এখনও সত্য- "On the empty paper protected by its whiteness' (Sur le vide papier que sa blancheur defend)। লিখিত শব্দাবলী জন্ম নেয়, ঘটে যায়। শূন্য সাদা কাগজের সুরক্ষিত পরিসরে কালো-কালো আখরেরা ফুটে ওঠে, ভরিয়ে দেয় তৃপ্ত ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার চিহ্নায়কে। মীমাংসা নয়, জিজ্ঞাসা জেগে থাকে। আরও আরও চিন্তাবীজ ছড়িয়ে দিয়ে। বাচনের আলো নয় কেবল, ছায়া আর অন্ধকার প্রসারিত হয় ক্রমশ। তবু কিছুই শেষ কথা হয় না, হতে পারে না। বহু অতৃপ্তিকে পেছনে রেখে সম্ভাব্য তৃপ্তির দিকে এগিয়ে যায় লেখা, এই মাত্র। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, এই অনুভবের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে তেরো শতকের ইতালীয় কবি গুইদো কাভালকান্তি যেন সহযাত্রী। তাঁর একটি সনেটের প্রারম্ভিক দুটি পঙ্‌ক্তি এরকম :

"We are the sad, dismayed pens,
the Scissors and the sorrowing knife" !

কলমের বিষণ্ণতা আর বিবিক্ততা তবে কি চিরকালীন? পর্বে-পর্বান্তরে পটভূমির বদল ঘটে শুধু!

লেখার সত্য, লেখার অবভাস

একুশ শতকে পা রাখার আগেই চারদিক থেকে ধেয়ে এসেছিল ভার্চুয়্যাল রিয়্যালিটির বার্তা। কী ধরনের বাস্তব বলব একে? প্রতীত নাকি ধারণাগত নাকি প্রতিভাসিত! যা-ই বলি, বহু শতক ধরে নিঃসপত্ন ও তর্কাতীত বাস্তব এখন অভূতপূর্ব প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি। কতভাবে এর প্রতিক্রিয়া দেখতে পাব, এ বিষয়ে জল্পনা না-করেও এইটুকু

নিশ্চয় বলা যায় যে আমাদের লিখনবিশ্ব আগের মতো থাকবে না আর। 'বাস্তব' শব্দটি নিছক পরিস্থিতির দ্যোতক নয় ; বহুমুখী তাৎপর্যের বিচ্ছুরণকেন্দ্র হিসেবে তা অজস্র উৎস ও পরিণতির সংযোজকও বটে। প্রতিভাসিত বাস্তবতার কথা বলি যখন, ইতিহাস-ভূগোল-দর্শন-সমাজতত্ত্ব প্রসূত যাবতীয় প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ তাসের প্রাসাদের মতো ধ্বসে পড়তে থাকে। এমন কী, সময় আর পরিসরের মতো সর্বজনমান্য চিন্তাবীজও অধিসময় আর অধিপরিসরের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এতদিন যাদের সত্যভ্রম কিংবা অবভাস ভেবেছি এবং সত্য থেকে তাদের পার্থক্য-প্রতীতি বহু অধ্যবসায়ে গড়ে তুলেছি—সেই সবই কি অবান্তর হয়ে যাবে এখন? এখনকার লেখার টানা ও পোড়েন কীভাবে নির্ণীত হবে তবে! কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প দেড়শতকে যতটা পাল্টে গেছে, তাতে মনে হয়, আগামী দিনগুলিতে পরিবর্তন শব্দটা হয়তো প্রতিভাসিত বাস্তবতার সর্বাত্মক আক্রমণের বহর বোঝাতে ব্যর্থ হবে। লেখায় অবভাসের প্রাধান্য যদি সত্যকে সিংহাসনচ্যুত করে, পাঠকৃতিতে বা বয়ানে পাঠক-সাপেক্ষতার পর্যায় কি শেষ হচ্ছে? পুরনো অর্থে লেখক-সাপেক্ষতা ফিরে আসবে না হয়তো, সূত্রধার-সত্তার উপর প্রতিভাসিত আলো নিক্ষিপ্ত হবে আবার।

সময়ের বুক থেকে কারা দ্রাক্ষামোচন করে রোজ

বয়ানের মৃত্যু হল, বয়ান দীর্ঘজীবী হোক : এ তো প্রতিমুহূর্তের নিরুচ্চার উচ্চারণ। যে-অভিজ্ঞতা এইমাত্র ব্যক্ত হল, তা তো হুবহু পুনরাবৃত্ত হবে না। প্রতিটি পরিস্থিতি অনন্য, অস্তিত্বের অভিজ্ঞানও অদ্বিতীয়। তাই প্রতিটি মুহূর্তে বাচন মুছে যাচ্ছে, নতুন আদলে ফিরে আসছে আবার। সময়ের মহাফেজখানায় জমা পড়ছে কত অনুপুঙ্খ ; গভীর মনঃ-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাদের প্রায়োগিক সামর্থ্য বদলে যাচ্ছে। স্বর থেকে স্বরান্তরে পৌঁছাতে সত্তার আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নিঙড়ে নিয়ে নিজেরই প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মাত্রা ব্যক্ত করে চলেছে সময়। যে-উৎস থেকেই উৎসারিত হোক উচ্চারণ, অতিবাহিত পথ ও পাথেয়কে মুছে না নিলে নতুন পাঠকৃতির আবির্ভাব ঘোষিত হয় না। যে-পরিসরে লিখনবিশ্ব জন্ম নেয়, তা নিরপেক্ষ—বিষয় এবং বিষয়ীর কাছে। পাঠকৃতির জন্ম হওয়ার পরেই কেবল আমাদের ব্যাখ্যা-ভাষ্য-টিপ্পনি তাকে কোনও-না কোনও ধারণার ছাঁচ অনুযায়ী বুঝতে চায়। কিন্তু এই সবই সাধারণ সত্য। স্বয়ং সময় যখন ইন্ধন, বহু সহস্রাব্দের ধারাবাহিকতায় গ্রথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন অভাবনীয় অগ্ন্যুৎপাতে বিদীর্ণ—কোন লেখায় ফুটে উঠবে আমাদের হাহাকার ও বিহ্বলতা, ধ্বংস-গোধূলির মদির আত্মবিস্মৃতি ও নিমজ্জমান সত্তার আর্তি? প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিকতার পথে নয়, একথা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে। আজকের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আগামীকালের বয়ান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা করা হয়তো সম্ভব নয় ; কিন্তু আরও নতুন নতুন চিহ্নের দাপট সম্পর্কে পূর্বানুমান বোধহয় করা চলে। নিশ্চয় ভাবতে পারি যে লেখার পরিসর হবে আরও বহুমাত্রিক ও অনেকান্তিক। এই পৃথিবীতে যখন কিছুই মৌলিক নয়, অজস্র স্বরের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও সংশ্লেষণ যুগপৎ সত্য।

পাঠকৃতিতেও একাধিক কেন্দ্রের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। উপস্থিতি আর অনুপস্থিতির দ্বিরালাপ উত্তরোত্তর অবারিত হয়ে উঠবে আগামীকালের বয়ানে।

লেখা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র

লেখা যুদ্ধ, লেখা যুদ্ধক্ষেত্র, লেখা জয়, লেখা পরাজয় এবং লেখাই রণকৌশল। বহুত্ব তার স্বভাবে, তার নিরন্তর পরিচর্যায়। অন্তর্ভুবনের ক্রমিক উদ্ভাসনে, বহির্জগতের নানা গ্রন্থনায়। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে লেখায়, লেখার ভিতর দিয়েই দেখতে হবে ভুবনখানি। বুঝতে হবে সময়কে, জানতে হবে পরিসরকে। লেখার গভীরে নেই কোনও দুষ্প্রবেশ্য রহস্য, নেই আধিপত্যবাদী চূড়ান্ততা, নেই নিষ্ক্রিয় রুদ্ধতা। যুক্তি-বিধি-বিজ্ঞান ঈশ্বর : কোনও কিছুই পাঠকৃতিকে স্থির বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। লেখার শক্তি ও লাবণ্য তার উৎসে নেই। রয়েছে পথ থেকে পথান্তর সৃজনে। এখানেই তার মুক্তি, এখানেই তার সার্থকতা। গ্রন্থনার প্রতিটি অনুপুঙ্খে আভাসিত কোনো-একটি বৈশ্বিক দ্যোতনার তাই ভাষ্য করব না শুধু, গ্রন্থিমোচন করব। প্রতিটি বিন্দুতে প্রতিটি স্তরে আবিষ্কার করব, অন্তরালে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই। আমাদের মেধাবী আবেগ তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো লেখার পরিসরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে যাবে। কোথাও কোনও পূর্বানুমিত অর্থ তাতে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। সমগ্রতা যখন প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি, তাৎপর্যের একক ও সামূহিক বাচনের দ্বিবাচনিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই লেখার ধর্ম। সর্বব্যাপ্ত ভাঙনের কালবেলায় এই আমাদের দ্রোহ, এই আমাদের প্রতিবাদ। এই আমাদের অঙ্গীকার। লেখা চলছে। লেখা চলবে।

আমাদের এই লিখনপ্রণালী

গৌরবার্থে বহুবচন রয়ে গেছে শিরোনামায়। 'আমাদের' সর্বনামে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অনেক বিচ্ছিন্ন একাকী 'আমি'র সমাবেশ। অরণ্যে গাছের মতো পাশাপাশি, কাছাকাছি নয় তবু। ভাষাহীন নৈঃশব্দ্যে এক অপরের থেকে বিস্তৃত, সুদূর। অথচ লেখা গভীর এবং ব্যাপক সেতু হওয়ার কথা ছিল। নিজেরই ভেতরে কত অজানা চোরাবালি, কত কুশ্রী ফাটল, কত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, কত ঝড়ের আকাশ! লেখায় সেইসব ঝলসে ওঠার কথা। নিজেরই সময় ও পরিসরের দ্বিরালাপ থেকে লেখা জন্ম নেয়। কবিতার চিহ্নায়কে কখনো, আর কখনো বা আখ্যানের বয়নে। সমান্তরাল ভাবে বহমান একক 'আমি'-দের আবর্ত থেকে লেখা ক্রমশ মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুতেই তবু লেখার আদল থেকে বিমূর্ত প্রবণতার ছায়া সরে যায় না। ব্যক্তিসত্তা আর সামাজিক সত্তার আততি লেখার প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলে কেবলই। লেখা আসলে এক আদ্যন্তহীন গ্রন্থনা। এর কোনো আরম্ভ নেই, কোনো সমাপ্তিও নেই। সুতরাং চিরাগত অভ্যাসে যাকে লেখকসত্তা বলে শনাক্ত করছি, তা আসলে সূত্রধারসত্তা। সুখে দুঃখে আনন্দে যন্ত্রণায় আশায় নৈরাশ্যে জীবনে মরণে—বহু ধরনের অজস্রতায় ওই সত্তা লালিত হচ্ছে অহরহ। সূত্রধারের কাজ শুধু একটাই। লেখাকে অনেকান্তিক দ্যোতনার বিচ্ছুরণে যুক্ত করে রাখা। এইটুকু নিশ্চিত করা, যেন, বিযুক্তি ঘটানোর আশঙ্কাজনক কৃৎকৌশলেও লেখার প্রক্রিয়া অবিন্যস্ত না হয়, পরাস্ত না হয়।

লেখা মূলত আত্মখননের প্রণালী। একসময় ওই প্রণালীর শুরু হয়। তারপর কোনো-এক উপযুক্ত মুহূর্তে সূচনা হয়ে থাকে লেখার। প্রস্তুতিকে চিনতে পারি হয়তো, কিন্তু প্রস্তুতির ফসলটি উদগত হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণকে পাঁজিপুঁথির অঙ্ক কষে চেনাতে পারি না। শুধুমাত্র ওই আবশ্যিক প্রণালীকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে অধ্যবসায়ী হতে পারি। অথচ এই অধ্যবসায়ে ঘাটতি থেকে যায় সর্বদা। বিনা পরিশ্রমে শিরোমণি হয়ে ওঠার সাধ লালন করি বলে লেখা-লেখা খেলায় বুঁদ হয়ে থাকি। নিজের চোখে নিজেই ধুলো দিই এবং ঠুলি পরাই। কী চাই লেখায় মধ্য দিয়ে, নিজের কাছে তা স্পষ্ট হয় না কখনো। আত্মপ্রতারণার মাদক আচ্ছন্ন করে রাখে সকাল-সন্ধ্যা। পণ্যায়নের কুযুক্তিশৃঙ্খলায় বন্দী হয়ে যান সেইসব লিখিয়েরা, একদা যাঁরা বলেছিলেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের

কথা, বলেছিলেন বিকল্প চেতনা বিকল্প নন্দন বিকল্প বয়নের কথা। বড়ো কিছু পাওয়ার জন্যে স্খলন ঘটে না। সাধারণত টুকিটাকি লোভ, নগদ বিদায়ের আকাঙ্ক্ষা, যূথবদ্ধতার নিরাপত্তা—এইসব এত বেশি চোখে পড়ে যে 'দ্রষ্টা চক্ষু'র উদ্‌ভাসনের জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি, তিতিক্ষা ও ধৈর্য সম্পর্কে অনীহা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ওঠে। সমকাল যদিও সমস্ত অর্জনের আধার, মনে রাখতে হয় একথাও যে বর্জ্য পদার্থও এই সমকালই উৎপাদন করে চলেছে। এ বড় সুখের সময় নয়, এ বড় আনন্দের সময় নয়—একথা লিখেছিলেন শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এও একরকম করে জানা যে এ সময় কেন্দ্রচ্যুতির, গতিহীন পরিক্রমার। যখন 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে দেয়ালে দেয়াল কার্নিশে কার্নিশ ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে।' এও একধরনের নিবিড় দেখা যে 'জুতো হাঁটছে পা রয়েছে স্থির।' সমস্ত কিছুকে এতোলবেতোল করে দেয় সত্তাশূন্য রিক্ত কাল, প্রতিবেদনের বয়নে অন্তর্বয়নে এর স্বীকারোক্তি থাকবেই।

আবার, সত্য তো একান্তিক নয়। লেখা তো একবাচনিক নয় কখনো। সূত্রধার-সত্তার প্রবল শীৎকার যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি অনিবার্য সত্তার দ্রোহ ও ঘৃণায়-বিদ্রূপে-ক্ষোভে গড়ে-ওঠা বারুদ-প্রহর। তখন বাংলা পদ্যের এবং গদ্যের ধারণ-ক্ষমতা শানিত হয়ে ওঠে আরও, সত্যের মুখোমুখি হওয়ার কৃৎকৌশল রপ্ত করে নেয় লেখা। আশপাশকে দেখে নেওয়ার জন্যে যতখানি শক্তি অর্জন করা আবশ্যিক, সে-সময় লেখায় তা জেগে ওঠে। সুবিমল মিশ্রের ভাষায়, তখন 'নাঙা হাড় জেগে উঠছে'—এই বার্তা প্রচার করে লেখা। হয়ে ওঠে শক্তিশালী হাতুড়ির বিকল্প যা দিয়ে অচলায়তনের পাথুরে দেওয়াল ভেঙে ফেলা যায়। আলু-পটলের মতো, প্রসাধন-সামগ্রীর মতো, স্যানিটারি ন্যাপকিনের মতো সাহিত্যকর্মকে হাটেবাজারে বিক্রি করার জন্যে চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের জৌলুস তৈরি করা হচ্ছে যখন—সে-সময় তথাকথিত সাহিত্যের উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকছে লেখা, আমাদের লিখনপ্রণালী। সুবিমল মিশ্র এই প্রণালীর চমৎকার উপস্থাপক। তিনি, সুবিমল মিশ্র, গত তিরিশ বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাশৃঙ্খলকে ভেঙে-ভেঙে ওই সাহিত্যকর্ম নামক কিংবদন্তিকে ধ্বস্ত করেছেন, স্বাধীন সূত্রধার-সত্তাকে দিয়ে প্রতাপের যাবতীয় চক্রান্ত মোকাবিলা করিয়েছেন। সমস্ত বহুত্বের দ্যোতনা জন্ম নিচ্ছে যে তীব্র বিস্ফোরক আঁতুড়ঘরে, তার নাম জীবন। আর, এই জীবনের দিকে খোলা চোখে তাকাতে-তাকাতে বিস্ময়ের, বেদনার, স্বপ্নের, আনন্দের, শৌর্যের আর শেষ নেই তাঁর। গত তিরিশ বছর ধরে তাঁর পরিক্রমা আসলে লেখার অবিরল প্রবাহ, পাঠকৃতির অর্থাৎ টেক্সটের বহুস্বরিক হওয়া আর হয়ে ওঠা। বিনির্মাণ আর পুনর্নির্মাণের এই যুগলবন্দিতে যতটুকু বদলে যাচ্ছে সূত্রধারসত্তা, ঠিক সেই পরিমাণে পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে জীবনবোধ।

প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যে এই নবায়ন ঘটে না, ঘটতে পারে না। সেখানে মলাট পালটে যায় মুহূর্মুহু কিন্তু ভেতরের শাঁস বা শাঁসহীনতা একই থেকে যায়। অথবা ভেতরের ওই শাঁসাভাসে যত পচন ধরতে থাকে, বাইরের মলাটে তত জটিল রঙ আর দামি এসেন্স যুক্ত হয়। কিন্তু পচাইয়েরও একটা নিজস্ব আমোদ থাকে যা কিনা ভয়াবহভাবে

সংক্রামক। ওই সাহিত্যকর্মের বিপরীতে যাঁরা স্পন্দনময় জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, পণ্যায়নের সুবিধাবাদ প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিককে অনবরত খুঁজতে খুঁজতে 'লেখা' আবিষ্কার করেছেন—এমন কি, বানপ্রস্থকালীন সত্তর পেরিয়েও তাঁদের, হ্যাঁ তাঁদেরও, স্খলন হতে পারে। বর্ণবোধের দিনগুলি থেকে যে অজগরটি তেড়ে আসছিল—সেই অজগরের মায়াবী গ্রাসে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরও পড়া অসম্ভব নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা-নন্দন-বয়নের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা বলা মানে আমৃত্যু লড়াইয়ের মধ্যে থাকা। এমন লড়াই, যাতে এক মুহূর্তের জন্যেও ঢাল এবং তরোয়াল হাত থেকে নামানো চলে না। প্রশ্ন অবশ্য তবুও থেকে যায়। খড়ের পুতুল কত আর শক্ত মুঠোয় প্রহরণ ধরতে পারে? যাকে অবয়ব বলে ভাবছি, তা যদি পুরোদস্তুর মেকি হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর কোনো দায়ই তো চাপানো যাবে না। যার অস্তিত্ব নিছক অবভাস, তাকে ঘিরে কোনো লেখার জগৎ পল্লবিত হবে কি? কিন্তু যাকে কখনো নিশানা ফলক ভেবেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণা ভেবেছি—তাঁর সমস্ত বাচন আজ যদি আমাদের বিদ্রূপ করতে আসে, তাহলে?

আসলে, গত দশ-বারো বছরে আত্মপরীক্ষা কঠোরতর হয়েছে, এইমাত্র। এ কেবল স্মরণীয়ের স্খলন হয়েছে বলে নয়, এইজন্যেও নয় যে আশ্রয়ের ধারণাটিও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বরং পরীক্ষা দুরূহতর হয়েছে কেননা বিকল্প চেতনার প্রস্তাবকদের মধ্যে ব্যাপক আত্মবিদূষণের দুর্লক্ষণ দ্রুত প্রকট হয়ে পড়ছে। সহযাত্রী ও সহযোগী হওয়ার বদলে আমরা এখন অসুস্থ প্রতিযোগী ও অন্তর্ঘাতকের ভূমিকায় নেমে পড়েছি। অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্যার আঁতুড়ঘরগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের বেনোজল ঢুকে পড়ছে। ফলে বন্যায় নালা-নদী-ডোবা একাকার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। চারদিকে কেবল 'আমাকে দেখুন আমাকে বুঝুন' রব। দু-তিন বছর আগে যা ফিসফিস ছিল, এখন তা কোলাহল। 'খরিদ্দার নাই সকলেই বেচিতে চায়' জাতীয় অবস্থা প্রায় এসে গেছে। এ সময়, এই পরিস্থিতিতে, কাঙ্ক্ষিত লেখা কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত কলমে আসতে পারে? যাদের ওপর ভরসা ছিল, তাঁরা ধাপে-ধাপে পণ্য-সাহিত্যের স্রোতে মিশে যাচ্ছেন। সূত্রধার-সত্তাকে গিলে খাচ্ছে সাহিত্যিকের নির্মাণ-প্রয়াস। ততক্ষণই লেখা যতক্ষণ নিয়মের খাঁচায় জীবন বন্দী নয়। কিন্তু যখন জীবনকে ময়নার মতো দাঁড়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াতে চাই, তার শেখানো বুলিতে আকাশের বার্তা ফুটবে না। এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার তাড়না লেখার প্রক্রিয়ায় ও পরিসরে অনুভব করছি কিনা, এই হল সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। কেননা এই তাড়না সম্ভাবনাকেই কর্ষণ করে। গত দশকের দৃঢ় নিশ্চয়তা আজকের লিখিয়েদের মধ্যে অনুপস্থিত। যাঁরা দুই বা আড়াই দশক ধরে লিখছেন, তাঁরাও আজ থমকে দাঁড়িয়েছেন যেন। কিছুটা কি বিভ্রান্ত নাকি চলতে চলতে হঠাৎই রসদ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন তাঁরা?

আসলে, শুরুতে নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শ সম্পর্কে ঝাপসা হলেও খানিকটা ধারণা ছিল তাঁদের। অতি দ্রুত বিকাশমান যান্ত্রিক বিশ্বের সর্বশেষ অভিঘাত তাঁদের গভীর সংবেদনাকে শুষে নিচ্ছে। হঠাৎই মায়াবী সব পর্দা সরে গেছে। নিজেদের

বিচূর্ণিত সত্তার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা আসলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গতকাল ধূসর, আগামীকাল ধূসরতর ; তাই মরিয়া হয়ে অনিশ্চিত বর্তমানকে গোগ্রাসে গিলতে চাইছেন তাঁরা। এতে যে বর্তমানই তাঁদের হাড়মাসমজ্জা গিলে খাচ্ছে—একথা বুঝবার মতো ধৈর্য ও অবকাশ নেই। ফলে সাহিত্যের অলংকৃত বাক আর প্রাকরণিক বিন্যাস তাঁরা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। লেখার মধ্য দিয়ে জীবনের পুনর্বাসন ঘটানোর ভরসায় থাকতে পারছেন না নিষ্ঠুর বর্তমানের ভয়ে। নিজেকে পাঠকৃতি ভেবে ক্রমাগত অনুশীলন করছেন—এখন এমন বৃত্তান্ত নিতান্ত দুর্লভ।

২

আজ আমরা যখন লেখা নিয়ে ভাবি, অসীম রায়-কমলকুমার মজুমদার-দেবেশ রায়-সুবিমল মিশ্র-বাসুদেব দাশগুপ্ত-আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-সৈকত রক্ষিত-নবারুণ ভট্টাচার্য-এর মতো আরও কয়েকটি নাম ছাড়া সমস্ত কিছুই অলংকৃত সাহিত্যের ছায়ায় নীল হতে দেখি। আরম্ভ আর পরিণতির মধ্যে এত বেশি ফারাক চোখে পড়ে যে বিচ্যুতিকেই নিয়ম বলে মনে হয়। অতিবিশাল কৃষ্ণবিবরের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখি একদা উচ্চারিত সংকল্প, জীবন-সংলগ্নতার প্রতিজ্ঞা আর ধারাবাহিকতার উপলব্ধিকে। প্রতিমুহূর্তে নতুন হয়ে-ওঠা লেখা কদাচিৎ চোখে পড়ে আজ। বরং গোলকধাঁধার সিঁড়িগুলি ঘুরতে ঘুরতে কোনো-এক অনির্দেশ্য অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে, এমন মনে হয়। ওইসব সিঁড়ির উপর শুনতে পাই অসংখ্য ধাবমান পদশব্দ। চিহ্নায়কশূন্য রিক্ততার গোল পিণ্ড গড়াতে গড়াতে সময়ের শীৎকারকে কেবল প্রবল থেকে প্রবলতর করে তুলছে। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অনুশীলন করার জন্যে কতখানি ভাঙতে রাজি হচ্ছি? সুখ আর দুঃখ, জয় আর পরাজয়, প্রতিষ্ঠা আর বিনাশ : এজাতীয় কিছু বিভাজন করে নিয়ে নিজেদের অনুভূতিকে পিঞ্জরায়িত করে তুলছি শুধু। ভান করছি প্রতিবেদন রচনার। কবিতার বহিরঙ্গ ধরনকে মকসো করে প্রতীক ও সংকেতের নামে নিরপেক্ষ, ধোঁয়াটে, বাচনশূন্য শব্দসজ্জার আড়ম্বর তৈরি করছি কখনো। আর কখনো কথকতার আভাসমাত্র সম্বল করে গল্পের, উপন্যাসের কাঠামো গড়ছি। এদের কোথাও আমি নেই তুমি নেই সেও নেই। কিন্তু জবরদস্ত 'সাহিত্য' আছে। সেই সাহিত্যের চারপাশ নিয়ে আত্মমোহ আছে, প্রদর্শনী আছে, নগদ বিদায় নিয়ে ঈর্ষা-অসূয়া-আত্মপ্রচার আছে। এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্য জুড়ে চোরাবালির প্রসার, কেবলই সাহিত্যের ঢোলবাদ্য; কিন্তু লেখা নেই কোনোখানে : এই আশঙ্কা জাগে।

নেই, কারণ জীবনের দ্বিরালাপ অস্বীকৃত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যেন প্রশ্ন ফুরিয়ে গেছে। নানা অজুহাতে কেবলই মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া। সাহিত্যকর্ম এখন মাঝারিমাপের মানুষজনের, সাধারণভাবে যারা জীবন্মৃত, একচেটিয়া ভোগদখলের বস্তু। তাই গাণিতিক হিসাব-নিকাশ নিরঙ্কুশ। শিবির ভাঙা, শিবির গড়া, শিবির পুনর্বিন্যাস : একাজে প্রায় সবাই ব্যস্ত। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে তৎপর। স্বভাবত, এইসব লীলা সাম্প্রতিক সাহিত্যক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ। লেখা নেই, অতএব

প্রতিবেদনও নেই। জীবন-নিরপেক্ষ নির্মাণে মুছে যাচ্ছে সত্য। পুঞ্জীভূত হচ্ছে শুধু আবর্জনাস্তূপ। এই স্তূপ নিরাকার, কুৎসিত। তবু যত পুষ্পবৃষ্টি এর উপর, কাগুজে ফুলের মালা চড়ানোর প্রতিযোগিতা। অন্ধেরা আজ পথ দেখাচ্ছে মূক ও বধির জনতাকে। কেন এমন হল? সত্তরের জলবিভাজন রেখা পেরিয়ে এসে যাঁরা আশি জুড়ে পুষ্পিত হয়েছিলেন, প্রাকৃতায়নের স্পন্দনে যাঁরা বিকল্প নন্দন ও বিকল্প বয়নের প্রস্তাবনা করেছিলেন—পণ্য ও বিনোদনের বিশ্বায়নকে যাঁরা নব্বইয়ের গোড়ায় গ্রাহ্য করেননি, ক্রমশ কেন সর্ষের মধ্যেও ভূত ঢুকে পড়ল? সাহিত্যের রসুইঘরে শামিল হওয়ার জন্যে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা হঠাৎ এত সংক্রামক হয়ে উঠল কেন? লিখন-প্রণালী থেকে কেন ঝরে যেতে লাগল দ্বিরালাপ, সাহস ও প্রত্যয়! নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের অন্বয়সূত্র আরও বেশি মাত্রায় খোঁজার বদলে কেন সমস্ত ধরনের গতি ও ঔৎসুক্য হারিয়ে গেল অবসাদে। সামনের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার বদলে কেন পেছনের দিকে হাঁটার কসরত শুরু হল!

প্রথম ধাপে স্তব্ধতা, দ্বিতীয় ধাপে আত্ম-পুনরাবৃত্তি, তৃতীয় আত্মপ্রতারণা এবং চতুর্থে আত্মবিনাশ। এইসব পর্যায়ে কেবল সাহিত্যের তন্তুবয়ন, অভ্যাসের পরম্পরা চালাকি দিয়ে ঢেকে রাখার কৌশল অর্জন। জীবন থেকে আশ্চর্যকে মন্থন করতে পারে না এই প্রকরণ! পারে না, কারণ আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তুর গ্রন্থনাকে নির্মম ভাবে ভাঙার কথা তা দূরতম কল্পনাতেও আনতে পারে না। যা পারে তাকেই বলছি লেখা। কিন্তু সেই ঈপ্সিত লিখন প্রণালী তো ভীরু ও লোভীদের জন্যে নয়। জীবনের পরম প্রাপ্তির জন্যেই যে জীবনের শীর্ণ-ক্লিষ্ট গণ্ডিকে পেরিয়ে যেতে দ্বিধা করে না, লেখা কেবল তার জন্যে। নানা ধরনের গণ্ডি তো আগেও ছিল। গত দু-তিন বছরে কেন তবে এত বিস্তার ঘটল বদ্ধতার, অন্তঃসারশূন্যতার? বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যাওয়ার বার্তা শঙ্খ যদিও দিয়েছিলেন দুই দশক আগে, সাম্প্রতিক পর্বে এই বার্তার অন্তর্বর্তী সংকট ও তীব্র বিপন্নতা যেন আমাদের বিদ্ধ করছে। ছোট ছোট বৃত্তে আমাদের জীবনকে ভাগবাঁটোয়ারা করে থেমে থাকছি না, ইতিহাসের যাবতীয় মানবিক উপাদান শুষে নিয়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর বিচ্ছিন্নতার পাথুরে দেওয়াল গড়ে তুলছি। অপব্যাখ্যা করছি সমস্ত কিছুর। প্রতিষ্ঠার চুড়োয় উঠার সহজ পথে যেহেতু বহুজনের পদচারণা, নিজস্ব গোষ্ঠীতে যূথপতি হওয়ার জন্যে মুখোসের শিল্পিত বিন্যাসে নিজের অক্ষমতাকে আড়াল করে নিচ্ছি। যদি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে শেষ হত অধ্যবসায়, কথা ছিল না। হীনমন্যতা-ঘৃণা-বিদ্বেষ সম্বল করে লোককথার শেয়াল পণ্ডিতের মতো একটা কুমিরের বাচ্চাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছি। গোটা মানুষের অবয়ব কেউ চায় না ; যে-সমস্ত সমস্যা এই তৃতীয় সহস্রাব্দের বিহানবেলায় কারও চিন্তার মধ্যেও নেই, তাদের কবর খুঁড়ে তুলে এনে কেবলমাত্র জাতপাত আর অস্তিত্বহীন বর্ণব্যবস্থার দোহাই দিয়ে সমাজ-পরিবেশকে কলুষিত করছি। এতে কেউ কেউ যূথপতি হতে পারছেন বটে অতি দ্রুত, কিন্তু বহুধাবিভক্ত আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতাপের তাতে পোয়াবারো। বর্ণলিঙ্গবর্গবাদী ইতিহাস থেকে প্রান্তিকায়িত জনের উচ্চারণকে যদি সমগ্রতার দ্যোতনায়

পুনরাবিষ্কার করতে হয়, ঘৃণাকে যুক্তির একমাত্র আধার ও আধেয় করলে মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত আজকের এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব সন্ত্রাস যখন বিশ্বপুঁজিবাদের আধুনিকোত্তর পর্যায়কে আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে—সে-সময় বর্ণবাদের পুনরুত্থান মূল লড়াইকে পিছিয়ে দেবে। নয়াবর্ণবাদী গোষ্ঠী ঘৃণাকে মৌল উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে যে-ধরনের সাহিত্যবোধকে উসকানি দিয়ে চলেছে, তাতে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বারুদ যেমন নুলো-খোঁড়া-অন্ধ-বধিরদের মধ্যে হারিয়ে যাবে—তেমনি ভূলুণ্ঠিত হবে লেখার পতাকা।

সন্দেহ নেই যে বিপন্ন এ সময়। নইলে মানুষের দুনিয়া কেন বল্মীকের স্তূপ হয়ে যাচ্ছে। কেন এত সংশয়ের কুয়াশা, এত গণ্ডির পরে গণ্ডি! যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ কেন চোখে দ্যাখে তারা? শুধু কেন গণ্ডির গাথারচনা আর মানুষকে নানা ছলে নানা অজুহাতে কেবলই টুকরো করে আনার আয়োজন। সাহিত্যের নামে অচলায়তন আর চক্রব্যূহ গড়ে তোলা হয়েছিল বলেই তো লেখাকে আয়ুধ হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন সত্তার উপাসকেরা। একদিকে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের অজস্রতার দাপটে লেখার প্রক্রিয়াকে ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা এবং অন্যদিকে লেখার গ্রহীতাদের মধ্যে বিপুল বিভ্রান্তি তৈরির প্রয়াস। আয়ুধে যদি মরচে ধরিয়ে দেওয়া যায় কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়—তাহলে বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতে-দেওয়া আধিপত্যবাদীদের আর পায় কে? নগদবিদায়ের লোভে যত বেশি ছোট্ট ছোট্ট বৃত্ত মেনে নিচ্ছেন লিখিয়েরা, তত বেশি লেখার তাৎপর্য মুছে যাচ্ছে। স্বপ্ন নেই, কল্পনা নেই, আত্মবিনির্মাণ নেই। স্বপ্নশূন্য জীবনে লেখা হয় না, হতে পারে না। কারা কীভাবে স্বপ্নকে শুষে নিচ্ছে অহরহ, সেকথা যতক্ষণ বুঝতে না পারছি অন্তত ততক্ষণ জীবনের পাঠকৃতি তৈরি হবে না। আবার পাঠকৃতি মানে পাঠক। যত পাঠক তত পাঠ অর্থাৎ তত লেখার বিচিত্র বিন্যাস। এই পাঠকসত্তার উপর যদি আক্রমণ নেমে আসে, লেখাও অবধারিত ভাবে নিরালম্ব হয়ে পড়বে। একটু আগে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের দাপটের কথা লিখেছি যাতে যাবতীয় সামাজিক সময় ও পরিসর মুছে যাচ্ছে। কাঁঠালের রসে আটকে যাওয়া মাছির মতো, পিঁপড়ের মতো মানুষ আজ বিনোদনের নেশায় বন্দী। কোথাও আজ পড়ার অবকাশ নেই, তাই পাঠকসত্তাও বিকশিত হতে পারছে না।

অথচ সম্ভাব্য পাঠকের উদ্দেশে চিরকাল লিখিয়েরা তাঁদের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেছেন। সুতরাং গত দু-তিন বছরে ওই পাঠকসত্তার অস্তিত্ব যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, লেখা থেকে তত ঝরে যেতে বসেছে আলো ও গতির সম্ভাবনা। মূল লড়াই যদিও পণ্যায়ন ও বিনোদনের সঙ্গে, সেকথা ভুলে গিয়ে আত্মহননের মাদকে রপ্ত হতে চাইছেন কোনো কোনো একদা-যোদ্ধা। বানিয়ে-তোলা পাঠকের আদলে খুঁজতে চেয়েছেন আত্মরক্ষার প্রকরণ। কিন্তু সত্যভ্রম যেমন সত্যকে আড়াল করে, তেমনি পাঠভ্রম ঝাপসা করে দেয় পাঠকসত্তাকে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের ফাঁদে

রুদ্ধ হয়ে পড়ে লিখনপ্রণালী। বিনোদনের সঙ্গে সামান্য আপস করতে চাইলেও লেখা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে দুরূহতম সংকটের মোকাবিলা করতে হচ্ছে লিখিয়েদের। সমস্ত প্রচলিত বিধিবিন্যাস ও আকরণ ভেঙে নিজের লিখনবিশ্ব নিজেরাই যদি তৈরি করতে না পারেন, তাহলে পাঠভ্রমে আত্মবিস্মৃত হওয়াই ভবিতব্য। অতএব প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্তকে চিনে নিতে হচ্ছে পূর্ববর্তী মুহূর্তের সঙ্গে দ্বিরালাপে ; বয়নে-অন্তর্বয়নে সময় ও পরিসরকে গেঁথে নিতে হচ্ছে নিরন্তর প্রশ্নের উত্থাপন করে। প্রতাপের কৃৎকৌশলকে প্রতিহত করার জন্যে যিনি নিয়ত প্রস্তুত নন—তাঁকে সাম্প্রতিক বারুদপ্রহরে লিখিয়ের পদবি দেওয়া যায় না।

কিন্তু এতে কি জোরালো কূটাভাস তেরি হল না? ছোট-সেজো-মেজো-বড় প্রকাশনাসংস্থা থেকে ফিবছর গদ্যে-পদ্যে এত হরেকরকম বই বেরোচ্ছে যখন, সাহিত্যের হাটে তো পশরার বাড়বাড়ন্ত। বিচিত্র হরফে বিচিত্র বিষয় ঝলমল করছে; শহরে নগরে বইমেলায় ভিড়ও তো উপচে পড়ছে। বছর বছর পুরস্কার শিরোপা বিলি হচ্ছে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী সাহিত্যের গ্রিনরুমে অঢেল ব্যস্ততা এখন, ফলে মূল মঞ্চে কুশীলবদের আনাগোনা যন্ত্রবৎ। সাহিত্য যেন বাজিকরের পুতুলখেলা। কেবল প্রতিযোগিতার রীতিমাফিক পোষাক পাল্টানো আর শরীর মোচড়ানো চলছে। সংখ্যার বিচারে নির্ধারিত হচ্ছে উৎকর্ষ। বিজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করে বাজার ফুলে-ফেঁপে উঠছে। পাঠক হয়ে পড়ছেন বিমূর্তায়িত। একটি পাঠে ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রয়োজন কেননা বিনোদনের ধর্মই এমন। তাৎক্ষণিক দাবি মেটানোর পরে তার দাম কানাকড়িও নয়। কিন্তু বাজার সচল রাখার জন্যে সর্বদা বর্তমান কালে থাকতে হয় পণ্যের যোগানদারদের। কেননা অতীত হওয়া মানে সর্বনাশ, দৃশ্যের অতীত মানে মনোযোগের বাইরে চলে যাওয়া। ভোক্তাদের সঙ্গে চিরকাল অবিশ্বাস ও অনাস্থার সম্পর্ক যোগানদারের। দৃঢ় ভিত্তিতে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে না বলে ভোক্তাও অনবরত বাহারে নতুন খোঁজে। যোগানে ঘাটতি হলে তার অভ্যাসে ছেদ পড়ে, তখন সে যায় অন্য চটকদার বিপণিতে। এমন পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক হয়ে পড়েন দক্ষ ফেরিওয়ালা, নিজেকে সওদা করে বেড়ান তিনি এক হাট থেকে অন্য হাটে। স্বভাবত সেখানে টেক্সট নেই, নেই কনটেক্সট, নেই টেক্সচ্যুয়ালিটি। নেই পাঠ, নেই পাঠকসত্তা। এই যখন সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিকতা, কেনাবেচার নিয়মতন্ত্রে বাঁধা রচনাকুশলতা—পরিশীলন মানে মিথ্যার বুদ্বুদপুঞ্জ। সুতরাং নিয়মের জাল ছিঁড়েই কেবল জেগে উঠতে পারে জীবন-ঘনিষ্ঠ লিখনপ্রণালী। এমন লেখা চাই আমাদের যা প্রতাপের ভ্রূকুটিকে মেনে নেয় না, পণ্যায়ন ও বিনোদনের মাদককে যা হেলায় প্রত্যাখ্যান করে।

৩

কোথায় পাব তারে, সেই মনের মতো লেখাকে, যা চালাকি দিয়ে ভোলাতে চাইবে না! আধুনিক কিম্বা আধুনিকোত্তর প্যাঁচ-পয়জার দিয়ে যা জীবনবাসনায় অন্তর্ঘাত করবে না। জ্ঞানপাপীদের ভিড় যখন প্রগলভ হয়ে ওঠে, বয়ান তখন জেনে-শুনে আত্মহননের

গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। কীভাবে এই ক্ষতিকর প্রবণতার বিরুদ্ধে গভীর প্রতিরোধ জাগিয়ে রাখা সম্ভব, তা হাতে-কলমে দেখিয়ে গেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। আপাত-বন্ধুত্বের দাবিতে যাঁরা তাঁকে 'মধুর অবসাদের ক্লান্তি' বা 'নির্জনতম কবি'র খাঁচায় বন্দী করতে চেয়েছিলেন—তাঁদের হতচকিত ও বিক্ষুব্ধ করে জীবনানন্দ ওই খাঁচা ভেঙে ফেলেছেন। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায় থেকে নিরন্তর আত্মবিনির্মাণ করে তিনি কবিতার প্রতিবেদনকে সমস্ত সাহিত্যিক চাতুর্য ও পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বাঙালি পাঠকের জন্যে এই জরুরি সংকেত তিনি পৌঁছে দিয়েছেন যে লেখা প্রতিটি মুহূর্তে সজীব ও নতুন কারণ তা অনায়াসে আত্মগত অভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সূচনার বিনির্মাণ প্রবণতা ক্রমশ পুনরাবৃত্তির চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে। কেননা বিশেষ প্রকরণ ব্যবহার করে পাঠকদের মধ্যে গৃহীত হওয়ার পরেই অবধারিত ভাবে কবিদের মধ্যে দেখা গেছে অভ্যাস-ভাঙার অনীহা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বর্ণনার মতো বিশদ বেঁধানো সাতপাকে' সেইসব কাব্যপ্রয়াস থেকে অগোচরে নির্বাসিত হয়েছে কবিতা। কৃত্তিবাস-পর্যায়ে তাই প্রতিশ্রুতির অভাব নেই ; কিন্তু অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠানিকতা শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে পণ্যলোভন করে তুলেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায়দের ব্যবসায়িক সাফল্যে তারতম্য থাকলেও তাঁদের লিখনপ্রণালীর জ্যামিতিক ছক অনুসরণ করতে গিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে উত্তর-প্রজন্ম। উৎপলকুমার বসু, বিনয় মুজমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ এঁদের চেয়ে ভিন্নপথগামী যেহেতু সাহিত্যকর্ম ও জীবন্ত লেখার স্পন্দন সম্পর্কে তাঁদের প্রখর সচেতনতা রয়েছে। আবার কৃত্তিবাস ঘরানার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ের কবিরা সুচিন্তিতভাবে কবিতার প্রাকরণিক ও অন্তর্বস্তুগত শৃঙ্খল ভাঙতে চাইলেন। কিন্তু শামসের আনোয়ার-ভাস্কর চক্রবর্তী-দেবারতি মিত্রদের কোনো নির্দিষ্ট ভাবকেন্দ্র ছিল না। ফলে শেষ পর্যন্ত নেতির রিক্ততা তাঁদের লেখাকে গ্রাস করেছে। সত্তরের জলবিভাজন রেখা পেরিয়ে এসে কবিতার প্রতিবেদনে যাঁরা সময়ের সূক্ষ্ম ও তীব্র দ্যুতিময় অবয়ব ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন, তাঁদেরও কারো কারো রৈখিকতা ভাঙার আয়োজন মাঝপথে শিথিল হয়ে গেল। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, মৃদুল দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ, অমিতাভ গুপ্তদের লিখনপ্রণালীতে মহানাগরিক দ্বিধা, সংশয়, আত্মদ্রোহ, প্রাকৃতায়ন অসামান্য বহুস্বরিকতার সম্ভাবনা জাগিয়েও তাই ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন হল, কেন? যাঁদের নাম লিখেছি এবং যাঁদের নাম লেখা হয়নি—এঁদের দ্বারা জীবনানন্দের আত্মবিনির্মাণ কেন ঈপ্সিত মাত্রায় গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হল না? জনপ্রিয়তার সহজ পথ এড়িয়ে, এমন কি, প্রতিকূল পাঠ-পরিবেশ সত্ত্বেও, যিনি দুর্মূল্য ভাবমূর্তির অধিকারী হয়েছিলেন—সেই কবি কত অক্লেশে ওই ভাবমূর্তি নিজেই ভেঙে দিলেন। এর মানে আত্মপ্রতিষ্ঠানে হাতুড়ির প্রথম আঘাতটি স্বয়ং কবিকে করতে হয়। সাহিত্যের জটাজাল ভেদ করে লেখার গঙ্গা কেবলমাত্র তখনই নেমে আসে তৃষ্ণার্ত জমিতে। এরই অন্য নাম হল নিরবচ্ছিন্ন বিনির্মাণ। এই প্রক্রিয়া যখন সচল থাকে, মনের উপনিবেশীকরণ

কার্যকরী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দা হিসেবে মৃত্যুশাসিত জীবন থেকে আমাদের পাঠকৃতি আহরণ করতে হয় বলে প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবকে রূপক আর রূপককে বাস্তব হয়ে উঠতে দেখি। এই দেখা যার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে, তাকেই বলি লেখা। এই দেখাতে পাঠকের সঙ্গে লিখিয়ের মনোমৈত্রী গড়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিকায়িত মানুষ এই মৈত্রী সংগঠনের জন্যে যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস বিনির্মাণ করে। যিনি কবিতায় ও আখ্যানে এই প্রক্রিয়ার প্রতিবেদনকে তুলে ধরেন, তিনি আসলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির আয়ুধ শানিত করে তোলেন। অতএব কোনো প্রচলিত বাক্‌বন্ধ বা উচ্চারণকে অস্বীকার করা মানে ধারণাগত অভ্যাস প্রত্যাখ্যান করে সজীব নতুনের প্রতিষ্ঠা। অজিত চৌধুরীর সাম্প্রতিক দেরিদা-ভাষ্যে তৃতীয় বিশ্বের বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোন ব্যক্ত হয়েছে তাই : 'deconstruction is production of meanings out of meanings by inverting the hierarchy of words/concepts within a text—its interior inaudible voice made loud.' (১৯৯৭ : ৪)। শুধু লক্ষ রাখতে হয় এইটুকু, প্রতিবেদন থেকে কোনো অজুহাতেই যেন মানুষ নির্বাসিত না হয়। সময়ের উত্তাপে কবিতার ভাষা, আখ্যানের অন্তর্বয়ন ঝলসে যেতেই পারে। নন্দনের মাত্রাবোধও রূপান্তরিত হতে পারে মুহূর্মুহু। কিন্তু তাতে লেখার সজীবতাই তো আরও তীক্ষ্ণ হওয়ার কথা ; সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রকে প্রত্যাঘাত করার কথা। উল্টো ঘটনা যদি ঘটে, বুঝতে হবে, গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে কোথাও।

সময় অবিভাজ্য। তবু বর্তমানের সত্তাতত্ত্ব আর জ্ঞান ও প্রতাপের যুগলবন্দি ওই সময় থেকে নানা তাৎপর্য নিঙড়ে নিচ্ছে। লেখা ততক্ষণ জীবন্ত থাকে যতক্ষণ তাৎপর্য সন্ধানের জন্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগোয়। জয় গোস্বামীর উচ্চারণে 'আমরা যা করি ব্রহ্ম তা-ই আজ ব্রহ্ম তা-ই আজ ব্রহ্ম তা-ই' আসলে সময়মথিত উচ্চারণ। তাঁর 'উন্মাদের পাঠক্রম' বা 'ভূতুম ভগবান'-এর মধ্যে আত্মবিনির্মাণের তাগিদ প্রবল বলেই বাচনের প্রাতিষ্ঠানিকতা ভেঙে দিতে পেরেছিল ওই সংকলন দুটি। কিন্তু স্বরচিত অভ্যাসের মোহিনী মায়া অনতিক্রম্য হয়ে রইল বলে 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস কর' গেছে লেখার বিপ্রতীপে। জয়দেব বসু বা সুবোধ সরকারের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। রাহুল পুরকায়স্থ বা তরুণতর কবিদের মধ্যে কজন সাহিত্যের সর্বগ্রাসী মায়াবী ফাঁদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারছেন? কজন লিখতে পারছেন : 'ভাঙন পিছন থাক, সম্মুখে নির্মাণ'? বাংলার বিপুল লিখনবিশ্বে শামসুর রাহমান-আল মাহমুদ-রফিক আজাদ-মোহম্মদ রফিক-নির্মলেন্দু গুণদের মধ্যেও কি অভ্যাসের প্রাতিষ্ঠানিকতা তাঁদের বৈচিত্র্য ও অগ্রগতিকে স্তিমিত করে দেয়নি? খোন্দকার আশরাফ হোসেন-ফরিদ কবির-জিললুর রহমান-মাসুদ খান-তুষার গায়েন-মোস্তাক আহমেদ দীন-দের মতো আরও কিছু তরুণতর কবিদের মধ্যে যদি লেখার বিদ্যুৎচমক লক্ষ করি, তাহলে, বুঝতে হবে, এঁরা আত্মবিনির্মাণে তৎপর রয়েছেন। কথাকারদের মধ্যে কমলকুমার মজুমদার একথা সবচেয়ে ভালো জানতেন বলে ভাষাকে আক্রমণ করেই ভাষাকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে সংগঠিত তাঁর লিখনবিশ্ব ; অতীত

ও বর্তমানের প্রতিবেদনকে তাই বারবার পুনর্গঠন করেছেন তিনি। 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'খেলার প্রতিভা'য় বিচূর্ণিত হয়েছে সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক আয়তন, দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে লেখার আকাশ ও জমি।

পণ্যসাহিত্যের উদ্ধত সন্ত্রাসকে যাঁরা হেলায় তুচ্ছ করেছেন, তাঁরাই বাচনিক সংস্কারের ঘেরাটোপ ভেঙে হয়ে উঠেছেন প্রতিস্রোতপন্থী। হয়তো তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজনীতি তাঁদের বিনির্মাণে সর্বদা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবু প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বিপরীত মেরু আবিষ্কার করার চেষ্টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, অসীম রায়, সুবিমল মিশ্র, রমানাথ রায়, সুবিমল বসাক, দেবেশ রায়, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সৈকত রক্ষিত, নবারুণ ভট্টাচার্য, রবিশংকর বল, কাজল শাহনেওয়াজ—এইসব নাম প্রমাণ করে যে সাহিত্যের কোলাহলমুখর হাটের একচেটিয়া আধিপত্য সত্ত্বেও এবং প্রতিস্রোতের মধ্যে নানা দুর্বলতা এবং স্ববিরোধিতা-কূটাভাস থাকলেও লেখা জীবন্ত আছে, জীবন্ত থাকবেও। এর কারণ,প্রতাপের ভ্রূকুটি দিয়ে সাহিত্য নামক অচলায়তন যখন পরাজিত ও টুকরো মানুষের সমাবেশকে নিরঙ্কুশ করে তুলছে—সে-সময় লেখা বয়ে যাচ্ছে নতুন খাতে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাত নেই পাথর রয়েছে' সংকলনে 'সময় হয়েছে' কবিতাটি ওই নতুন খাতের সংকেতে ঋদ্ধ। কবি সেখানে লিখছেন :

'সুন্দরের হাত পড়ে অগ্নি ও সমিধে
তার সবই চাই
সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
লোলুপ অগ্নির মতো সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
হাতে ও জিহ্বায় চায় বাগানের ফুল
গভীর, বিষণ্ণ, কালো—মানুষের ফুল
সমস্ত, সমস্ত, সব!'

এই ব্যাখ্যাতীত বাচন (যেমন : 'সমস্ত, সমস্ত, সব') অশ্মীভূত সাহিত্যে সম্ভব নয়, রক্তপ্রবাহে স্পন্দিত লেখায় সম্ভব। দৃষ্টান্ত আরও অনেক তুলে ধরা যায়। তবে শক্তির উদাহরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; কারণ, আলো ও ছায়া, গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্বে আকীর্ণ তাঁর কবিসত্তা। যখনই প্রাতিষ্ঠানিক রচনা-অভ্যাসে তিনি পিছলে পড়েছেন, পুনরাবৃত্তির চোরাবালি তাঁকে গ্রাস করেছে। কবিত্বের শোচনীয় অবসাদ শক্তিকে আক্রমণ করেনি কেবল, তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের ধারাবাহিকভাবে সংক্রামিত করেছে। প্রতিষ্ঠানের বিষবীজাণু সাফল্যের ডেলিরিয়ামে তাঁদের আচ্ছন্ন করেছে যত, ততই তাঁরা লেখার সজীবতা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠেছেন। ফলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে কেবলই। কৃত্তিবাস-পরবর্তী কবিদের মধ্যে ভাস্কর চক্রবর্তী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। যতক্ষণ দ্রষ্টা চক্ষুর অবিরল উন্মোচন, ততক্ষণই কবিতার শিল্পসংবিদ অক্ষুণ্ণ। যে-মুহূর্তে নিজস্ব বাক্‌বন্ধের মায়ায় নিজেই মুগ্ধ হতে শুরু

করেছেন, লেখায় ফুটে উঠেছে অবসাদের চিহ্ন। 'রাস্তায় আবার' সংকলনে 'হে জীবন' কবিতায় ভাস্কর যেন বুঝিয়ে দিয়েছেন, কত সাবলীলভাবে জন্ম নেয় লেখা :

'ছুঁয়ে যাই দগ্ধ বাড়িগুলো
ছুঁয়ে যাই মানুষের মুখ
ছুঁয়ে যাই শান্ত ঘণ্টাধ্বনি
ছুঁয়ে যাই সহস্র অসুখ।

....

ছুঁয়ে যাই তোমার দুচোখ
ছুঁয়ে যাই হারমোনিয়াম
ছুঁয়ে যাই ব্যর্থ এ জীবন
হে জীবন তোমাকে প্রণাম!'

তবে, এ সময়ের লেখা ও সাহিত্যের টানাপোড়েন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের কাছে লিখিয়ের আত্মসমর্পণে সাহিত্যিকের কিংবদন্তিতুল্য উত্থান সবচেয়ে ভালো ধরা পড়েছে জয় গোস্বামীর মধ্যে। এমন সম্ভাবনা যেমন বিরল ছিল, তেমনি এমন বিপুল অপচয়ও দেখা যায় না। বহু স্মরণীয় লেখার উদগাতা হয়েও জয়, নিজেরই কবিতার ভাষায়, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতাপের সংঘে 'দুগ্ধপোষ্য' সাহিত্যিকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক রচনাপুঞ্জ অপচয়ের অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত। অথচ 'উন্মাদের পাঠক্রম'-এর 'সৎকার গাথা'র মতো অসামান্য লেখা জয়ের কাছেই পেয়েছি আমরা :

'আমরা সেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম মা-র ভেসে যাওয়া দেহ
সারা গা জ্বলছে বোন তোর মনে আছে
প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ?

দীর্ঘ চক্ষু, রোঁয়া-ওঠা ঘাড় তুলে
এগিয়ে এসেছে অভিজ্ঞ মোড়লেরা
বলেছে—'এ সভা বিধান দিচ্ছে, শোনো—
দাহ করবার অধিকারী নয় এরা।'

সেই রাত্রেই পালিয়েছি গ্রাম ছেড়ে
কাঁধ মা-র দেহ, উপরে জ্বলছে চাঁদ
পথে পড়েছিল বিষাক্ত জলাভূমি
পথে পড়েছিল চুন লবণের খাদ

আমার আঙুল খসে গেছে, তোর বুক
শুকিয়ে গিয়েছে তীব্র চুনের ঝাঁঝে
আহার ছিল না, শৌচ ছিল না কারো
আমরা ছিলাম শববাহনের কাজে

পূর্বদিকে সাদা করোটি রঙের আলো
পিছনে নামছে সন্ধ্যার মতো ঘোর
পৃথিবীর শেষ শ্মশানের মাঝখানে
বসে আছি শুধু দুই মৃতদেহ চোর'

পাঠকের দুর্ভাগ্য, জয় এখন সর্বার্থসাধক সাহিত্যিক হওয়ার জন্যে পণ্যায়নের বিধিবিধান মেনে নিয়েছেন।

বস্তুত ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশ যখন তার সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিছুটান ও আধা-ঔপনিবেশিক প্রাপ্তির লোভ নিয়ে পুঁজিবাদী রূপান্তরের গন্তব্যহীন যাত্রায় প্ররোচিত হচ্ছে—বাঙালি লিখিয়েদের কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে প্রতাপের স্নেহধন্য হওয়ার বাসনা। 'পাখিতীর্থদিনে' সংকলনে গ্রথিত 'মানুষ' কবিতায় মাসুদ এই বাস্তবের প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন এভাবে :

'প্রভুর সর্বশেষ মুখভঙ্গি
নিরিবিলি উঞ্ছজীবিকার স্মৃতি।
খুব ম্রিয়মান হয়ে ধরা দেয় প্রভুর দূরনিয়ন্ত্রণী সংকেত
এখন এতোটা দূরেও প্রাক্তন।'

স্বাধীন অস্তিত্ববিহীন মানুষ কবির কাছে প্রতিভাত হয় 'প্রাণিশূন্য নদীচরে নির্বাসিত একটি বেড়াল। কালো ও নিঃসঙ্গ' হিসেবে। দূরনিয়ন্ত্রণী সংকেতে তার যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হচ্ছে। সুতরাং আজকের লেখা এই নয়া-ঔপনিবেশিক বিপন্নতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায় গ্রহণ না করে পারে না। রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্তের লেখা এই দায়িত্ব বহন করে বলে সাহিত্যিক অভ্যাস ও আকরণকে সার্থক প্রতিস্পর্ধা জানাতে পারছে। পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে অজেয় চেতনা ও বিকল্প গ্রন্থনার সংকেত। মাসুদ খানের 'টানেল' কবিতায়ও তেমনি সংকেত পাই যা কিনা লেখার গৌরব সম্পর্কে নতুন ভাবে আমাদের অবহিত করে তোলে :

'টানেল যে হল বিকল্প মৃত্যুর
হারানো মানুষ টানেল লুকিয়ে ফেলে ;
ঈশ্বর নেবে গণিতের আশ্রয়
সবাই ফিরেছে, ফেরেনি একটি ছেলে।

টানেল জানে না এসব কাহিনী হাবা
বোঝে না যে গতি, রক্তের চলাচল
শুনছো টানেল, ভূতলপৃষ্ঠে জাগে
লুপ্ত মানুষ খুঁজবার কোলাহল।

মৃত্যুতে নয়, টানেলে ঢুকবে এক
স্মরণকালের বিব্রত মৌমাছি

আগুন অসুখ দুই হাতে সব খায়
পাঁক থেকে ওঠা, ক্ষিপ্ত সব্যসাচী।'

এই যে 'লুপ্ত মানুষ খুঁজবার কোলাহল', তা প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যে নেই ; মৃত্যু থেকে জীবনে পৌঁছানোর জন্যে কোনো গোপন সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করার তাগিদও তার থাকে না। এই পথের পাথেয় সংগ্রহ করে শুধুমাত্র লেখা।

৪

এই নিবন্ধের সূচনায় আত্মদ্রোহের প্রদর্শনীতে কন্টকিত বাংলা সাহিত্য জুড়ে লক্ষ করেছিলাম চোরাবালির প্রসার আর ঢোলবাদ্যের কসরত। আশঙ্কা জেগেছিল, লেখা হয়তো নেই কোনোখানে। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক ঔদ্ধত্য সত্য উৎপাদন করে না কেবল, ভালো-মন্দ সার্থক-ব্যর্থ প্রচারযোগ্য-হননযোগ্য ইত্যাদি লেবেলও এঁটে দেয়। কিন্তু এই স্বৈরতন্ত্রী পীড়ন যদি শেষ সত্য হয়, পূর্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের বক্তব্যকে ফাঁপা আশাবাদ ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। কিন্তু তা তো নয়। সমান্তরাল অপর হিসেবে লেখার অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে। কেননা পীড়ন যেখানে বেশি তীব্র, প্রতিরোধও সেখানে তত অনিবার্যভাবে উপস্থিত। এমন যদি না হত, 'মানুষ' কথাটা চিরদিনের মতো অর্থহীন হয়ে পড়ত। তবে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে লেখাকে কেবল সারস্বত আকাঙ্ক্ষা বা বৌদ্ধিক চর্যা হয়ে থাকলে চলবে না। আক্রমণ যখন সার্বিক, প্রতিরক্ষা ও প্রত্যাঘাতকে একই ভাবে সার্বিক হতে হচ্ছে। কোনো আভিজাত্য অর্জনের জন্যে নয়, লেখাকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে অসম যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্যে। চক্রব্যূহে অভিমন্যু যতখানি একাকী ছিল, তার চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ আজকের লিখিয়ে-যোদ্ধা। কারণ, ভাষা-প্রকরণ ভাষা-চরিত্র ভাষা-অনুষঙ্গ—সব কিছুকে সন্দেহ করে, পরখ করে, অন্তর্ঘাত করে সমাপ্তিবিহীন সম্ভাবনার উপকূল খুঁজে চলেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে সুবিমল মিশ্র 'সত্য উৎপাদিত হয়'-এর প্রতিবেদনে (১৯৯৭ : ২১) খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন : 'গেরিলা শব্দ প্রয়োগ একজন লেখক-কর্মীকে প্রলেতারিয়েত করে তোলে এবং অবশ্যই পরিমাণগত ভাবে, ইনটেলেকচুয়্যাল আভিজাত্যের বিলোপ সাধন করে। কেননা সে মনে করে হিংসা, অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এসব আসলে এখনকার এই 'পৃথিবীতে শান্তি শৃংখলা এবং স্বাভাবিকতার সমার্থক শব্দ। আস্তে আস্তে সে এইভাবে ফাঁস করে দিতে তাকে এই সভ্যতার লগ্নি ও সঞ্চয়ের লুকানো খেলাগুলি, আপাতভাবে...'!

লেখা তাহলে গেরিলাযুদ্ধ। হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। কারণ, স্থিতাবস্থার শৃঙ্খলকে পোক্ত করার যাবতীয় আয়োজন যখন করতে থাকে সাহিত্যের ছদ্মবেশে আবৃত উৎপীড়ক প্রাতিষ্ঠানিকতা, তখন অবক্ষয় ও বিকারের বিপক্ষে স্পষ্ট দাঁড়াতে পারাই মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান। কোনো সংশয় নেই যে ভয়াবহ ও নির্লজ্জ এই 'বাণিজ্যযুগে ভাষার রহস্যময়তাও পণ্য আর পণ্যধর্মিতায় আর যাই থাক, কোনো রহস্য থাকে না'। অতএব কবিতায়, আখ্যানে বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানে সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে আধিপত্যবাদীদের চক্রান্ত প্রত্যাখ্যান করা। ভেড়ার পালের মতো ভিড়ে মিশে না গিয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে মিথ্যা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এর নাম লেখা, এর নাম তাৎপর্যের জন্যে যুদ্ধ।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ভাবাদর্শ

'শিল্পীকে কী ভাব তোমরা? নিছক জরদ্‌গব—যদি চিত্রকর হয়, শুধু চোখ আছে? যদি গাইয়ে হয় শুধু কান কিংবা যদি কবি হয়, তাহলে মনের প্রতিটি স্তরে একটা বীণা? কিংবা ধরো, মুষ্টিযোদ্ধা হলে নেহাত কিছু পেশি? একেবারে উল্টো। একই সঙ্গে শিল্পী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব—হৃদয় বিদারক, উত্তেজক বা সুখপ্রদ ঘটনার প্রতি যে সবসময় সজাগ—সমস্ত রকম ভাবে সে এদের ডাকে সাড়া দেয়। এটা কী করে সম্ভব যে অন্য কোনো মানুষ সম্পর্কে সে কোনো আগ্রহ বোধ করবে না? জীবনকে যে এত আন্তরিকতা দিয়ে তোমাদের সামনে তুলে ধরছে—কী করেই বা সে জীবন থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখবে? না, ঘর সাজানোর জন্যে ছবি আঁকা হয় না। শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে বা শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছবি আসলে যুদ্ধের হাতিয়ার।'

এই অসামান্য কথাগুলি যাঁর, তিনি বিশ শতকের কিংবদন্তি শিল্পী পাবলো পিকাসো। ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নির্দেশে জার্মান বিমান বাহিনী স্পেনের ছোট্ট শহর গুয়ের্নিকার উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে তাকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছিল। আর, এর ঠিক ছদিন পরে পিকাসো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ম্যুরালের কাজ আরম্ভ করেন। বোমাবিধ্বস্ত গুয়ের্নিকার নামে ছবিটির নাম রাখেন তিনি। এতে প্রমাণিত হয়েছিল, মানুষের সপক্ষে ও অন্ধকারের অপশক্তির বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাই শিল্পীর প্রধানতম দায়িত্ব। একুশ শতকের প্রথম বছরে আফগানিস্থানের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, শিশুদের পাঠশালা যখন শক্তি-দম্ভে উন্মাদ মার্কিন বোমায় ও ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস হয়ে গেল—পিকাসোর উত্তরাধিকারীরা কোথায় ছিলেন? তবে কি চৈতন্য পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছে আমাদের?

এই আর্ত প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছে কয়েক বছর ধরে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভিন্ন মতবাদের অধিকারকে নির্মম তাচ্ছিল্যে অস্বীকার করে ইঙ্গ-মার্কিন সমরশক্তি যখন ইরাকের জনপদের পরে জনপদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেয়—বেয়নেটের বিরুদ্ধে ফুল ও পায়রা ছুঁড়ে দেওয়ার মতো কোনও সংস্কৃতি-কর্মী কি থাকে না কোথাও?

এই জিজ্ঞাসা থেকে ফিরে যেতে হয় মৌলিক আদি-প্রশ্নে : সংস্কৃতি কি? সাংস্কৃতিক আন্দোলন কেন, কাদের জন্যে? এতে ভাবাদর্শের গুরুত্ব কোথায়? না, এ আদপেই কোনও তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, অত্যন্ত জরুরি প্রায়োগিক বাস্তবের বিষয়। কিছুদিন থেকেই বেশ কিছু কথা মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। আমাদের এই প্রান্তিক বরাক উপত্যকায় যেমন, তেমনই উদ্ভাসিত কোনও অঞ্চলেও যাঁরা গানে-নাচে-নাটকে অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রগতিশীল মর্মবস্তুর পোষকতা করেন, তাঁদেরই কেউ কেউ ব্যক্তিগত

আলাপচারিতায় বলেন, না বাপু, রাষ্ট্রক্ষমতায় কারা এল বা কারা গেল, তাতে আমাদের কী, আমরা তো গাইব, লিখব, নাটক করব ; সাংস্কৃতিক দায়িত্ব আন্তরিকভাবে যদি পালন করি, রাজনীতির মার-প্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? কিংবা রাষ্ট্র-ক্ষমতা যাদের দখলে গেছে, তাদের কাছাকাছি থাকলে আমাদের সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে যদি সুবিধা হয়, তাহলে ক্ষতি কী? আমরা তো কৌশল হিসেবে সমঝোতাকে মান্যতা দিচ্ছি। সাময়িক ঝড় যদি উঠে থাকে সমাজে, উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে না-হয় আত্মরক্ষাই করলাম। অন্তত ঝড়ের মুখে কুটোর মতো ভেসে তো যাইনি।

এইসব গাইয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়েদের সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মে আন্তরিকতায় কিন্তু কোনও খাদ নেই। অথচ এঁরা মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার। এঁরা আসলে ভাবাদর্শের অনস্বীকার্য অস্তিত্বের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করেননি। আবার এইসব আন্তরিক অথচ বিভ্রান্ত সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে গিয়ে কোনও কোনও সংস্কৃতি-সেনানী নিজের অগোচরেই আত্মিক অবসাদের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। ভাবাদর্শের উত্তাপও তাঁদের আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। তখন মধ্যাহ্নে সূর্যাস্তের উপক্রম হয়। কেন এমন ঘটে? ঘটে এইজন্যে যে প্রাগুক্ত দু-ধরনের কূটাভাস শেষোক্তদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিকেও একটু একটু করে শিথিল করে দেয়। যাদের সাহচর্যে সংস্কৃতির যুদ্ধ শানিততর হওয়ার কথা ছিল, তাদের পিছিয়ে পড়া কিংবা সাফল্যের হাতছানিতে মুগ্ধ হওয়া অনুভব করতে করতে এঁরা মানবিক উত্তরণ সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। অথচ নিজেদের কাছে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্টতা স্বীকারও করতে পারেন না। এই অন্ধবিন্দু মূলত সময়েরই সংকট, এটা অনুভবে জেনেও ভাবাদর্শের জোর ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। আর, তেমন মুহূর্তে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যাতে বহুদিনকার সাংস্কৃতিক উদ্যম এবং সেই উদ্যমে তাঁদেরই গৌরবজনক ভূমিকা নিরাকৃত হয়ে যায়। এ আসলে ব্যক্তিবাদী ঝোঁকের এমন একটি ধরন যা সাধারণত বিশ্লেষণের বিষয় হয় না।

২

একুশ শতক যে নির্মানবায়ন, নিশ্চিহ্নায়ন ও ভাবাদর্শ-রিক্ততার অন্ধকূপ হয়ে উঠবে—তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। অতএব সংস্কৃতি কী ও কেন—অনেক পুরনো এই প্রশ্নের সময়োপযোগী মীমাংসা চাই। এ চেষ্টা তাত্ত্বিকেরা করতেই পারেন ; কিন্তু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যা অনুভব করছি, তা-ই মাননীয়। কেননা সংস্কৃতি মানে উপস্থাপনার কৃতি। অতএব সক্রিয় হতে গিয়ে যদি মঞ্চশোভন হওয়ার নেশায় মদির হই এবং প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার তাড়নায় পণ্যায়নের যুক্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে আপস করি—তাহলে সর্ষের ভেতরে ভূত ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কাই সত্য হয়ে উঠবে। এইজন্যে আদি-প্রশ্নটির উত্তর একই সঙ্গে সরল ও জটিল। যদি ভাবি, সংস্কৃতি মানে নাচ-গান-ছবি-কবিতা-নাটক কিংবা সমস্যাদীর্ণ পৃথিবী থেকে ছুটি নিয়ে বিনোদনের মুহূর্ত-যাপন : তাহলে একে বলব সরল উত্তর। একে মিথ্যা বলা যাবে না হয়তো কিন্তু

তা পুরোপুরি সত্যও নয়। সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক থাক আপাতত। তবে একটা কথা নিশ্চয় বলা যায় : সংস্কৃতি মূলত সময়ের দর্পণ, সময়ের সন্তান। যদি বলি, সময়ে তো বিদূষণও থাকে. তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এও বলা প্রয়োজন যে দূষণ মুক্তির স্বতশ্চল আয়োজন সময়ের ভেতর থেকেই উঠে আসে। সংস্কৃতিতে মাঝে মাঝে বিপন্নতার কালো ছায়া ঘনিয়ে এলেও দ্বিবাচনিকতার অমোঘ নিয়মে সূর্যালোকের স্বচ্ছতাই তার স্থায়ী ভাব।

প্রতিদিন নতুন সূর্য উঠে আসে। নতুন দিন মানে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি। অভিজ্ঞতা অনবরত পাল্টে যাচ্ছে, অতএব সংস্কৃতি-চেতনাও বদলে যাচ্ছে ক্রমাগত। এই পরিবর্তন বিষয়-বস্তুতে ধরা পড়ে সহজে, প্রকরণে বদল ঘটে দেরিতে। জীবন-পথে চলতে চলতে আমরা সঞ্চয় করি, প্রকাশের তাগিদ অনুভব করে সেই সঞ্চয়কেই আবার পরখ করে নিই। যা কিছু আমাদের জীবনের এগিয়ে যাওয়ার গতি ও আগ্রহের সঙ্গে মানানসই নয়, তাকে ত্যাগ করি ; ততটুকুই ধরে রাখি যা চলমান সময়ের সঙ্গে থাকে। সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ, অপরাজেয় মানুষ ; বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে সংঘর্ষে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়ায়, একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার সামনে এসে দ্বিধা ও সংশয় বোধ করে, সাময়িক পরাজয় হলেও পর্যুদস্ত হয় না কখনও। গভীর-গভীরতর অন্ধকারের পর্যায়ের পরেও কতবার মানুষ তাই নতুন আলোর ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। এই পথ চলা ও আলোয় ফেরার আনন্দ-ই হল সংস্কৃতি।

শুধুমাত্র এই সংস্কৃতির অমেয় শক্তিতেই মানুষ পশুর চেয়ে আলাদা। মানুষের মধ্যে কিন্তু জান্তব পিছুটান রয়ে যায় যা আজকের ভোগবাদী সমাজে অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকট। জান্তব প্রবৃত্তির লজ্জাহীন অভিব্যক্তি ইদানীং সভ্যতার সমার্থক হয়ে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষের চেতনাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিচ্ছে। এটাই সবচেয়ে শঙ্কার কারণ। ব্যক্তি-সর্বস্বতার সাম্প্রতিক উৎকট পর্যায়ে অন্ধ প্রতিযোগিতা শুধু নিজেকে জাহির করার জন্যেই। এহেন পরিস্থিতিতে তাকেই বলব সাংস্কৃতিক রুচিসম্পন্ন মানুষ, যে সমষ্টি-চেতনায় দীক্ষিত হয়ে নিজেকে মুছে ফেলতে জানে। তার মানে অবশ্য ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করা নয়, সমষ্টির সঙ্গে দ্বিরালাপে ব্যক্তির ক্রমিক ঊর্ধ্বায়ন। এইজন্যে সংস্কৃতি এক যুদ্ধের নাম, বলা ভালো, যুদ্ধ-প্রস্তুতির নাম। এই লড়াই প্রথমত নিজের সঙ্গে বলে সচেতন ভাবেই লড়াই জারি রাখতে হয়। যে-পরিমাণে মানুষ জান্তব প্রবৃত্তির হাতছানি এড়িয়ে নিজেকে উত্তরায়নের পথে সঞ্চালিত করে—ঠিক ততটাই গড়ে ওঠে তার রুচি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার সংস্কৃতি। এইজন্যেই সংস্কৃত ভাষার এক কবির বয়ান অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বড় প্রমাণ হল তার সংস্কৃতি-চেতনা। মানুষের মধ্যে যেহেতু অনবরত চলে পশু-সত্তার আনাগোনা, সংস্কৃতি দিয়েই মানুষের অবমূল্যায়ন রোধ করতে হয়। বিশেষত কোনও সামাজিক দুর্যোগের মুহূর্তে বহুযুগের জমে-ওঠা অন্ধকার যখন পশুর হিংস্রতা নিয়ে মানুষের পৃথিবীকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে—তখনই টের পাওয়া যায়, সংস্কৃতির কত প্রয়োজন। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের পরে ভারতবর্ষ যেমন টের

পেয়েছিল। বুঝেছিল, সংস্কৃতি নিছক কবিতা-নাটক-গান-গল্প-ছবি কিংবা আত্ম-সন্তুষ্টির আয়োজন নয়, সমস্ত কুশ্রীতা ও আত্মিক দৈন্যের আস্ফালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের তীক্ষ্ণ অস্ত্র। এই অস্ত্র ব্যবহার করতে গিয়েই বেঞ্জামিন মেলোয়েজ, সফদার হাসমি, ব্রজলাল অধিকারীর মতো সংস্কৃতি-যোদ্ধারা ইতিহাস হয়ে যান। এই অস্ত্র সম্বল করেই পল রোবসন, পিট সিগারেরা দেশ-জাতি-ভাষা-ধর্ম-বর্ণের সীমানা পেরিয়ে যান অনায়াসে।

৩

আধুনিকতা যখন অবক্ষয়বাদের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছিল, ভাবাদর্শকে নস্যাৎ করার জন্যে কখনও ঠাট্টা-মস্করা আর কখনও ধূর্ত অপতত্ত্ব ব্যবহার করার প্রবণতা ছিল। সংস্কৃতিকর্মীদের দায় শুধু নাচ-গান-নাটক আয়োজনের উপযোগী সংগঠন করেই ফুরিয়ে যায়নি ; প্রগাঢ় আবেগে বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কর্তব্য শেষ হয়নি। তাঁদের সতর্ক থাকতে হয়েছিল অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের প্রকাশ্য ও গোপন সন্ত্রাস সম্পর্কেও। জীবন-যাপন ও সমাজ-সংস্থানের প্রতিটি স্তরে সর্বাত্মক সংগ্রাম অব্যাহত না রাখলে যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আত্মরতির মোহিনী মায়া ছড়িয়ে আধিপত্যবাদ কত প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন সংস্কৃতি-সেনানীকে পথভ্রষ্ট করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। আবার গণনাট্য আন্দোলনের উপলবন্ধুর পথ চলার ইতিবৃত্ত যদি লক্ষ করি, দেখব, ভোগবাদ ও পণ্যায়নের অজস্র চোরা-ফাঁদ এড়িয়ে গিয়েই জনতার মুখরিত সখ্যকে তা ধ্রুববিন্দু করে নিতে পেরেছে। গত ছয় দশকে ভাবাদর্শকে নাকচ করার কম আয়োজন ছিল না। তবু পথে নেমে পথ চিনে নেওয়ার প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। বিশেষত গত এক দশকে আধুনিকোত্তরবাদী পর্যায়ের বৌদ্ধিক সন্ত্রাস ও প্রতিভাবাদর্শের আক্রমণ মোকাবিলা করতে গিয়ে সংস্কৃতির যুদ্ধ পুরোপুরি নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। নিঃসন্দেহে সময় এখন আরও জটিল আবর্তময়। তাই সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের নিবিড় গ্রন্থনার তাৎপর্য বোঝার জন্যে নতুন নতুন প্রায়োগিক কৃৎকৌশল আবিষ্কার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। যুদ্ধটা যখন নতুন, যুদ্ধের পুরোনো আয়ুধও অচল। ইদানীং সংশয় ও আপস যেভাবে আত্মিক আঁধি তৈরি করছে, তাতে মনে হয়, পীড়া সংক্রমণের কারণগুলিকে এবার নতুন চোখে দেখা শুরু করতে হবে। আর, সেইসঙ্গে পীড়া উপশমের জন্যে এবং সংস্কৃতিচর্যার মধ্যে ভাবাদর্শের নির্যাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পুরোপুরি নতুন ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে।

বয়ানে কি ঔচিত্যের প্রসঙ্গ বেশি চলে এল! আসলে ঔচিত্যবোধ মানেই প্রত্যাশার নতুন দিগন্ত আর উদ্ভাসনের নতুন পরম্পরা। সংস্কৃতি-কর্মীরও তো স্পষ্ট একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য সম্পর্কিত ধারণাকে মাঝে-মাঝে পুনর্নবায়িত করে নিতে হয়। নইলে নিজেদের অগোচরে আত্মিক অবসাদ তৈরি হবে ; ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যে আকস্মিকভাবে দেখা দেবে অনন্বয়ের কুয়াশা। অতএব পুরনো বোতলে নতুন পানীয় নয়, নতুন আধারে নতুন আধেয় পরিবেশন করার জন্যে সংস্কৃতিকর্মীদের সব সময়

জেগে থাকতে হবে। এখানেই ভাবাদর্শ খুব প্রাসঙ্গিক, কারণ ভাবাদর্শ মানে যা আমাদের জাগিয়ে রাখে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি গান ব্যবহার করে বলা যায়, হিমের রাতে গগনের দীপগুলিকে হেমন্তিকা যখন আড়াল করে—তখন তা ঘরে-ঘরে বার্তা পাঠায় : জ্বালাও আলো আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীকে! আধুনিকোত্তর পণ্য-সর্বস্ব জগতে সংস্কৃতিকর্মীকে লক্ষ করতে হয়, কীভাবে তাঁর জগৎকে প্রতিজগৎ ও বাস্তবকে প্রতিবাস্তব করে তোলা হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। বস্তুত একই সঙ্গে ইদানীং তাঁকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে ভাবাদর্শহীনতা ও প্রতিভাবাদর্শের সঙ্গে। চূড়ান্ত ভোগবাদী অন্ধ সমাজ যখন প্রতিদিনই চোরাবালির পরিধি বাড়িয়ে চলেছে, উপগ্রহ-প্রযুক্তির বিশ্বায়ন হওয়ার ফলে দূরদর্শন ও কম্পিউটার ঘরে-ঘরে নিয়ে আসছে জ্ঞানশূন্য তথ্যের বুদ্বুদ ও রঙিন মিথ্যায় ভরা বিনোদন—সংস্কৃতি-কর্মীর যুদ্ধ এখন মঞ্চ থেকে সরে এসেছে প্রতিটি গৃহকোনে।

এ সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ানোর নয়। এ সময় নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে শান দেওয়ার। একথা মনে রেখে, যুদ্ধ কেবল বাইরে নয়, যুদ্ধ ভেতরেও। যুদ্ধ প্রকাশ্য নয় শুধু, যুদ্ধ গভীর গোপনেও। একবার যে সংস্কৃতির গাণ্ডীব তুলে নিয়েছে হাতে, অক্ষয় তূণীরের সমর্থন সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও ভরসা হারালে চলবে না তার। নিজেকে অনেক সময় আমরা নিজেরাই প্রতারিত করি, কুযুক্তিকে ভাবি যুক্তি, পিছিয়ে-পড়াকে ভাবি রণকৌশল। ভুলে যাই, একটি পথই খোলা সংস্কৃতি-কর্মীর : সে-পথ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। থমকে দাঁড়ানো মানে পেছন-পায়ে হাঁটা, সে-পথ অন্ধকার কৃষ্ণবিবরে নিয়ে যায় শুধু। সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্জন, সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়ে তা সংস্কৃতিকর্মীকে শেষ পর্যন্ত প্রতিভাবাদর্শের অন্ধকূপে বন্দী করে ফেলে। আধুনিকতাবাদী বিমানবায়নের বিরুদ্ধে যাঁর ঘোষিত যুদ্ধ ছিল, আধুনিকোত্তর নির্মানবায়ন পর্যায়ে তিনি কি যুদ্ধকে অস্বীকার করবেন? কল্পিত কিংবা বাস্তব কোনও অজুহাতে আত্মপ্রতারক যুক্তিশৃঙ্খলা সাজিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবেন? তাহলে সেই পুরোনো প্রশ্নেই তো ফিরে যেতে হয় আবার : সংস্কৃতি তবে কী? সাধারণভাবে সংস্কৃতির এবং বিশেষভাবে গণনাট্যের ইতিহাস প্রমাণ করে : মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিকতার সেতু যখন কালো মেঘের ছায়ায় আবিল হয়ে ওঠে, সে-সময় সংস্কৃতিই নিয়ে আসতে পারে সূর্যোদয়ের অরুণাভাস। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনে কত গান কত নাটক সৃষ্টি হয়েছিল আজও যা আমাদের প্রেরণা দেয়। সংগ্রাম ও সৃষ্টির যুগলবন্দিতে প্রমাণিত ভাবাদর্শের অপরিহার্যতা। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ও আগ্রাসী নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ আজ যদি তুঙ্গে ওঠে, সংস্কৃতি কখনও পিছিয়ে থাকতে পারে না কিংবা দ্বিধাগ্রস্তও হতে পারে না।

৪

পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতিই ফিরিয়ে আনতে পারে মানব-সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও মানবিক বিকাশের ধারাবাহিকতা। রুটির লড়াই থেকে রুচির লড়াই যে আলাদা নয়,

এই উপলব্ধি জাগাতে পারে সুস্থ সংস্কৃতি-চেতনা। 'সুস্থ' শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ সংস্কৃতির নামে পঙ্গু, অবান্তর ও বকচ্ছপ ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে অসুস্থতার বিকার মানবিক বিকাশের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের আচার আচরণে, সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় ওই বিকার খুব দ্রুত শেকড় ছড়ায় আজও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বোধ নিতান্ত বাইরের প্রচ্ছদ হয়ে থাকে। বিপদের এই একটা দিক। আবার, বিপদের অন্য আরেকটা দিক হল, সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে চিন্তার স্বচ্ছতা কখনও কখনও হারিয়ে যায়, কূপমণ্ডূক অভ্যাসের সঙ্গে আপস করতে করতে লড়াইয়ের ইচ্ছাও বজায় থাকে না। শুরুতে লিখেছিলাম, সংস্কৃতি সময়ের সন্তান এবং সময়-প্রহরী। এখানে আরেকটি কথা বলা যাক, সময়েরও রয়েছে দুটো অবয়ব ও স্বভাব। আপাতকাল ও প্রকৃতকাল বলে এদের চিহ্নিত করতে পারি। সংস্কৃতি যেহেতু নীতি ও কৌশলের ওপর নির্ভরশীল, আপাতকাল থেকে অর্জিত প্রতীয়মান অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতকাল সম্পৃক্ত উপলব্ধির দ্বিরালাপ সম্পর্কে সংস্কৃতিকর্মীর সচেতন থাকতেই হয়। প্রতীয়মানের প্রতি মনোযোগী হওয়াটা কৌশলের অঙ্গ, কিন্তু এইজন্যে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় উদ্যম সঞ্চালিত করার নীতি সম্পর্কে শিথিলতা দেখানো চলে না। কিন্তু আমাদের চারপাশে মাঝে মাঝে দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যা অতিসরলীকরণের সংক্ষেপিত পথে চটজলদি জনতা-সফল হতে চায়।

সমসাময়িক সমস্যার মনোরঞ্জক সমাধানের আত্মপ্রতারণায় এবং গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা ও উপলব্ধির অভাবে মোটা দাগের পথ ধরে চলতে চান কেউ কেউ। এদের সংস্কৃতি-চিন্তায় তাৎক্ষণিকের দাবি মেটানোর তাগিদ অত্যন্ত প্রবল বলে স্ফুলিঙ্গ-ধর্মী আয়োজন উড়ে গিয়েই ফুরিয়ে যায়। পথ তাই হারিয়ে যায় নিশ্ছিদ্রভাবে অন্ধকারে। গভীরে হাত রাখতে এরা অপারগ, মঞ্চসাজ তাই ভেঙে যায় বারবার। সংস্কৃতিকর্মীদের এখনও সমাজ আলাদা চোখে দেখতে চায়। মঞ্চের বাইরে ও ভেতরে মানুষটি একই রকম কিনা—তা বুঝতে চায়। গানে-নাচে-নাটকে যে-বিশ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই ভাবাদর্শের উপযোগী আচরণ সংস্কৃতিকর্মীদের জীবন-যাপনে পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তা সমাজের সদা সতর্ক চোখ লক্ষ করে যাচ্ছে। তাই সাংস্কৃতিক চর্যা ও জীবনচর্যায় একই ভাবাদর্শের বিচ্ছুরণ না ঘটলে সংস্কৃতি হয়ে থাকবে নিছক প্রেক্ষাগৃহে পিঞ্জরায়িত। অতএব সব সংস্কৃতিকর্মী সময়-সেনানী নন ; তাঁদের মধ্যেও রয়েছে আপাত ও প্রকৃতের বিভাজন। প্রকৃত সংস্কৃতিকর্মী তাঁরাই, যাঁরা অজ্ঞাতসারেও রক্ষণশীল অচলায়তনের গ্রাসে পড়েন না এবং যে-কোনও মূল্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। তাঁরা প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমনস্ক। তাঁরা জানেন, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হলেও তাতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, নানা কৌনিকতা, নানা চড়াই-উৎরাই। তাঁরা এও জানেন, ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেই সংকট ; নিজেকে 'বিরূপবিশ্বে নিয়ত একাকী' ভেবে নিজের মুদ্রাদোষে নিজেরই শুধু আলাদা হয়ে যাওয়া।

অথচ মানুষ নিজের শ্রমে সভ্যতার যে-ইমারত গড়ে তুলেছে, তা যৌথ জীবন-যাত্রা ও যৌথ উদ্যোগের ফসল। মানুষ যখন একাকী, মূলত তখনই সে বিভ্রান্ত। তাই শুভ

কর্মপথে চলতে চলতে তাকে অবসর যাপন বা বিনোদন করতে হয়েছে যৌথভাবে, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলেছে যৌথ উৎসব ও যৌথ সংস্কৃতির রীতিনীতি। সময়ের সঙ্গে পাকে-পাকে বাঁধনে জড়িয়েছে নিজেকে, আবার বাঁধন খুলতে খুলতে এগিয়েছে। মাটিতে পা রেখে তার আকাশপানে চাওয়া, আবার আকাশ বিহারে ক্লান্ত হয়ে মাটির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে আসা। ব্যক্তি যুক্ত হতে চায় সমষ্টির সঙ্গে, কিন্তু বিযুক্তির যন্ত্রণাও সইতে হয় তাকে। জীবন চায় বিস্তার অথচ পদে পদে কেবলই সংকোচন, বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর ভ্রূকুটি। সময়ের যে-যাত্রার কথা একটু আগে লিখেছি, তার মধ্যে কোনটা চিরকালীন আর কতটাই বা চিরকালীনতা, মানুষই তার রুচি ও প্রয়োজন মাফিক ঠিক করে নেয়। তার সংস্কৃতি-চিন্তায় তাই কিছু কিছু ধ্রুববিন্দু অর্থাৎ ভাবাদর্শের গ্রন্থনা থাকবেই পুড়েও যা পোড়ে না, বিক্ষত হয়েও যা বিদীর্ণ হয় না। আবার সমসাময়িক অভিজ্ঞতাও উপেক্ষা করা চলে না। মান্যতা দেওয়ার জন্যে নয়, অবহিত হওয়ার জন্যেও। কিন্তু যৌথ উপলব্ধি ও যৌথ উদ্যোগে যেসব সংস্কৃতি-যোদ্ধারা বিশ্বাসী, তাঁরা 'ক্ষণিকের মুঠি দাও ভরিয়া' বলে থেমে যান না ; প্রকৃত কালের চিহ্নায়কগুলিকে শনাক্ত করতে চান। নইলে মন্থর হবে যে মানুষের এগিয়ে যাওয়ার গতি, ক্ষণকালের প্রতি অতি প্রশ্রয়ে সহস্র শৈবালদাম এসে বাঁধবে স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষাকে—এসম্পর্কে তাঁরা সচেতন। তাই তাঁদের সংগ্রাম নিরন্তর ভেতরে ও বাইরে চলতে থাকে ভাবাদর্শহীনতার নৈরাজ্য ও প্রতিভাবাদর্শের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। চলতে থাকে আত্মদীপ হয়ে ওঠার জন্যে, বহুবাচনিক জগতের দীপাধার হওয়ার জন্যে। তাঁদের দায়বদ্ধতা সেই সৃষ্টির কাছে যা দ্বন্দ্বময় সংগ্রামের ভাষা, আবার সেই সংগ্রামের কাছেও যা সৃষ্টির প্রেরণায় ছন্দোময়।

সংস্কৃতি কেন : এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর চাইতে গেলে আগে ঠিক করে নিতে হবে আমাদের বিশ্ববীক্ষা কী? অর্থাৎ কোন দৃষ্টিতে জীবনকে দেখছি আমরা? বাস্তব অভিজ্ঞতার বাস্তব বিশ্লেষণ করছি নাকি মনগড়া ভাবনায় বুঁদ হয়ে কল্পলোকের কথকতা করছি! এবং, করছি কাদের স্বার্থে? সংস্কৃতি-চর্চায় আমরা যদিও স্বাধীনতার দোহাই দিই, আসলে আমরা কতটা স্বাধীন! অর্থাৎ কোনও অদৃশ্য বাজিকরের পুতুল-নাচনের খেলায় মোহগ্রস্ত হয়ে আমরা নাচন-কোঁদন করা পুতুলদের মধ্যে ঢুকে পড়িনি তো! একদিকে সাগর-পারের মুরুব্বিদের চোঁয়া ঢেঁকুর এবং অন্যদিকে স্বদেশি মৌলবাদী পাঁচন—এতদিন এদের সঙ্গে সহাবস্থান করে এবার কীভাবে সম্মিলিত ফ্যাসিবাদী ফাঁস এড়িয়ে যাব? নতুন সময় মানে নতুন ফাঁদ এবং নিশ্চয় ফাঁসুড়েদের আক্রমণ প্রতিহত করার নতুন কৌশলও। নতুন সময়ে নতুন ভাবে নির্ণীত মূল্যবোধের জন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষাকেও নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নিতে হবে। কতদিন আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াইনি। নিত্য নতুন মুখোশ পরার প্রবণতায় আমরা নিজেরাই প্রকৃত মুখকে ভুলে থেকেছি কতদিন! ফাঁপা বৌদ্ধিকতার গর্বে চলিষ্ণু জনতার জীবন-প্রবাহ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক চেতনাকেও লাঞ্ছিত করেছি। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয়কে আমরা যদি যথাপ্রাপ্ত বাস্তব বলে মান্যতা দিই, তাহলে তা তো বৈধতা পাবেই।

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ক্ষয়িষ্ণুতার টীকা-টিপ্পনি- ভাষ্যের-কূট-কচালিতে ব্যস্ত রয়েছেন। অথচ ব্যাপক জীবন-বিরোধী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ অস্পষ্ট ছিল না কখনও। মুনাফা-লোভী সামাজিক বর্গের প্রয়োজনে সমস্তই পণ্য। দ্রুত পণ্যায়নের জন্যে সস্তা ও প্রগলভ চালাকি নিরঙ্কুশ এখন। মুখ সত্যিই ঢেকে গেছে বিজ্ঞাপনে।

৫

সংস্কৃতির সুপেয় ধারাকে মরুপথে চালিয়ে দিয়ে বিষাক্ত অপেয় করে তোলা হচ্ছে। মুষ্টিমেয় পরশ্রমজীবীর বিনোদন-সামগ্রী হিসেবে সংস্কৃতির আদলমাত্র অটুট রেখে নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে তার খোলনলচে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। উৎকট পণ্য হয়ে ওঠার জন্যে প্রকরণের উদ্ভট সপ্রতিভতাই যথেষ্ট। শাসক-প্রভুর উচ্ছিষ্টজীবী কৃষ্টি-ব্যবসায়ীদের মর্জিমাফিক উৎপাদিত হচ্ছে না-সংস্কৃতি। গণ-মাধ্যমগুলির উপরে একচেটিয়া দখলদারির সুবাদে সাধারণ মানুষের রুচিবোধ ও জীবনভাবনা এখন এদের লাগাতার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এখন তৃষ্ণার আরেক নাম পেপসি, উচ্ছলতার আরেক নাম কোকাকোলা। এরকম অজস্র পণ্যনাম দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে দৈনন্দিনের নামাবলী। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচতুর ভাবে কৃষ্টির একটা আদল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাণিজ্যে।

এমন একটা সময় ছিল যখন বিনোদন মানে নিছক সুখের আবেশ ছিল না, তা ছিল গণমনের প্রকাশেরও মাধ্যম। কিন্তু এখন বিনোদন মানে শুধু পণ্য। যৌথচেতনায় আলোড়ন তোলে না আর পণ্যায়িত না-সংস্কৃতি। সর্বজনীন গ্রহীতার বদলে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ একক গ্রহীতার আত্মরতির সহায়ক হওয়াই তার অন্বিষ্ট। এতে অবশ্যম্ভাবী সংযোগের সামাজিক ও নান্দনিক তাৎপর্য হারিয়ে যাওয়া, ভাবাদর্শের অবান্তর হয়ে যাওয়াও। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেহেতু পৌঁছে গেছে ছদ্ম-সংস্কৃতির মাদক, চিরাগত পরম্পরা ধ্বস্ত হয়ে গিয়ে চিন্তা-চেতনার অনন্যতা দ্রুত মুছে যাচ্ছে। সংস্কৃতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে সত্য-মিথ্যা-ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায়ের প্রসঙ্গ। জানি, 'মেঘ ক্ষণিকের চিরদিবসের সূর্য', কিন্তু এই উচ্চারণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে তো চলবে না। সূর্যোদয়কে ত্বরান্বিত করা আমাদেরই দায়। অন্ধকারকে অন্ধকার বলে চিহ্নিত যেমন করব, তেমনি তার বিরুদ্ধে প্রত্যয় ও উদ্যম গড়ে তোলার জরুরি দায়িত্বটি এড়িয়ে যাব না। ভুলব না যে সংস্কৃতির প্রশ্নটি আসলে মানুষের সপক্ষে দাঁড়ানোর প্রশ্ন, জীবন ও জগতের নিরন্তর পুনর্নির্মাণের প্রশ্ন, ভাবাদর্শের তাৎপর্য বুঝে নিয়ে তার প্রতি অবিচল থাকার প্রশ্নও।

আর, ঠিক এখানেই সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রাণবান করার জন্যে জোট বাঁধার প্রশ্নটি এসে পড়ে। কী ও কেন আসলে একসূত্রে গাঁথা। বৃহত্তর জনজীবনের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতে চাই আমরা, সুস্থ ও উদ্দীপ্ত জীবনবোধে অনুপ্রাণিত সংস্কৃতি আমাদের পাথেয়। মূলপথের পাশ কাটিয়ে শাখা-পথ ধরে যাঁরা তথাকথিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান, তাঁরা ভ্রান্ত। স্রোত যদি ভুল উচ্ছ্বাস তৈরি করে, প্রাণপণ শক্তিতে যেতে হবে

স্রোতের উজানে। দেশ-কাল সাময়িক উত্তেজনায় ভুল আবেগ তৈরি করতেও পারে, জনমানসে দেখা দিতে পারে ঘুম-পাড়ানো নিদালির ঘোর ; ক্রান্তিকালে এরকম হতেই পারে যে আঁধিতে আলোকরেখা আচ্ছন্ন হচ্ছে এবং সাময়িক সুবিধার হাতছানিতে, এমন কি, পিছিয়ে-পড়াকেও মনে হতে পারে এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্‌শর্ত। প্রগতির নামে প্রতিগতির কাছে নিজেদের বিশ্বাসকে হার-মানানোর এই ভয়ংকর পরীক্ষার মুহূর্তে সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমাদের দৃঢ় ও অবিচল রাখতে পারে। যদি কখনও এমন হয় যে সর্বতোভাবেই অন্দরের সঙ্গে বাহিরের বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—তখনও সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমাদের পথ দেখাতে পারে।

কাকে বলছি সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন? যাতে সূচনায় ভাবাদর্শ, বিকাশেও ভাবাদর্শ ; অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার টালমাটাল পর্যায়েও ভাবাদর্শ। এই আন্দোলন রুটি ও রুচির লড়াইকে অভিন্ন পথের দুই অভিব্যক্তি বলে জানে এবং জানে বলেই শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ ভুলে যায় না কখনও। কোনো জোড়াতালির বাঁধ দিয়ে দুঃসময়ের আত্মবিস্মৃতিকে ঠেকাতে চায় না, শাসক প্রভুদের চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্যেও আপস করে না কখনও। আধুনিকতা বা আধুনিকোত্তরবাদের নামে চটকদার মোড়কে না-ভুলে অবক্ষয় ও নির্মানবায়নের চোরাবালিকে চিনিয়ে দেয় এবং উত্তরণের পথ আবিষ্কার করার জন্যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের উপকরণ খোঁজে বহমান জীবনের ধারায়। স্বভাবত ওই সাংস্কৃতিক আন্দোলন শ্রেণী-চেতনার বিকাশ ছাড়া হতে পারে না। আর, শ্রেণী-চেতনার উদ্ভব হতে পারে না ভাবাদর্শের পুষ্টি ছাড়া। ভাবাদর্শ মানেই প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় ভরকেন্দ্র খুঁজে পাওয়া। তাই যে-পরিমাণে শ্রেণী-চেতনায় ঘাটতি দেখা দেয়, ঠিক সেই অনুপাতে দ্বিধা ও দোলাচলের শিকার হয় সংস্কৃতি-চর্চা। উদ্‌ভ্রান্ত সাময়িকতার চাপে হারিয়ে যায় পথরেখা। প্রাতিগতি ও প্রতিক্রিয়ার গোপন ও প্রকাশ্য আগ্রাসন এখন আরও নির্বাধ। তাই পথ হারানোর শঙ্কাও বেড়ে গেছে অনেক। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায় : 'সময় যদি দিন মাস বছর না হয়ে একটি সামাজিক পর্যায়রূপে স্বীকৃত হয়, তাহলে তেমন একটি পর্যায়ে কোনো-না-কোনো সংস্কৃতির প্রগতিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এজন্যই প্রতিক্রিয়াকে না-চিনে প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা সাফল্য নিশ্চিত করে না!' গুরুত্বপূর্ণ এই মন্তব্যের সূত্রে বলা যাক, সঠিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন তাকেই বলব, চিন্তা-চেতনায় আঁধি ও নৈরাজ্যের আভাস দেখা দিলেও যা সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলিকে নির্দ্বিধায় ও গভীর প্রত্যয়ে চিনিয়ে দেয়। আর, আত্মিক অবসাদের হিম-ঋতু দেখা দিলে যা ভাবাদর্শের আগুনে নতুন সমিধ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করে, প্রগতির পথে আপসহীন পরিক্রমায় সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত সংস্কৃতি-সেনানীদের অনুপ্রাণিত করে।

৬

হ্যাঁ, সংস্কৃতি-সেনানী আসলে ভাবাদর্শের যোদ্ধা। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম সৃষ্টির সংগ্রাম, পুনর্নির্মাণের সংগ্রাম। শ্রেণীশক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের দিনগুলিতে সংস্কৃতি-সেনানী আলোকস্তম্ভ হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরিপূরক মাত্র নন তিনি। এই নিরিখে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো কবির কৃতিকে পুনঃপাঠ করতে পারি আজ। সময়ের কয়েকটি জটিল সন্ধিক্ষণে তাঁরা মূল্যবোধের পুনর্নির্মাণের প্রস্তাবনাই করেছিলেন। তাঁদের অবদানকে আলোচকেরা যেভাবেই বিশ্লেষণ করুন না কেন, সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের নিরন্তর পুনর্বিন্যাসই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। পথ ও পাথেয়র স্বাতন্ত্র্য তাঁদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে অনন্য করে তুলেছে। প্রথাগত দৃষ্টিকোন থেকে তাঁদের যদি না-দেখি, আজকের সংশয়-ধূসর প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ভিন্নতর দ্যোতনা আবিষ্কার করতে পারব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন লেখককে 'নিছক কলম-পেষা মজুর' বলেছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের সংস্কৃতি-শ্রমিক বলতে পারি। এই শ্রমিক যেহেতু সংগ্রামী, তিনি যোদ্ধা-শ্রমিক। আর, যুদ্ধ মানে যুদ্ধের আয়ুধ-যুদ্ধক্ষেত্র-যুদ্ধের লক্ষ্য-যুদ্ধকৌশল-প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সতর্ক ও অবহিত হওয়া। অর্থাৎ ভাবাদর্শের দৃঢ় ভিত্তিতে অবিচল থাকা।

নিজস্ব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত। মতান্ধতা কখনও কখনও আন্দোলনের স্বভাবকে আচ্ছন্ন ও গতিকে ব্যাহত করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পথ ধরেই তাকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতের উচ্চাবচতা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার কৌশল মাঝে মাঝে বদলে নিতে হয় যদিও, ব্যবহারিক রাজনীতির লেজুড় তা নয় কখনও। অমোঘ শ্রেণী-বাস্তবতা অবশ্যই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শগত ভিত্তি ও প্রকরণের নিয়ামক, কিন্তু তার পুষ্টি ও প্রকাশের পথ আলাদা। না-লিখলেও চলে যে ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও মতান্ধতা এক কথা নয়। যদিও আধিপত্যবাদীরা এই দুটোকে এক করে দেখাতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সংস্কৃতি-কর্মী চক্ষুষ্মান, তিনি অন্ধ নন। তাঁর সার্থকতা নির্ভর করে কল্পনাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর। সাংস্কৃতিক সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কী, তা যদি একটু ভাবি, দেখব, গণতান্ত্রিক চেতনা উজ্জীবনের লক্ষ্যে এবং ইতিবাচক চিন্তার পরিসরকে যতদূর সম্ভব ব্যাপক করার স্বার্থে সমাজের সমস্ত উদ্যোগী, সৃষ্টিশীল ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছে পৌঁছানোই তার অন্বিষ্ট। এটা ঠিক, বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও সংশয় ও দ্বিধাজনিত দোলাচল কাটিয়ে উঠতে পারেন না। তাঁদের পিছুটান গুলিকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে একমাত্র যথার্থ ভাবাদর্শ-সচেতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এভাবেই প্রগতি-শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

শ্রেণী-চেতনায় অবিচল থেকেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি-সেনানীরা যদি সৃষ্টিশীল, কল্পনা-সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র না হতে পারেন—তাহলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে না। এইজন্যে অন্য গণ-সংগঠন পরিচালনার কৌশল দিয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনকে

এগিয়ে নেওয়া যায় না। এর পথ ও পাথেয় পুরোপুরি আলাদা। বিশেষত ইদানীং যখন নয়া-উপনিবেশবাদের দোসর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সর্বশেষ তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেছে এবং বরাক উপত্যকার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলও না-সংস্কৃতির মহাপ্লাবনে ভেসে যেতে বসেছে—মানবিক উত্তরাধিকার রক্ষায় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও কৃৎকৌশল পুনর্বিবেচনা না করে উপায় নেই। ব্যবহারিক রাজনীতির পুরোনো কৌশল যে অনেকটাই ভোঁতা হয়ে পড়েছে, ইদানীংকার অসাড় পরিস্থিতিই তার প্রমাণ।

নতুন ধরনের বহু জটিল প্রশ্ন ও সেইসব প্রশ্নের অভিঘাতকে কীভাবে কার্যকরী মোকাবিলা করা সম্ভব—সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকদের একথা ভেবে দেখতেই হবে। কঠিন এ সময়ে একমাত্র ভাবাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েই সাংস্কৃতিক আন্দোলন গভীরতর ও ব্যাপকতর উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। চরম আত্মিক বিপর্যয়ের মুহূর্তেও নিরাপদ অভ্যাসের কূপমণ্ডূকতা ছেড়ে বেরোতে পারেন শুধু সংস্কৃতি-সেনানী। যে-পথে আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে, সে-পথে আত্মপ্রতারণা অচল। ভণ্ডামির প্রগলভতাকে জয় করেই মানুষের মানবিক নির্যাসে প্রতিষ্ঠিত পরিচয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। অন্ধকার ও সংশয়ের বলয় পেরিয়ে আলোতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সংস্কৃতিযোদ্ধা অবিচল থাকুন, এই আমাদের প্রত্যাশা। পীড়ার সংক্রমণ অনেকদূর ছড়িয়েছে, আরোগ্য-সংকেত থাকলেও দুরূহ লড়াই সামনে। বিনিদ্র রাত কাটবে অনেক, দ্বিধার প্রহর পেরোবে। নিতে হবে তবু জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা।

নাস্তিকতার সমাজতত্ত্ব

আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্ব নানা পর্যায়ে নানা অনুষঙ্গে, আজও আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক। ইতিহাস যদি সরলরেখায় এগোত, তাহলে হয়তো এই দ্বন্দ্বের ছায়া এতটা গাঢ় হত না। কিন্তু তা তো হয়ই না, বরং তৃতীয় সহস্রাব্দে পৌঁছেও আমাদের যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব নিয়ে সন্দর্ভ তৈরি করতে হচ্ছে—এর চেয়ে বিস্ময়ের, বলা ভালো, আক্ষেপের খুব কম কথাই আছে। আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর যুগে পৌঁছেছি কি পৌঁছাইনি—এই নিয়ে কত না চুলচেরা তর্ক। অথচ প্রদীপের নিচেই বড়ো অন্ধকার। ঈশ্বর-ধর্ম-সংস্কার ইত্যাদি মানুষ নিজের প্রয়োজনে তৈরি করেছিল যখন সে-সময় সভ্যতার হাঁটি হাঁটি পা পা চলছে। তারপর নীল-গঙ্গা-আমাজান-মিসিসিপি দিয়ে কত জল বয়ে গেল, কত ভিসুভিয়াস আগুন উগরে দিল, কত হিমালয় উঠে এল সমুদ্র থেকে—কিন্তু নিজের বোনা জালে বন্দী মানুষ বন্দিত্বের অভ্যাস ভেঙে দাঁড়াতে পারল না। শুরুতে লিখেছি, তর্ক নানা পর্যায়ে হয়, হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকেরা যুগে-যুগে আস্তিক আর নাস্তিকের সংজ্ঞা নিয়ে প্রচুর বিতণ্ডা করেছেন। তাঁদের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্য আরেক ধরনের বিতর্ক হয়েছে এবং আমজনতা নিজের মতো করে মীমাংসাও করে নিয়েছে। এই দুটি স্তরের মধ্যে সঙ্গতি অনেকক্ষেত্রেই হয় না এবং সঙ্গতি খুঁজে লাভও নেই। বরং দুই স্তরের ভাবনার মধ্যে শুধু কি সমান্তরাল অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটছে নাকি এই দুইয়ের মধ্যে সামাজিক মনের দ্বিবাচনিকতাও ধরা পড়ছে—তলিয়ে ভেবে দেখা দরকার।

সাধারণভাবে আমরা আস্তিক বলি সেই মানুষকে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ধর্মে যার মতি আছে, পরলোক-পরজন্ম-কর্মফল মানে। এককথায় চিরাগত সংস্কারকে বিনা প্রতিবাদে যে মেনে নেয়, প্রশ্ন করে না কখনো। ছেলেবেলা থেকে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক আবহে শিষ্ট-দুষ্টের মধ্যে যে ভেদরেখা তৈরি হয়ে যায়, তার একদিকে রয়েছে আস্তিকেরা অন্যদিকে নাস্তিকেরা। তুলনামূলক ভাবে মহানাগরিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো হয় কম ; মাঝারি শহরে আর পিছিয়ে-থাকা গ্রামগঞ্জে তোতাপাখির মতো এখনো এর আবৃত্তি চলে। এমন কী মহানাগরিক পরিশীলনে বিদগ্ধ জনদের সামাজিক চিত্তেও রয়ে গেছে এই বিভাজনের ছায়া। যন্ত্রপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের পর্বে এতে বরং বিচিত্র জটিলতা তৈরি হয়েছে। যতটুকু অবশেষ রয়ে গেছে, তার প্রতি অদ্ভুত প্রশ্রয়ে পুষ্ট হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিষচক্র। উল্টোদিকে যারা নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে যাদের বিশ্বাস নেই, ধর্মে যাদের মতি থাকার কথা নয়, পরলোক-পরজন্ম-কর্মফল নিয়ে যাদের কিছুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই—তাদের আত্মপ্রত্যয়

এত পলকা যে সংকটের মুহূর্তে এদের মেরুদণ্ডের হদিশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অথচ এদেরই হওয়ার কথা ছিল আত্ম-প্রত্যয়ে দীপ্যমান, বলিষ্ঠ ও অগ্রণী। তাহলে, সংকট বড়ো গভীরে। আস্তিক্যবাদের আস্ফালন ভারতীয় সমাজে প্রগতির সবচেয়ে বড়ো বাধা। কেননা 'আস্তিক' শব্দটার মধ্যে ইতিবাচকতার যত প্রতিশ্রুতি থাক না কেন, আসলে তা ফাঁপা এবং নিরর্থক। লোককথার সেই বিখ্যাত বৃত্তান্তের মতো এই মতাবলম্বীরা যে-ডালে বসেন, সে-ডালই কাটেন। কারণ, এঁরা মাটির খবর জানতে চান না কখনো ; আকাশপানে তাকাতে গিয়ে কুয়োয় গিয়ে পড়েন। তাই এমনও বলা যেতে পারে, জীবনের বদলে জীবনাতিরিক্ত বিষয়ে যাদের আগ্রহ—তাদের অস্তিবোধ কোথায়? রূপরসগন্ধস্পর্শময় সুন্দর এই জগতের বদলে কল্পলোকে যাঁরা সুখের আলয় খোঁজেন, তাঁরাই তো নাস্তির উপাসক। সত্যের অহঙ্কার এঁরা করেন যদিও, আসলে সত্যভ্রম আর মিথ্যার মোহিনী মায়া তাঁদের সম্বল। অন্যদিকে যাঁরা বলেন, জীবনাতিরিক্ত কোনো সত্তা নেই কোথাও এবং জীবনই জীবনের লক্ষ্য ও আশ্রয়—তাঁরাই অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথচ এঁদেরকে নাস্তিক বলে নিন্দা করা হয়েছে ; ঝুড়ি ঝুড়ি শাস্ত্রবাক্য তৈরি করা হয়েছে নাস্তিক্যবাদের 'শোচনীয়' পরিণাম দেখানোর জন্যে। জীবনকে যাঁরা প্রাধান্য দেন, তাঁরা হলেন নাস্তিক, আর, জীবনকে যাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরা আস্তিক; এটা ব্যাসকূট ছাড়া আর কী!

অথচ জনসাধারণের মনে আস্তিক-নাস্তিকের প্রচলিত সংজ্ঞা দৃঢ়মূল। ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য যে কতটা অবিচ্ছেদ্য, তা এক্ষেত্রেও দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজের আধিপত্যবাদী বর্গ নিজেদের স্বার্থে এই খুড়োর কলটি তৈরি করেছে। ভাবাদর্শের মধ্যেও স্বভাবত প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা সক্রিয়। পৌর সমাজে রাজনৈতিক আধিপত্যের বিন্যাস যাতে কখনো শিথিল না হয়, জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে মানানসই এবং সমর্থনকারী ভাবাদর্শ মাকড়সার জালের মতো বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে! জন্মান্তর-কর্মফল-নিয়তি : সবই সামাজিক অবস্থানের নিয়ন্তা। কে কীভাবে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, পুরুষ বা নারী হয়ে জন্মাবে, তা অনেকটা—কিংবা সবটাই—নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে আধিপত্যবাদী ব্যক্তির ধ্যানধারণা-রীতিনীতি-ভালোমন্দ স্বীকার করে নেওয়ার ওপর। প্রচলিত সংজ্ঞায় আস্তিক হল সেই সুশীল ব্যক্তিটি, যে ভুলেও বিধিনিয়মকে প্রশ্ন করে না এবং মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়া ছাড়া যার জীবনে অন্য কোনো অন্বিষ্ট নেই। তার মানে, স্রোতহীন জলাশয়ে শৈবালদাম কিংবা বদ্ধ অচলায়তনের স্তম্ভ হিসেবে বহতা কালকে এটা উপেক্ষা করে।

নাস্তিক মানে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান সেই মানুষ যে বিনা দ্বিধায় ওই অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার জন্যে এগিয়ে যায়। মানুষের সার্বভৌম অস্তিত্বে তার বিশ্বাস এত বেশি যে মানুষেরই তৈরি ঈশ্বর ও ধর্ম-ভাবনার খাঁচায় বন্দী থাকাটাকে সে মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর বলে মনে করে। আস্তিকের মনস্তত্ত্বে যেখানে আত্ম-সর্বস্বতা খুব প্রকট, নাস্তিক সেখানে স্বচ্ছন্দে আত্মসুখের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা তাকে স্থবির ও রক্ষণশীল হতে দেয় না কখনো, এগিয়ে দেয় নিরন্তর।

আস্তিকের পথ বেঁকে যায় অভ্যাসের দিকে, অতীত থেকে সর্বদা সমর্থন খোঁজে সে। আর, নাস্তিক যায় অভ্যাস থেকে আশ্চর্যের দিকে, সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ তাকে সঞ্জীবিত রাখে, এগিয়ে দেয় সামনে। আস্তিক স্বপ্ন দেখতে জানে না, নাস্তিক স্বপ্ন দেখে এবং দেখায়। এই স্বপ্ন সার্বভৌম জীবনের স্বতশ্চল লাবণ্যের যা কিনা নিজেতে নিজে পূর্ণ; অন্য কোনো নির্ভরতা খুঁজতে হয় না তাকে। কখনো শাস্ত্রবিধির দোহাই দিতে হয় না; তার পাথেয় আস্তিকের মতো ভক্তি নয়, নির্মোহ যুক্তি। যা আছে তাকে আঁকড়ে না ধরে আস্তিক নিজের অস্তিত্বই খুঁজে পায় না ; প্রচলিত প্রকরণকে বিনির্মাণ করার সাহস তার নেই। কিন্তু নাস্তিক জানে, সত্য অর্জিত হয় শুধু সাহসী বির্নির্মাণে ; কারণ, সত্য তো অচল অনড় নয়। প্রতিমুহূর্তে জীবনযাপন আর মননের কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করে নিতে হয়। রুদ্ধ সমাজ মানুষের ইতিহাসে এঁদো ডোবা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে বারবার। তাই নাস্তিকের প্রাণশক্তি কেবল সমাজকে সচল রাখে না, দীপ্যমানও করে তোলে। কিন্তু এতেই দেখা দেয় বিচিত্র কূটাভাস। কারণ, চিরাগত যুক্তিহীন চিন্তাপরম্পরার অনুগত সামাজিক মন আস্তিক্যবাদের বাহ্যিক আড়ম্বরকে সমর্থন করে। আর, শৃঙ্খল-মোচনের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ নাস্তিকদের জন্যে বরাদ্দ থাকে শুধু ভ্রূকুটি ও ঘৃণার প্রত্যাঘাত।

২

আগেই লিখেছি, আস্তিক ও নাস্তিকের সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগত দ্বন্দ্ব উঁচুতলার দার্শনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে যেভাবে আলোচিত হয়, সমাজের নিচুতলায় সেই কূট বিতর্ক দেখা যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক সমাজের দিকে তাকালে বুঝতে পারি, জীবন-যাপনের তৃণমূল স্তরে এই দ্বন্দ্বের অন্য-এক ধরনের জটিল অভিব্যক্তি রয়েছে। সামাজিক মনে দার্শনিকতা খানিকটা ঝাপসাভাবে উপস্থিত হলেও দৈনন্দিন জীবনে মূলত যুক্তিহীন অভ্যাসের প্রতি বশ্যতা অনেক বেশি জোরালো ও প্রত্যক্ষ। নানা ধরনের সত্যভ্রম ও অভ্যাসের নিপুণ হাতে ছড়ানো মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ জনগণের চিন্তা-প্রকরণকে কার্যত অন্ধকূপে বন্দী করে রেখেছে। 'যুক্তি' কথাটা আছে কেবল অভিধানে এবং বইপত্রে, জীবনে নয়। তাই যন্ত্রপ্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব রমরমার দিনে সর্বাধুনিক পণ্যসামগ্রী হিসেবে উপস্থিত আস্তিক্যবাদ। ভোঁতা, নিরেট, বোকা-বোকা বক্তব্যের ঠাসবুনট দিয়ে দূরদর্শন-ভিডিয়ো গুণগান করছে আস্তিকদের ; বাঘে-গরুতে জল খাচ্ছে একঘাটে। সর্বশেষ পুঁজিবাদী প্রকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মিথ্যার স্থাপত্য ; গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন-নতুন প্রত্নকথা ও কিংবদন্তি। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার অপদর্শন অসাড় করে দিচ্ছে জনমনকে। আধা-সমৃদ্ধ শহরে-জনপদে রাতারাতি গজিয়ে উঠছে শনিমন্দির, পাড়ায়-পাড়ায় হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে নানা দেবতার মন্দিরের। লোকপ্রিয় হিন্দি ছবির গানের সুরে-বসানো ভক্তিগীতি রাত-নেই দিন-নেই তীব্র মাইক্রোফোন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌বিদিক। মসজিদে-মসজিদে তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আজান। আশে-পাশে যারা আছে, তাদের কাছে আপন অস্তিত্ব পৌঁছে দেওয়ার জন্যে চলেছে

যেন শব্দথেরাপির কঠিন প্রতিযোগিতা। আস্তিক্যতার এই আড়ম্বরে খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ছে সমস্ত নৈঃশব্দ্য, সব ব্যক্তিগত নির্জনতা। যে-সময়ে এখন রয়েছি আমরা, তাতে স্থূলতার উৎকট অভিব্যক্তি দেখছি ছোট-বড়ো সমস্ত কিছুতে। সংবেদনশীলতা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক নয় যেন। তাই আস্তিক্যের বাড়াবাড়ি আমাদের পীড়িত করে না, আচরণের অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না ; দর্শনশূন্য অভ্যাসের নৈরাজ্য অজগর সাপের মতো গিলে খাচ্ছে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই দেখেও সাড়া জাগে না কোথাও। আস্তিক্যবাদ যেহেতু মানবাতিরিক্ত নির্যাস খোঁজার নামে মানুষকেই ঝাপসা করে দেয়, স্বভাবত মানুষের পৃথিবী আক্রান্ত হলেও গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণে কোথাও কোনো প্রতিবাদের ইচ্ছা জাগে না। কারণ, এই জগৎকে যদি মূল্যহীন করে দেওয়া যায়, তাহলে তার ভালো-মন্দ-উত্থান-পতন-সম্ভাবনা-আশঙ্কা কোনো কিছুতেই কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে না।

সমাজ-মনস্তত্ত্বের গহনে যদি ঐহিককে মিথ্যা, অশুচি ও মনোযোগের অযোগ্য বলে জানি, সেক্ষেত্রে অনির্দেশ্য পারত্রিক ভাবনার কাছে সমর্পিত হবে বুদ্ধি। সব কিছুই যদি পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ তো অর্থহীন। তার চেয়ে বরং মানিয়ে নেওয়াই ভালো। এই যে মানসিকতা, তা বহু শতাব্দী ধরে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে গড়ে তুলেছে সামাজিক প্রতাপের কর্ণধারেরা। অবাধ পীড়ন যাতে নিরঙ্কুশভাবে বজায় থাকতে পারে, আধিপত্যবাদী বর্গ সেভাবেই প্রতিভাবাদর্শের বিপুল জালের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং সামাজিক মনকে ধারাবাহিকভাবে সেই নাগপাশে বন্দী করে রেখেছে। আজকের এই আপাত-যান্ত্রিক দুনিয়াতেও কম্পিউটার সেন্টার ও শনিমন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার, সন্ত্রাসবাদীর গ্রেনেড-স্টেনগান, আর.ডি.এক্স ও পুজো-মিলাদ-গুরুপ্রসঙ্গ স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করছে। কোনো প্রশ্ন নেই কোথাও। কেননা আস্তিক্যবাদের মূল কথা ও প্রধান শর্তই হল পারমার্থিক অভিভাবকের কাছে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ। সমস্ত গান যেভাবে সমে ফিরে আসে, তেমনি আস্তিকদের সব কাজ সব চিন্তা জুড়ে থাকে একটিমাত্র ধ্রুবপদ : 'তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।' কর্তৃত্ব যখন নেই, কোনো কাজের উদ্যম নেবই বা কেন? সমাজে যারা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে, তাদের কর্মফল কে খণ্ডাবে! অতএব অত্যাচারীদের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, প্রতিবাদের চেষ্টা করার প্রশ্নই ওঠে না। সমাজ-মনস্তত্ত্ব এমন নিপুণভাবে ছাঁচে ঢালাই করে নেওয়া হয়েছে যে কয়েক সহস্রাব্দ জুড়ে নিপীড়কেরা নিশ্চিন্ত। তাদের বাড়া ভাতে কেউ কোনোদিন ছাই দিতে পারবে না। ভেজা বারুদে আর যাই হোক, আগুন জ্বলে না কখনো। মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বারের চাকচিক্য বাড়ছে, সাহেব বোস্টম আর বালকবাবা আর মাচান-বাবাদের দলবল নানা ধরনের ঢাকে কাঠি দিচ্ছে, রঙিন মাদকের নেশা আর নীলস্বপ্নের কুয়াশা ডিশ অ্যান্টেনা দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, নালা-বিল-পুকুর-নদী একাকার হয়ে গিয়ে পণ্য-সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে তুলছে কুণ্ঠাহীন ভোগের সাম্যতন্ত্র : এই নিশ্ছিদ্র পরিসরে কে আর কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে? আস্তিক্যবাদী মনোভঙ্গির উদার প্রশ্রয়ে নিজের ভবিষ্যৎকেও যখন

পণ্যায়ন প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে দিতে পারছি—বাইশ শতকেও যাব সবাই ডঙ্কা বাজিয়ে। যে-মনোভঙ্গি থেকে প্রতিবাদ দূরে থাক, জিজ্ঞাসাই দেখা দেয় না—তাতে শোষকবর্গের পোয়াবারো। তাদেরই রঙে রঞ্জিত ভাবাদর্শ দিয়ে জগৎ শাসিত ও প্রান্তিকায়িত হচ্ছে অথচ এমনই নিদালির ঘোর আস্তিক্যবাদের নামে ছড়িয়ে পড়েছে যে নিজেদের তীব্রতম লাঞ্ছনাতেও নিম্নবর্গীয়দের 'পিপুফিশু' নীতি অবিচল থাকছে।

৩

এই অবস্থায় একটি প্রশ্ন এখন অনিবার্য : সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে-চলতে আস্তিক্যবাদ যেহেতু সমস্ত ধরনের সুবিধাবাদের আশ্রয়ভূমি হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং এর স্থিতিস্থাপকতাকে অদ্ভুত দক্ষতায় কাজে লাগিয়ে চলেছে প্রতিটি সময়-পর্বের শোষকবর্গ—কীভাবে এর মোকাবিলা করা সম্ভব? আদৌ সম্ভব কি একাজ? যখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-পণ্যজীবী ধনী-দ্ররিদ্র ঐতিহ্যপন্থী-বর্তমানপন্থী-নির্বিশেষে আস্তিক্যবাদের মোড়ক মেনে নিয়েছে, এদের সত্যভ্রমের আস্ফালন ঘোচাবে কে? প্রবাদের সেই বালকটি কোথাও কি আছে যে উলঙ্গ রাজার দিকে আঙুল তুলে বলতে পারে, 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' এই পুঞ্জীভূত মিথ্যার জঞ্জাল সরিয়ে বিমানবায়নের চক্রব্যূহ থেকে মানুষকে যে উদ্ধার করবে, সেই হেরাক্লিস কোথায়? কোথায় সেই প্রমিথিউস যে আগুন নিয়ে এসে নিশ্ছিদ্র সেই অন্ধকারের বলয় ভেদ করবে? একাজ করতে পারে কেবল তারাই যারা রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহপুষ্ট নয়, পৌর সমাজের মধ্যে যাদের অবস্থান পরিত্যক্ত বহিরাগতের মতো, অপপ্রচারের আঁধিতে আচ্ছন্ন হয়েও যারা সত্যের অন্তর্দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড়ো কথা, অপরিসীম আত্মশক্তিতে বলীয়ান বলে এধরনের মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না। কখনো কোনো শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দেয় না, মোহমুক্ত যুক্তিবিদ্যা ছাড়া অন্য কিছুতে নির্ভরতা দেখায় না। প্রত্যক্ষ জগৎকে বেশি গুরুত্ব দেয় বলে যারা দৃশ্যমান জীবনেই বেঁচে থাকার সমস্ত স্বাদ পেতে চায়, তাদের আস্তিক্যবোধের তুলনা নেই কোনো। অথচ যুগ যুগ ধরে তারা বহন করে চলেছে নাস্তিকের নেতিবাচক অভিধা। সন্দেহ নেই যে, আমাদের সমাজে এই অভিধা আসলে অপবাদ ও তাচ্ছিল্যের অন্য নাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে তথাকথিত নাস্তিকেরা। এদেশে যখন চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে কানে হাত-না দিয়ে চিলের পেছনে ছুটে যাওয়াটা নিয়ম, নাস্তিকেরা সেখানে বলে যুক্তির প্রামাণিকতার কথা, বলে শাস্ত্রবাক্যের অকার্যকারিতার কথা। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর' বলে তার্কিকদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার ব্যবস্থা তথাকথিত আস্তিকেরাই করে এসেছে চিরকাল। যুক্তি যাদের পক্ষে নেই, ওরা তো যুক্তিবাদকে প্রত্যাখ্যান করবেই। প্রচার-মাধ্যম তাদের হাতে, অতএব অলৌকিক গল্পকথা দিয়ে শাস্ত্রবাক্যের অচলায়তনকে দুর্ভেদ্য করতে ওদের অসুবিধে হয়নি। বিশ্বাসের কত লাভ আর অবিশ্বাসের কত লোমহর্ষক ভয়ঙ্কর পরিণতি, সেজন্যে পরলোকে স্বর্গনরকের বৃত্তান্ত আর ইহলোকে ভোগসুখ ও

দুঃখদুর্দশার কাহিনি তৈরি করা হয়েছে। স্থিতাবস্থা যাতে অটুট থাকে বর্ণলিঙ্গবিভাজিত সমাজে, সেজন্যে নাস্তিকের মূল আয়ুধ অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যাকে নস্যাৎ করার জন্যে এত উৎকট আগ্রহ আস্তিক্যবাদীদের।

আধিপত্যবাদীরা জানে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ওপর তাদের সব জারিজুরি নির্ভর করে। অতএব শোষকশ্রেণীর চাহিদা মেটানোর জন্যে আস্তিক্যবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে ওরা প্রতাপের জাল বুনে গেছে। তার মানে, দর্শনের রাজনীতি সম্পর্কে প্রাচীন যুগ থেকেই ওরা খুব ওয়াকিবহাল। কোনো সন্দেহ নেই, প্রবল হিংস্রতা নিয়ে নাস্তিকদের উপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে আধিপত্যবাদী শক্তি। লোকায়ত সমাজে নাস্তিক্যবাদের যদি কোনো প্রতিপত্তি না থাকত, তাহলে ওই মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হত না। নানা অজুহাতে পুরনো দিনের সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রতিবেদনগুলি যেহেতু নাস্তিকদের গালমন্দ করেছে, বিদ্বেষের বহর থেকে মনে হয়, নাস্তিক্যবাদ একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভয় করত ওই মতবাদের শক্তিকে এবং অবশ্যই তার অনুসরণকারীদের। কেননা সমাজবিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা, দধীচির হাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বজ্রের মতো, প্রতাপমত্তেরা দেখতে পেয়েছিল নাস্তিক্যবাদে। তাদের ভয় যে কতটা বেশি ছিল, তার প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়ে গেছে নানা জায়গায়। ন্যূনতম শিষ্টাচারও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রতিপক্ষকে দেখাতে রাজি ছিল না ; আস্তিক্যবাদী ভাবাদর্শের উপযোগিতা সম্পর্কে তারা নিজেরাই যে সন্দিহান ছিল—এই হিংস্র বিদ্বেষ আসলে তারই অভিব্যক্তি।

৪

'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থে হরিভদ্র নাস্তিকদের 'শঠ' বলেছেন। আর, গুণরত্ন 'তর্করহস্যদীপিকা' বইতে যা বলেছেন, তার নিবিড় পাঠ থেকে বুঝতে পারি, পৌরসমাজের মূল ভিত্তি অর্থাৎ বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা নিচ্ছিলেন নাস্তিকেরা। সাধারণভাবে নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে এই প্রতিভাবাদর্শের স্ফূরন ও বিকাশ ঘটেছিল ; তবে ক্রমশ কিছু কিছু উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিও এতে শামিল হয়েছিলেন। তার মানে, এই প্রতিভাবাদর্শের রাজনৈতিক মাত্রা অস্পষ্ট নয় ; তাছাড়া প্রমাণিত হল, পৌর সমাজ সর্বকালে সর্বদেশে রাজনৈতিক সমাজের ভিত্তি। গৌন ধর্মচর্যা আসলে নামেমাত্র ধর্মসংশ্লিষ্ট ; মূলত তা প্রতিবাদী জীবনধারার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। এইজন্যে গুণরত্ন তাঁর শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে লিখলেন : 'কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যাগমনমপি কুর্যতে।' সমস্ত ধরনের শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করেছে এই অপভাষা। আজকের দিনে এমন অপভাষা-প্রয়োগকে আমরা সাধারণত খিস্তি-খেউড় বলি। অথচ খ্যাতকীর্তি পণ্ডিতেরা বিনা দ্বিধায় সেসব নাস্তিকদের সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন. যেমন মনুসংহিতায় মনু বলেছেন (২ : ১১) বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্যক্ত ধর্ম অনুসরণ করাই ইহলোক ও পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায়। যুক্তিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা একে অপমান করে, সেইসব বেদ-নিন্দাকারী নাস্তিকদের

ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে, সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এই সূত্রে পরবর্তীকালে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'।

ইহকাল-পরকাল, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর-জগৎ ইত্যাদি যাবতীয় বৈপরীত্যের নিঃসংশয় স্বীকৃতি আস্তিক্যবাদের মূলাধার। এতে সমাজেও স্থিরতা অটুট থাকে অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ থাকে আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপ। নাস্তিকদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ এই নয় যে ওরা ঈশ্বর-পরকাল মানে না, ওরা বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে না। তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারি, ওদের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, ওরা যুক্তিবাদী। সব কিছুতেই ওরা তর্ক করে যায় এবং প্রশ্ন না করে, পরখ না করে কিছুই মেনে নেয় না। যুক্তির সূর্যোদয়ে যেহেতু মিথ্যা বিশ্বাস ও আপ্তবাক্যের কুয়াশা মিলিয়ে যায় শূন্যে, শোষকবর্গ নাস্তিকদের সম্পর্কে আতঙ্কিত বোধ করেছে। মানুষের পক্ষে যা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্তই বেদে আছে : একথা যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ নাস্তিকেরা শিরোধার্য করে না কখনো— আধিপত্যবাদীদের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবাদর্শের কাঠামোই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। শাস্ত্রপরম্পরায় নিঃসপত্ন অধিকার নিঃসন্দেহে নিম্নবর্গীয় ও প্রতিভাবাদর্শপন্থী জনেরা মেনে নেয়নি। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেই পুঞ্জীভূত অপরের স্বীকৃতি নেই কোনো। বরং একরৈখিক ভাবে রচিত প্রতিবেদনে এদের অস্তিত্বও মুছে ফেলা হয়েছে ; যেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নির্দেশিত আস্তিক্যবাদই একমাত্র বিকল্পহীন সত্য। তবু, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও নাস্তিকদের উপস্থিতিকে যেহেতু একেবারে খর্ব করা যায়নি, খানিকটা সরলীকৃত ভাবে তাদের খারিজ করা হয়েছে। ভাবখানা এই, কেবলমাত্র মূর্খ পাষণ্ড ও আচার-বিচারহীন ব্রাত্যজনেরা দর্শনের সূক্ষ্মতা ও মহত্ত্ব বুঝতে না পেরে নাস্তিকদের আশ্রয় নেয়। এরা করুণাযোগ্য। অত্যন্ত ক্ষতিকর অশিষ্ট দর্শনের বদ অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না বলে এরা কেবল অবিদ্যা বা ভ্রান্ত জ্ঞানের পেছনে ছোটে। বৈশেষিক দর্শনের প্রবক্তা প্রশস্তপাদ তাঁর 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' বইতে বলেছিলেন, বেদ-বহির্ভূত সমস্ত মতবাদ মিথ্যা ও বিপর্যয়ের কারণ : 'মিথ্যাপ্রত্যয়ো বিপর্যয়ঃ।' ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে বহু ওলটপালট হয়ে গেছে ; কিন্তু আধিপত্যবাদীদের এই ভাবনা-পরম্পরায় কোনো ছেদ ঘটেনি। তাই পঞ্চম শতাব্দীতে প্রশস্তপাদ যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে মনুর বিশ্ববীক্ষা অনুসৃত ; আবার ষোড়শ শতকে অদ্বৈত বেদান্তে পারঙ্গম মধুসূদন সরস্বতী 'প্রস্থানভেদ' বইতে শোষকবর্গের ভাবাদর্শের প্রতিকূল সমস্ত মতবাদকে উপেক্ষা করতে বলেছেন : 'বেদবাহ্যত্বাৎ তেষাং ম্লেচ্ছাদি প্রস্থানবৎ পরস্পরয়াপি পুরুষার্থানুপযোগিত্বাৎ উপেক্ষণীয়ত্বমেব।' এই উপেক্ষা আসলে খানিকটা নিজেকে চোখ-ঠারা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেড় হাজার বছর ধরে লাগাতার চেষ্টার পরেও নাস্তিকদের যুক্তিবাদী আয়ুধকে যে পরাভূত করা যায়নি, এখানে তো তারই স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ভাবে কোনঠাসা করার পরেও যে ঘটা করে বলতে হচ্ছে, এরা উপেক্ষণীয়—তাতেই প্রত্যাখ্যাত অপরদের বৈপ্লবিক শক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

একদিকে শাস্ত্রবিধির চোখ-রাঙানি আর অন্যদিকে যুক্তিবিদ্যার মধ্য দিয়ে জীবনে ও

মননে নিত্যনূতন পরিসর আবিষ্কারের হাতছানি। লোকায়ত সমাজ যুগ যুগ ধরে কোনদিকে ঝুঁকে ছিল—তা বলার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলে আধিপত্যবাদী বর্গ কি হাল ছেড়ে দিতে পারে? ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে, ঠাট্টা করে নাস্তিকদের ওরা জব্দ করতে চেয়েছে। দর্শনের এই রাজনীতি তো কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না ; সাহিত্যেও স্বভাবত তার ছায়া পড়েছে। লোকায়ত সমাজের প্রতিবাদী মননকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করে বাল্মীকিও যুক্তিবিদ্যাকে নিন্দা করেছেন কুতর্ক বলে, দুর্বুদ্ধির প্রমাণ বলে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রাম ভরতকে যেসব লোকায়ত দার্শনিকদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন, ওরা মূলত তার্কিক। এই তার্কিকতার মৌল প্রেরণা যে নাস্তিক্যবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ, তার্কিকেরা কখনো প্রতাপের ভাবাদর্শকে যাচাই করতে ভোলে না ; ঈশ্বর-পারত্রিকতা ঐহিক ধর্মসংস্কার-জাতিভেদ-উঁচুনিচুর বিভাজন (কী জীবনে কী মননে) : কোনো কিছুই তাদের সন্ত্রস্ত করে না। অতএব, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কৃষ্টিনায়ক হিসেবে রামকে বলতেই হল :

'অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিম্ আন্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থকং প্রবদন্তি তে।।'

(২ : ১০০ : ৩৮-৩৯)

এই উচ্চারণ তো প্রজ্ঞাভিমানী উচ্চবর্গীয়দের, যারা তখনও মনে করত এবং এখনো মনে করে, সত্য হল তাই যাকে তারা সত্য মনে করে। তাদের মেধায় এবং তাদের প্রয়োজনে তৈরি শাস্ত্র সব শেষ কথা বলে দিয়েছে ; এর বাইরে সমাজের নিচুতলার অপাঙক্তেয় জনদের জন্যে আর কোন সত্য থাকা সম্ভব! সাম্প্রতিক কবি জয় গোস্বামী যেমন তির্যক উচ্চারণে জানিয়েছেন : 'আমরা যা করি ব্রহ্ম তা-ই আজ ব্রহ্ম তা-ই'—তেমনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলতে চেয়েছেন, আধিপত্যবাদের দর্শনকে যা পোষকতা করে তা-ই সৎ বুদ্ধি এবং যেসব মূঢ়জন ওই দর্শনকে প্রত্যাহ্বান জানানোর দুঃসাহস দেখায়, তাদের কাজ দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত ও নিরর্থক।

৫

রাষ্ট্রশাসকের এই ঔদ্ধত্য অস্বাভাবিক নয় কিছু ; আসলে, এধরনের মনোভঙ্গি পোষণ করা তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কারণ, তাদের শাসনব্যবস্থাই তো টিকে থাকে আস্তিক্যবাদের প্রচারক শাস্ত্রবিধির উপর। শাস্ত্রবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক সাপে-নেউলে ; অতএব নাস্তিকদের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে শোষকেরা লাগাতার চেষ্টা করে যাবেই। যেমন মনুসংহিতার মনু (৪/৩০) দুঃসাহসী প্রতিবাদীদের কষে গালাগাল করেছেন ; তাঁদের বুঝতে দেরি হয়নি, যুক্তিবিদ্যা ও নাস্তিকতা গঙ্গাযমুনার মতো অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। অতএব যারা তার্কিক বা হেতুশাস্ত্র অনুসরণকারী, তাদের মনু বলেছেন পাষণ্ড, নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বনকারী, ভণ্ড, শঠ, দাম্ভিক। কিছুতেই তাদের সঙ্গে

যেহেতু এঁটে ওঠা যায় না, সমাজ-দেহে 'বিদূষণ' রোধ করার জন্য ফতোয়া জারি করেছেন, এদের সঙ্গে কথা বলবে না কেউ। কারণ, কথা বললেই বিপদ ; যুক্তিপরায়ণ নাস্তিকদের জনচিত্ত আকর্ষণ করার ক্ষমতা যে অনেক বেশি! নরকেও এদের ঠাঁই হবে না ; অভিশাপ দিয়েও নিশ্চয় কাজ হচ্ছিল না, কেননা নরক তো প্রত্যক্ষ নয়। পরজন্মও চাক্ষুষ প্রমাণের বাইরে। অতএব শায়েস্তা করার একমাত্র উপায় তার্কিক নাস্তিকদের একঘরে করে দেওয়া। তর্কবিদ্যা অনিবার্যভাবে নিয়ে যায় ধর্মবিশ্বাসের উল্টোদিকে, অতএব প্রচার করা হল, তর্ক নয়—বিশ্বাসই কাম্য। সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণই শ্রেয় কেননা তিনিই সব করাচ্ছেন : 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'। একথা যে কতবার কত ভাষায় বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আস্তিক্যবাদের শেষ পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি চূড়ান্ত ; আর, নাস্তিক্যবাদে ঘটে ব্যক্তিত্বের সার্বিক প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা কিন্তু শাসকবর্গের পক্ষে আশঙ্কার কারণ। তাই ব্যক্তিকে লুপ্ত করে দেওয়ার জন্যে একদিকে পশুশক্তির আস্ফালন আর অন্যদিকে আস্তিক্যবাদের প্রকরণ অর্থাৎ ধর্মমোহ ছড়িয়ে দেয় ওরা। সাহিত্যের ভাষায় এই তত্ত্ব চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে। ওখানে কেনারাম গোঁসাই খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছে : 'বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মুর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরও কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা।' (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৬৬৪) একথাটাই একটু অন্যদিক দিয়ে স্পষ্ট করে বলেছে চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত বিশু : 'চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি।" (তদেব : ৬৮২)

সমাজপতিরা কখনো তাদের তৈরি শৃঙ্খলা ও কাঠামোর পক্ষে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম সইতে পারে না। পরশ্রমজীবীবর্গ টিকে থাকে সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনীর অবিচল অবস্থানের ওপর। সব কিছু যন্ত্রের মতো নিখুঁত পারিপাট্য নিয়ে যদি না চলে, তাহলে তাদের অস্বস্তির আর শেষ থাকে না। স্বভাবত অস্বস্তির কাঁটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা তাদের করতেই হয়। নিয়মমাফিক সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং চলবে, এই বিশ্বাসে ফাটল ধরলে মুশকিল। অতএব তর্ক নয়, সমর্পণ। নাস্তিকতা তাদের কাছে নৈরাজ্যের বিভীষিকা। একদল বিনা প্রশ্নে পরিশ্রম করে যাবে, আরেক দল সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে। এই সরল পন্থা সম্পর্কে যারা আপত্তি করে, তারা নৈরাজ্যবাদী-পাষণ্ড এবং নাস্তিক। এইজন্যে মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি ধর্ম-বিশ্বাসহীন তার্কিকদের সম্পর্কে ভর্ৎসনার সুরে বলেছেন : 'হেতুকাঃ নাস্তিকাঃ নাস্তি পরলোকঃ নাস্তি দত্তং, নাস্তি হুতম ইত্যেবং স্থিতপ্রজ্ঞাঃ' আর, টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখেছেন—'হৈতুকাঃ বেদবিরোধিতর্ক-ব্যবহারিণঃ' অর্থাৎ যারা হেতু-শাস্ত্রবিদ, তারা কেবলই বেদবিরোধী

তর্ক করে যায়। একথার দ্যোতনা হচ্ছে, তর্ক হোক, তা যেন বেদের বিরুদ্ধতা না করে। সোজা ভাষায়, আধিপত্যবাদীদের মূল ভাবাদর্শে কোথাও আঁচ লাগা চলবে না। মুশকিল হচ্ছে, নাস্তিক তার্কিকেরা এই সহজ কথাটি মানে না। তাদের জন্যে মহাকাব্যে-পুরাণে-স্মৃতিশাস্ত্রে নানা ধরনের গল্প তৈরি করে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে যেমন শান্তিপর্বের একটি আখ্যানে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র শেয়ালের ছদ্মবেশ ধরে আত্মহত্যায় প্রস্তুত কোনো-এক ব্রাহ্মণকে সাবধান করে দিয়েছেন। সেখানে দেখতে পাচ্ছি, যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণ যদি নাস্তিকদের মতো বেদকে নিন্দা করে, তাহলে সে শেয়াল হয়ে জন্ম নেয়। (শান্তি : ১৮০ : ৪৭-৪৯) দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। দু-হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আধিপত্যবাদী বর্গ সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে এসেছে নিতান্ত শ্রেণী-স্বার্থে। উল্টোদিকে, অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আস্তিক্যবাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার জন্যে সচেষ্ট থেকেছেন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদেরা। একই সঙ্গে সামাজিক অচলায়তন ও রাজনৈতিক শোষণের যুগলবন্দির বিরুদ্ধেও তাদের প্রতিরোধ। চার্বাক সম্প্রদায় এই প্রতিভাবাদর্শের সর্বোত্তম প্রকাশ। তাদের অভিমত হিসেবে মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহে যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা বিশ্লেষণ করলেই নাস্তিক্যবাদের জীবনমুখিনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং নামের মধ্যে যদিও নেতির দ্যোতনা অত্যন্ত প্রবল, তবু কার্যত এরাই জীবন ও জগৎ-সংলগ্নতার জোরে সবচেয়ে ইতিবাচক মনোভঙ্গির অধিকারী। তথাকথিত আস্তিক্যবাদীরা যখন প্রত্যক্ষগোচর জীবনকে না-এর ধোঁয়াশার আড়ালে সরিয়ে দেয়, নাস্তিক্যবাদীরা সেসময় জীবন ও জগতের প্রতি গভীর মমতায় খুঁজে পান 'আছে আছে আছে' এই বার্তা।

৬

এমন নয় যে অস্তি নাস্তির এই মিথ্যা দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের যুগে ঘুচে গেছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, আপাতদৃষ্টিতে প্রাগ্রসর ব্যক্তিও আস্তিক্যবাদী ভাবাদর্শের আকর্ষণে দর্শনশূন্য ধর্মসংস্কারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে পড়ছেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে বিচিত্র সহাবস্থান চলেছে ধর্মীয় অভ্যাসের। এমনকি, গত কয়েক বছরে মনে হচ্ছে, গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার পুনরুত্থান হচ্ছে। ধর্মীয় উন্মাদনা যে-পরিমাণে যুক্তিবাদকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতে বেড়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রত্যেকের জন্যে স্বাস্থ্য প্রত্যেকের জন্যে শিক্ষা প্রত্যেকের জন্যে খাদ্য : এই ন্যূনতম দাবি মেটাতে যখন অপারগ হয় রাষ্ট্র, নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে সুড়সুড়ি দেয় আস্তিক্যবাদী চিন্তাপ্রকরণে। সাম্প্রতিক কালের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি, দর্শনের সমর্থন নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাচ্ছে না। পরম্পরাগত ব্যবহারিক অভ্যাসকে আঁকড়ে ধরছে যারা, তাদের কাছেও বাস্তব চাওয়া পাওয়া মুখ্য। স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই তো চায় রাষ্ট্রশক্তি এবং পৌর সমাজেও অনুকূল বাতাবরণ অটুট রাখতে চায়। যতভাবে সম্ভব, লোভের আগ্রাসন বজায় রাখে ; তাতে মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ-যুক্তি জাতীয় শব্দ নিতান্ত অবান্তর। ভোঁতা-নিষ্প্রাণ-স্থূলতাক্লিষ্ট জগৎ স্থবির থেকে

স্থবিরতর হয়ে যাচ্ছে যত, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আস্তিক্যবাদের সাড়ম্বর বিজ্ঞাপন। এখানেই নাস্তিকের স্পর্ধিত উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় উচ্চপ্রযুক্তির ডানা মেলে দিয়ে যখন শিকারী বাজপাখির মতো নেমে আসছে শূন্যগর্ভ আস্তিক্যবাদ, অতীতমুগ্ধ মিথ্যা বিশ্বাসেরা—সে-সময় আলো ও আলেয়ার মধ্যে তফাতটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে নাস্তিকতার সামাজিক প্রেরণায় নির্ভর করতে হবে। হয়তো বা কেউ বলতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ায় তো আস্তিক্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত, মানুষের সহজাত আস্তিকতার জয়ই তো হল! তাহলে?

বরং উল্টো দিক থেকে কথাটা বলা যাক। বিশ্বপুঁজিবাদের গোপন ও দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তে প্রতিক্রিয়াবাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক এবং প্রগতির সবচেয়ে কঠিন শত্রু বলেই তো প্রমাণিত হল আস্তিক্যের সংস্কার। সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তোলার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নির্মাণের। ওই প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি নাস্তিকতার দার্শনিক ও সামাজিক প্রেরণা। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি করেননি, তার ওপর বিশ্বপুঁজিবাদের চতুর অন্তর্ঘাত। তাহলে আস্তিক্যবাদকে ব্যবহার করেই সমাজতন্ত্রে মানবমুক্তির সম্ভাবনাকে পর্যন্ত নাকচ করে দিতে পারল গণশত্রুর আন্তর্জাতিক সংঘ। এতে বরং নাস্তিকতা ও মানবচেতনার সার্বিক শৃঙ্খল মোচনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই প্রমাণিত হচ্ছে। প্রমাণিত হচ্ছে, যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে নিয়ত মানবমুখী নাস্তিকতাকেও। বহু ঘটনার আবর্তে বিভ্রান্ত বিশ শতকে এক পা' এগিয়ে মানুষ বুঝি বা দুপা পিছিয়ে গেছে বারবার। এমনকী, মৌল মানবতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বীভৎস জান্তব অবয়বও দেখিয়েছে কখনো কখনো। তবু এ তো কবির বাচন নয় কেবল : ' মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য'। সংঘবদ্ধ মূঢ়তার কাছে নিশ্চয় আত্মসমর্পণ করবে না মানুষ। 'আমার পিতৃপুরুষের তৈরি কুয়ো—এই পরিত্যক্ত কুয়োর দূষিত জল পান করে কেউ?'—বিখ্যাত এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল বহুপঠিত সংস্কৃত শ্লোকে। উত্তরও দিয়েছিলেন ওই শ্লোককার, 'যে করে, সে কাপুরুষ!' অর্থাৎ অবিবেচক ও অন্ধ। আস্তিক্যবাদের আড়ম্বর দিয়ে নিজেদের অন্ধতা যারা ঢেকে রেখেছে বহু শতাব্দি ধরে, তাদের দেখানো পথ ধরে চলতে গিয়ে নিজেদের অন্ধতর বলে প্রমাণিত করব কি? বাস্তব জীবনের কাল্পনিক বিশ্লেষণ কাম্য নাকি বাস্তবের বাস্তব বিশ্লেষণ চাই? যুক্তিবাদের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি প্রত্যাখ্যান না করি মানবাতিরিক্ত সব কল্প-উপাদানকে, তাহলে তো নিজেদের যুক্তিকে নিজেরাই রোধ করে রাখব চিরকাল!

তাই এ কেবল আস্তিক-নাস্তিকের প্রশ্ন নয়, এ আসলে জীবন আর মৃত্যু, আত্ম-প্রতিষ্ঠা আর আত্মবিলোপের মধ্যে যে-কোনো একটিকে বেছে নেওয়ারই প্রশ্ন। এখনো তো গেল না আঁধার! এখনো তো আস্তিক্যবাদের সূত্রে মানুষে-মানুষে বর্গ-বর্ণ-লিঙ্গগত বিভাজন সামাজিক প্রতাপের আস্ফালনকে পুষ্ট করছে। এখনো তো স্ববিরোধিতার সমাবেশ দেখেও যুক্তিহীন বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে সব মেনে নিচ্ছি। এখনো তো

অবতার-পিরদের ব্যবসায় আমাদের মূর্খ সমর্থন অব্যাহত থাকছে। এখনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ঘাড়ে, সিন্দবাদের সেই বুড়ো দৈত্যের মতো, চেপে বসেছে আস্তিক্যবাদ। তাই কেবল ওই আস্তিকতার অবচেতন প্রভাবে উলঙ্গ রাজাদের আমরা শনাক্ত করতে পারছি না ; যথেষ্ট ক্রোধে-ঘৃণায় উদ্বেল হতে পারছি না। ফলে ক্ষয়রোগের বীজাণু অবাধে বাড়ছে। একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ নাস্তিকতাই আমাদের প্রতিবাদী সত্তাকে লালন করতে পারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসটুকু যোগাতে পারে। কেননা আস্তিক্যবাদ আমাদের ভীরুতা ও মানিয়ে চলা শেখায় শুধু; নিয়তিবাদের কাছে সমর্পিত হতে প্ররোচনা দেয়। অতএব নাস্তিকতার অন্তর্বর্তী উদ্দীপক ইতিবাচকতাই আমাদের আশ্রয়ভূমি হোক। বিমানবায়ন ও ফাঁপা আস্তিকতার অশুভ আঁতাত ধ্বংস করে কদম-কদম এগিয়ে যাক নতুন জীবনস্বপ্নের উদ্‌গাতা, নতুন মানবচৈতন্যের উদ্‌ভাসক নাস্তিকতার প্রত্যয়। একে কি বলব 'শত শতাব্দীর মনীষার কাজ?' হয়তো। তবু, এই কবি, জীবনানন্দ, লিখেছিলেন অমোঘ উচ্চারণে :

'কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে মানুষকে মানষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার'

সন্দেহ নেই যে, রিক্ত 'হ্যাঁ থেকে 'না'-এর সৃজনী উত্তাপে উত্তরণ দুরূহ এবং তা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তবে মানবিক পূর্ণতার জন্যে গণমনে তারই উদ্যোগ চলেছে, চলতে থাকবে।

লিটল ম্যাগাজিন নামক শমীবৃক্ষ

আমরা লক্ষ করছি, ছোট পত্রিকা সফল হলেই ছোট থাকছে না আর। এই তথ্য নিছক তথ্য নয়, হয়ে দাঁড়াচ্ছে বড়ো মাপের সমস্যা। লিটল ম্যাগাজিন গোত্রপরিচয় হারিয়ে পরিণত হচ্ছে মেগা-ম্যাগাজিনে। তখন তার চরিত্রেও আমূল রদবদল ঘটে যাচ্ছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন, মেদবৃদ্ধি তো কায়ায় হয় না কেবল, মগজেও হয়ে থাকে। ঈষৎ রাবীন্দ্রিক ঢঙে বলা যেতে পারে, চিরপুরোনো চাঁদ, চিরদিবস এমনি থাকো, এই তো আমার সাধ।

না, কথাটি মোটেই ঠাট্টা-তামাসার নয়। কলকাতায় প্রমা, অনুষ্টুপ, এক্ষণ, অমৃতলোক, বিভাব, হাওয়া ৪৯, এবং এই সময়, এবং মুশায়েরা ইত্যাদি কাগজের গোত্রপরিচয় মূলত অভিন্ন ছিল। কিন্তু বিবর্তনের পথে এরা আজ পরস্পর থেকে (এবং আসলে নিজের উৎস-স্বভাব থেকেও) কার্যত আলোকবর্ষ দূরত্বে চলে গেছে। কোনো-কোনো সম্পাদক প্রকাশ্যে লিটল ম্যাগাজিনের পারিভাষিক ও ইতিহাস-নির্ধারিত পরিচয় নস্যাৎ করে এর প্রেরণা ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শকে অস্বীকার করছেন। কেননা সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপনের ঢালাও বদান্যতায় তাঁদের প্রাক্তন-লড়াই এখন তাঁদের নিজেদের পক্ষেই অস্বস্তিকর এবং বিস্মৃতিযোগ্য স্মৃতি। বরং পণ্যায়নের যাবতীয় যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে নিয়ে পাদপ্রদীপের আলো ভাগ করে নেওয়ার জন্যে অশোভন ব্যগ্রতাই স্বাভাবিক। শ্লোগান এখন একটাই : যে-খেলার যে-নিয়ম!

কী বলব একে! ছোট পত্রিকার গভীর গভীরতর সংকট, নাকি, মিডিয়া-শাসিত টাকা-মানুষদের মৌল ব্যাধি! কেন আজ 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি' এত প্রকট হয়ে পড়েছে? ছোট পত্রিকাকে সিঁড়ি আর মেগা-ম্যাগাজিনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে গোপন ও প্রকাশ্য মেধাবিক্রয়ের আয়োজন কিসের ইঙ্গিত? এ বিষয়ে আরও কথা বলার আগে সমস্যার অন্য এক দিকের প্রতি তর্জনি সংকেত করা যেতে পারে। প্রশ্নহীন আন্তরিকতা নিয়ে যথেষ্ট ক্লেশ সয়ে চেয়ে-চিন্তে নবীনতম কিছু লেখা একসঙ্গে ছাপিয়ে দেওয়াই কি শেষ কথা? তারুণ্যের স্পর্ধা, জগৎ-সংসারের প্রতি সরব তাচ্ছিল্য, দুজন বা তিনজন মিলে গোষ্ঠী তৈরি, বইমেলা এবং এজাতীয় সামূহিক উপস্থিতিতে উদ্ভট আচরণ করে নজর কাড়ার চেষ্টা : এসবের নীটফল কি লিটল ম্যাগাজিন এবং সাহিত্য আন্দোলন! কয়েকটি এলোমেলো কৃশকায় সংখ্যা প্রকাশ করতে করতে কোঁদল তুঙ্গে উঠে যায় অবধারিতভাবে এবং অকালমৃত্যু ঘটে সেই পত্রিকার। প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ কিছুই তাতে ভালোভাবে দানা বেঁধে ওঠে না।

কেন কাগজ করছি, এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা শুরুতে হয়তো অনেকের থাকে না। কিন্তু

হাঁটুজলে দাপাদাপি করতে করতে একসময় ডুবজলে তো যেতেই হয়। এবং তখন, সাঁতার না জানলে একেবারে চলে না। বলা বাহুল্য, সাঁতারুকে সবচেয়ে আগে জল সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। জলে চোরাস্রোত থাকে; তবু এসব মোকাবিলা না করে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। লিটল ম্যাগাজিন যাঁদের কাছে কেবল ক্ষণিক খেয়ালের উন্মাদনা, তাঁরা এত কথা ভাবেন না কখনো। তাই অন্তহীন মিছিলের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ছাড়া এঁদের অন্য কোনো ভূমিকাও গড়ে ওঠে না। কিছুদিনের মধ্যে যদি স্পষ্ট না হয় ছোট পত্রিকার তাৎপর্য কী, তার অস্তিত্ব কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফসল এবং এতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি কেন চিহ্নায়কের বিন্যাস হিসেবে গ্রাহ্য, তাহলে ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে পণ্ডশ্রমের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে হবে। এইজন্যে লিটল ম্যাগাজিন নিছক ইতিহাসের উপকরণ মাত্র নয়, আসলে তা হল ইতিহাসের নির্মাতা। বারবার আমাদের প্রচলিত অভ্যাসে হস্তক্ষেপ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেপরোয়া অন্তর্ঘাত করে, সাহিত্যের খাত থেকে পলি সরিয়ে দিয়ে তা তীব্র ও দ্যুতিময় নবীন জলধারাকে গতিময় করে তোলে। একই কারণে ছোট পত্রিকাকে বিশেষভাবে আত্মবিনির্মাণপন্থী না হলে চলে না। কেননা কখনো কখনো নিজেরই সযত্নরচিত পদ্ধতি, প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব অর্জন করে নেয় ; তখন নির্মোহভাবে নিজেকে আঘাত করে জটাজাল থেকে প্রাণের গঙ্গাকে মুক্ত করতে হয়। নইলে আত্ম-অনুকরণের অভ্যাসে সমস্ত পদ্ধতি, প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু থেকে হারিয়ে যেতে পারে ঈপ্সিত নির্যাস। যেতে পারে না, হারিয়ে যায়। চিরতরে।

অতএব লিটল ম্যাগাজিনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল অপ্রাতিষ্ঠানিকতা। প্রচলিত সাহিত্যের তেল-চিকচিকে নধর কান্তি দেখে যাঁরা প্রলুব্ধ হয়ে স্রোতের অনুকূলে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেন, ওই স্রোতের ফেনা হয়ে ভেসে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় থাকে না। সাহিত্যের রূপ-রীতি-স্থাপত্য-অলংকরণ-ভাষা-বাচন-ভিত্তি-আকরণ : সমস্তই যেন রূপকথার মায়াপুরী হয়ে আমাদের যাবতীয় জিজ্ঞাসা-বিশ্লেষণকে নিদালির ঘুমে আচ্ছন্ন করে দেয়। তাই সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না, এই মায়া আধিপত্যবাদী বর্গের তৈরি। প্রতাপের বিচ্ছুরণে সমস্ত মূল্যবোধ পরিকল্পিত ও নির্মিত বলে আমরা সেই ভাষা শুনি, সেই গ্রন্থনা দেখি যা কিনা ওই বর্গের অনুমোদিত। প্রতাপ যাদের গিলে খায়, সেইসব অন্তেবাসী জনের কণ্ঠস্বর সাহিত্য নামক ঐকতানে চির অনুপস্থিত। সাহিত্যের মূল্যবোধ আসলে সমাজের উঁচুতলার স্বার্থ-উপযোগী ও স্বার্থ-অনুমোদিত মূল্যবোধ। তাই ওই মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার তীরে বিদ্ধ না করে, ওই মূল্যবোধের আশ্রয় হিসেবে গড়ে-ওঠা ভাষা-আকরণ-সন্দর্ভকে আক্রমণ না করে কোনো নতুন সম্ভাবনার জন্ম হতে পারে না। যদি তার মানে হয় সাহিত্যকর্ম বলে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধিক বটবৃক্ষটির মূল উৎপাটন, তাহলে সম্ভাবনার নতুন জমিতে ফসল ফলানোর তাগিদে তা-ই করতে হবে। বস্তুত করাও হচ্ছে। বাঙালির ভুবন জুড়ে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রতিসন্দর্ভকে মশালের মতো জ্বালিয়ে রাখছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আমরা দেখছি অপ্রাতিষ্ঠানিক নবীন চেতনার উৎসব। এই উৎসবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আধিপত্যবাদী

বর্গের প্রতাপ-পঞ্জীয়নের চতুর কৃৎকৌশল, লোকায়ত প্রাকৃত অনুভবের স্পন্দনে জেগে উঠছে এতদিনকার প্রান্তিকায়িত চেতনা-ভাষা-অভিজ্ঞতা। লিটল ম্যাগাজিন ধারণ করছে এইসব প্রতিস্রোতের আকল্পকে।

এইজন্যে যদি সাহিত্যসৌধের নোনা পলেস্তারা খসে পড়ে যায় তো যাক। তার বদলে জেগে উঠছে কিনা আটপৌরে কিন্তু সজীব প্রাণের স্ফুলিঙ্গরূপী 'লেখা' এবং চিহ্নায়ন সম্পৃক্ত নবীন লিখনপ্রণালী—লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক হিসেবে একমাত্র তা-ই আমাদের বিবেচ্য। এই 'লেখা'র মধ্যে লেখক-সত্তার বদলে সূত্রধার-সত্তা যদি প্রবলতর হয়ে ওঠে, তাতে সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ক্লান্তি-অবসাদ-নিরক্ত ধূসরতা থেকে সরে আসার পথ খুঁজে পাই। অন্তত যেসব পড়ুয়ার মানস-জীবনে কোনো বিবর্তন নেই অর্থাৎ যাদের শৈশব কাটে না কখনো, তাদের মনোরঞ্জনের দায় বইছে না লেখা। এদের মুখে চুষিকাঠি ধরিয়ে দেওয়ার মহান ব্রত পালন করেন যেসব সাহিত্যিকেরা, তাদের দলে না ভিড়ে ওই লেখাপত্রের পতাকা শক্ত মুঠোয় ধরে রাখছেন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা। তাঁরা মধ্যবিত্তের ফাঁপা, তরল, দায়িত্ববোধহীন দুঃখসুখের পাঁচালি ছেপে এত কষ্টে বের-করা পত্রিকার অমূল্য পাতাকে নষ্ট করবেন না, এটাই আজকের দিনের বড়ো ভরসা। নিসর্গের সরকার আশরাফ, লিরিকের এজাজ ইউসুফী, দ্রোণাচার্যের শিমূল আজাদ, অমৃতলোকের সমীরণ মজুমদার, উত্তরাধিকারের অমিত দাস, হাওয়া ৪৯-এর সমীর রায়চৌধুরী, কালিমাটির কাজল সেন, মধ্যবর্তীর বিশ্বরূপ দে সরকার, দ্যোতনার গৌতম গুহরায়, শরিকের বিশ্বজিৎ চৌধুরী, একবিংশের খোন্দকার আশরাফ হোসেন, কবিতীর্থের উৎপল ভট্টাচার্য আজ আর বিচ্ছিন্ন কটি নাম নন ; এঁদের মতো আরও কয়েকজনের সমবায়ী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে প্রতিভাবাদর্শের শানিত আয়ুধ। এর চেয়ে বেশি ইতিবাচক সংকেত আর কী হতে পারে! এসময় অনেকার্থদ্যোতনার, এসময় বহুস্বরসঙ্গতির। এই দায়িত্ব পালন করছে যুদ্ধরত লিটল ম্যাগাজিনেরা, বিজ্ঞাপনধন্য পণ্যসাহিত্যের সেবাদাসদের আধা-ঔপনিবেশিক আড়তগুলিতে অর্ডারি মালের বেচাকেনা দিনদিন মিইয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যবসাদারেরা কি সহজে হার মানতে পারে? তাই এরা নানা 'পদ্ধতি' অবলম্বন করে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে দেয়। অর্থাৎ ছোট পত্রিকার শিবির ভাঙার চতুর আয়োজন করে।

বস্তুত এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৌর সমাজের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা রাজনৈতিক সমাজে যেভাবে লজ্জাহীন ভ্রূক্ষেপহীন শিবিরবদল রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, তাতে তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়ার লোভ-ই হয়ে উঠছে জীবনযাপনের মুখ্য আধেয়। যেসব লিখিয়েরা মূলত চলতি হাওয়ার পন্থী, স্রোতে গা ভাসানোর চেয়ে বেশি কোনো দায় স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। এরা কেবল তথ্যের খোলস দেখে তৃপ্ত ; যদি ওই খোলস রঙিন ও চকচকে হয়ে থাকে, তাহলে একেই সাম্প্রতিকতার পরাকাষ্ঠা ভেবে এরা উল্লসিত। জীবনে কোনো সংকেত খোঁজা বা তাৎপর্য আবিষ্কার করার বৃথা হয়রানি এরা পছন্দ করেন না। যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালি হতে কোনো আপত্তি নেই এদের, কেননা নিজেদের পর্বতপ্রমাণ মূঢ়তা এরা ঢেকে রাখেন

অতিপরিশীলিত সপ্রতিভতার মোড়কে। ভঙ্গিসর্বস্বতা যেখানে শেষ কথা, তাতে লিটল ম্যাগাজিনের পতাকা বহন গভীরতর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হতে বাধ্য। এইজন্যে আরও একটু নাম, আরও একটু দাম পাওয়ার তাড়নায় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কৃপাধন্য হওয়ার উপযোগী প্যাঁচ-পয়জার করতে এদের দ্বিধা হয় না। স্বভাবত এরা কাকের ঘরে কোকিল ; বাসা ভেঙে উড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো কোনো প্রাসাদের সুরম্য বারান্দায় খাঁচার নিরাপদ ঘেরাটোপে এদের অধিষ্ঠান হয়। বাঁধা সময়ে বরাদ্দ ছোলা খেয়ে কখনো সুখে শিস দেয় আর কখনো শেখানো বুলি আওড়ায়। গন্তব্যের, ভাবাদর্শের, প্রাসঙ্গিকতার বালাই নেই এদের। লিটল ম্যাগাজিনের অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা এদের পক্ষে দুর্বোধ্য গ্রিক।

প্রতিষ্ঠান এইসব কোকিলের দস্তুর জানে। এদের খাঁচাবন্দী করতে যে দুটো চারটে দানাই যথেষ্ট, একথা প্রাতিষ্ঠানিক মোড়লদের বুঝতে দেরি হয় না। সুতরাং বড়শির চারা হিসেবে খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে অচিরে ভুলে যায় এদের। কিন্তু সংশয়ের আঁধি তৈরি করা যেহেতু প্রতিষ্ঠানের রণকৌশল, লিটল ম্যাগাজিনের অনেক সৎ সৈনিক সহজ বুদ্ধির জন্যে এই শিবির বদলের আসল তাৎপর্য অর্থাৎ সংশয়ের তাৎপর্যহীনতা বুঝতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে দ্বিধা ও দুর্বলতা দেখা দেয়, হতাশা প্রস্তুতিপর্বকে আচ্ছন্ন করে, পথ চলার শক্তি সংহত করার বদলে কেউ কেউ নেতির চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েন। প্রতিষ্ঠান তো তা-ই চায়। আর, যাঁরা নাছোড়বান্দা হয়ে তবু এগিয়ে যেতে চান, তাঁদের জন্যে প্রতিষ্ঠান ওইসব বড়শির চারাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। অন্তর্ঘাত কীভাবে কখন নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে, সততা ও মৌলিক চিন্তা নিয়েও ছোট পত্রিকার মশালচিরা তা বুঝতে পারেন না। চোরাবালিতে যখন কোমর অব্দি ডুবে যায়, সেসময় কেউ কেউ হয়তো ছটফট করে ওঠেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সম্মোহন, বহুশ্রুত, প্রায় ক্লিশে হয়ে-যাওয়া, বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে লেখা যেতে পারে, এর মোহিনী মায়ায় কত ডাকসাইটে বিপ্লবীর পথ বেঁকে গেছে গার্হস্থ্যের দিকে। এইসব প্রাক্তন বিপ্লবীদের সাম্প্রতিক অবস্থান জীবনানন্দ কথিত শতশত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বরকে যতই মনে করিয়ে দিক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই যে লিটল ম্যাগাজিনের কোনো কোনো অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে পিতামহ ও পিতৃব্যদের বিপক্ষ শিবিরে দেখে। যেহেতু এইসব প্রাক্তন প্রিয়জনদের ডিগবাজি-কুশলতা ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আজকের সেনানীদের সন্দিহান করে তুলছে, ইতিহাসের আবর্জনাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার দায় স্বীকার করাটা ছোট পত্রিকার পতাকাবাহীদের অবশ্যকৃত্যের মধ্যে পড়ে। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার চতুর খেলাকে যে ঘৃণা করতে শেখেনি, লিটল ম্যাগাজিন কিছুতেই তার জন্যে নয়।

২

আধিপত্যবাদ চিরকাল-ই সুস্থ চিন্তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। চিন্তায় পক্ষাঘাত ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যে অনবরত কলকাঠি নেড়ে যায় আধিপত্যবাদের নায়েব-গোমস্তা-দালালের

বাহিনী। এদের খপ্পর থেকে সে-ই বাঁচাতে পারে যে জানে এরা কেন কী করছে। স্বাধীনতাকে যারা বিনিময়যোগ্য মনে করে, যে-কোনো অজুহাতে এরা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। লিটল ম্যাগাজিনের লড়াই মূলত এই সংক্রামক প্রবণতার বিরুদ্ধে। চারদিকে ভাগাড় আর জঙ্গলের স্তূপ দেখে নিপাট ভালোমানুষ ভদ্রলোকের মতো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ফুলবাগানের সন্ধান করেন যিনি, ছোট পত্রিকার যুদ্ধ অন্তত তাঁর জন্যে নয়। নগদ-বিদায়ের অবিরাম হাতছানি উপেক্ষা করা ওই যুদ্ধের প্রথম ধাপ। যোদ্ধাকে জানতে ও ভাবতে হয়, কেন ভাগাড়ের চারদিকে ঘিরে এত শকুন আর ফেউদের আনাগোনা ও হল্লাবোল। আধিপত্যবাদীরা কীভাবে এই পৃথিবীকে মানুষের পক্ষে অব্যবহার্য করে তুলছে ক্রমশ, এটা দেখানো এবং বোঝানো তাঁর যুদ্ধ। যতক্ষণ এই উপলব্ধিতে না পৌঁছাচ্ছেন, অন্তত ততক্ষণ লিটল ম্যাগাজিনের মাইন-বিছানো রণভূমিতে তিনি ফুরফুরে ফুলবাবুমাত্র হয়ে থাকবেন। বলা বাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্র আর যা-ই হোক, সৌখিন হাওয়া বদলের জায়গা নয়। তাতে বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়ায় দম আটকানোর সম্ভাবনা অন্তত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর চেয়ে বরং প্রাক্তন বিপ্লবীদের মতো কিংবা সাহিত্য 'করে' নামী দামী হওয়া আধিপত্যবাদের খয়ের খাঁ-দের মতো সহজ ও স্বাভাবিক পথে বিচরণ করা অনেক বেশি নিরাপদ। এতে 'স্বাধীন'ও থাকা যায়, চিন্তা তাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হোক বা খাঁচাবন্দী হোক। আধিপত্যবাদ অপরিসীম দক্ষতায় দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঞ্জর তৈরি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানে সামগ্রিক প্রতিরোধ ও বিকল্প প্রতিবেদনের সন্ধান। এই কাজ লিটল ম্যাগাজিন করে যাচ্ছে বলে পীড়ন প্রায় সর্বগ্রাসী হয়েও বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সত্য হতে পারেনি।

সমাজে ও সাহিত্যে ছোট-বড়ো অজস্র প্রতিষ্ঠান দিন-দিন কেন তিমিঙ্গিল হয়ে উঠছে, এর উত্তর খুঁজতে হবে আমাদের জীবনের নানা অনুপুঙ্খে। এই বাড়বাড়ন্ত কি শেষ সত্য? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-কমলকুমার মজুমদার-অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো লিখিয়েরা যে আপসহীন প্রতিবাদ ও বিকল্প সাহিত্যের প্রতিস্রোত গড়ে তুলেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভুবন জুড়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার অক্ষয় প্রেরণা হিসেবে আজও সক্রিয়। পাশাপাশি যদিও পণ্যসাহিত্যের রমরমা অব্যাহত রয়েছে, তবু লিটল ম্যাগাজিন থেমে থাকেনি। কেননা থেমে থাকাও তো এক ধরনের পরাজয়েরই স্বীকারোক্তি। তাই যাবতীয় স্থিরতা, পরিবর্তন-অনীহা ও মানিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এইসব লেখকেরা সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত বর্গের সাহিত্যিক মুখোশকেই খুলে দিয়েছেন। ভাষা ও চেতনার কাঠামোয় অন্তর্ঘাত করে তাঁরা আসলে তাপ্পিসর্বস্ব ঘুনধরা বাণিজ্যিক সমাজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছেন। ছোট পত্রিকার শমীবৃক্ষ থেকে আগুনের মতোই ধারাবাহিকভাবে জ্বলে উঠেছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্র, সুবিমল বসাক, শৈলেশ্বর ঘোষ, উদয়ন ঘোষ এবং এরকম আরো কয়েকজন লিখিয়ে। তাঁরা সাহিত্যের নামে প্রচলিত আত্মপ্রতারণাকে আক্রমণ করেছেন বিনা দ্বিধায় এবং কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা

করেননি। এমন কি, প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয়তার মোহকে অস্বীকার করে জনতার উপর চাপিয়ে দেওয়া রুচি, বাস্তবতা ও ন্যায়বোধকে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের কল্পনা, আবেগ ও চিন্তা, যুক্তি ও প্রকল্পনা অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা থেকে উৎসারিত হয়ে ভাষাসংস্কার ও সাহিত্যসংস্কারকে যেন ভেতর থেকে ছুরিকাঘাত করেছে। সভ্যতার নামে মানুষের তুমুল মৃত্যুপরম্পরাকে এরা অস্বীকার করতে চেয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনের আশ্রয়ে। সমস্ত কোলাহলের উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে এমন-এক নতুন বহুত্বময় কণ্ঠস্বরের জন্ম দিতে চায় এই পত্রিকাগুলি যা মৃত্যুপীড়িত সভ্যতার পক্ষে দর্পণ হবে না কেবল, গড়ে তুলবে প্রতিবাস্তবতা ও প্রতিসন্দর্ভের আদল।

ছোট পত্রিকার মূল লড়াই এইখানে যে, সাহিত্যকে নিছক মুনাফাখোরদের পণ্যে রূপান্তরিত করাকে প্রতিহত করাই তার লক্ষ্য এবং সেইসঙ্গে আধিপত্যবাদীদের আসল চেহারাটা ধরিয়ে দেওয়াই তার দায়। ছোট পত্রিকায় যাঁরা লেখেন, তাঁরা রুগ্ন সমাজের যথাপ্রাপ্ত মূল্যবোধকে বারবার প্রশ্নে বিদ্ধ করেন, ব্যবচ্ছেদ করেন, আক্রমণ করেন। সততা ছাড়া সর্বব্যাপ্ত প্রচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে যেহেতু লড়াই করা যায় না, ছোট পত্রিকার প্রতিটি যোদ্ধাই সেহেতু লেখাকে যুদ্ধ বলে মনে করবেন—এই হল ন্যূনতম চাহিদা। গ্রিক প্রত্নকথার সিসিফাসের মতো নিঃসঙ্গ ও একক অভিযাত্রী হওয়ার জন্যে তাদের তৈরি থাকতে হয় এবং বারবারই হয়তো নতুন করে সূচনাবিন্দুতে ফিরে গিয়ে কঠিন চড়াই ভেঙে দুর্বহ পাথরকে ঠেলে তুলতে হয় উপরে। কোনো ছক অনুযায়ী তা হতে পারে না। ফলে ছোট পত্রিকাকে বারবার ছক ভেঙে ফেলতে হয়, গড়তেও হয় আরও একবার তা ভাঙার জন্যে। এ বিষয়ে সর্বতোভাবে লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার প্রতিনিধি সুবিমল মিশ্র লিখেছেন : 'প্রতিষ্ঠান একটি ব্যাপক শক্তি, বিভিন্ন কেন্দ্রে তার ডালপালা ছড়ানো। প্রতিষ্ঠান সবসময়ই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী। তার উদ্দেশ্য মুনাফা লোটা এবং যেন তেন প্রকারে ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীকে করায়ত্ত করা। পাঠককে শিল্প-সচেতন করা নয়, তার মনোরঞ্জন করা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই প্রতিষ্ঠান চায় সমস্ত রকম স্বাধীন অভিব্যক্তি, প্রকৃত সত্যের প্রকাশ বন্ধ করতে। তাদের হাতে বিজ্ঞাপন যন্ত্র, সমস্ত রকমের প্রকাশমাধ্যমগুলি, আর মূলত এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে।'

প্রতিষ্ঠানের এই মারাত্মক সর্বগ্রাসী চরিত্র এইজন্যেই ঘৃণ্য যে তা তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটা তাসের প্রাসাদ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এর আসল লক্ষ্য মানুষের মানবিক নির্যাসটুকু শুষে নেওয়া। একদিকে প্রবল দৈত্যের মতো তার পরাক্রম আর অন্যদিকে মনোলোভন মুখোশের ও প্রসাধনের শিল্প। লিটল ম্যাগাজিনের যোদ্ধারা এতে ভয় পান না। কারণ রাজা যে আসলে উলঙ্গ, সে-খবর তাঁদের জানা। কিন্তু এও ঠিক যে, বিজ্ঞাপনের চাতুর্যে অনবরত সব পেয়েছির রঙিন দেশের হাতছানিতে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রতিভাবাদর্শের ঔদ্ধত্যকে যে রোখা সম্ভব কেবলমাত্র ভাবাদর্শের শক্তিতে, একথা ভুলে গিয়ে চটজলদি নামী-দামী হওয়ার জন্যে

সেইসব বিভ্রান্ত লিখিয়েরা আত্মসমর্পণ করে বসেন। এবং, সেই মুহূর্ত থেকে স্বাধীন লিখিয়ে থেকে তাঁরা পরিণত হয়ে যান ভাড়াটে কলমচিতে। ভুলে যান, কয়েক বছর স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে পারলেও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি তাঁদের মরা ইঁদুরের মতো ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ষাটের দশকের শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার বা প্রথাবিরোধী কবিদের বেশ কয়েকজন স্বধর্মচ্যুতির মাশুল কীভাবে দিচ্ছেন, এর নজির চোখের সামনে রয়েছে। এঁরা এবং এঁদের আগে ও পরে আরও কবি-লিখিয়েরা সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছেন এবং অবধারিতভাবে কয়েক বছর যেতে-না-যেতে হারিয়ে ফেলেছেন তাঁদের সৃষ্টির উত্তাপ ও ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞান। এ থেকে ছোট পত্রিকার অনেক কিছু শেখার আছে। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের কথা, ইদানীং জোয়ারের বদলে ভাঁটার টান যেন অনুভূত হচ্ছে। চোরাগোপ্তা পথে আপস করতে করতে কেউ কেউ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন দু-নৌকায় পা রেখে চলতে। গাছের খাওয়া এবং তলারও কুড়োনো চলেছে এক সঙ্গে, বিনা দ্বিধায়। যে-কারণে জন্ম হয়েছিল লিটল মাগাজিন নামক প্রতিজ্ঞার, তাই যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে। বিশ্বপুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক আয়ুধ আধুনিকোত্তরবাদকে প্রসঙ্গহীনভাবে রপ্ত করতে গিয়ে হাঁসজারু মানসিকতা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। এই উপমহাদেশ, বিশেষভাবে বাঙালির ভুবন, পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রমোদভ্রমণে সামিল হতে যত উৎসুক হয়ে উঠছে—লিটল ম্যাগাজিনের সংকটও ঘনীভূত হচ্ছে তত।

এ সময় পশ্চিম বাংলায় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিচিত্র সন্ধিলগ্নে পৌঁছেছে। একদিকে ফাঁপা হয়ে পড়ছে স্পর্ধিত ইমারতগুলি, আবার অন্যদিকে গড়ে উঠছে নতুন-নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র। একেক ক্ষেত্রে একেক মুখোশ। এদের দ্বন্দ্বে আরক্ত সাম্প্রতিক সাহিত্য। ছায়া ও প্রচ্ছায়ায় আকীর্ণ হয়ে অকারণ জটিলতা যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে যেন সৃষ্টির বৈচিত্র্য। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন নামক প্রতিস্রোতবাহী আন্দোলনের। লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমা ক্রমশ দিনের নিয়মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা যখন বিকল্প সন্দর্ভ ও বিকল্প নন্দনের আশ্রয়ভূমি হয়ে ওঠার কথা ছিল, তখন পোষাক বিনিময়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে প্রতিবাদী চলনের স্পৃহা। অতি অল্পেতে তুষ্ট হয়ে যাচ্ছেন সেইসব আশুতোষ লিখিয়েরা, বছর ত্রিশেক আগে বিপুল সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে যাঁদের অগ্নিস্নান সম্পন্ন হয়েছিল। এঁদের দেখাদেখি তরুণতম লেখকেরাও, প্রস্তুতিপর্ব শেষ হওয়ার আগেই, যুগপৎ দুধ ও তামাকে অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি শিখে নিচ্ছেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, লিটল ম্যাগাজিন যেমন প্রতিবাদী শক্তির প্রতীক তেমনি বহুধা-বিভক্ত হয়েও প্রতিষ্ঠান মূলত মানবিক নির্যাস শোষণকারী অপশক্তির অন্য নাম। বাঘের হিংস্রতা, কেউটের বিষ, শেয়ালের ধূর্ততা এবং যন্ত্রগণকের দক্ষতা সমন্বিত হতে দেখি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতাপের কৃৎকৌশলে। এইজন্যে এ সম্পর্কে শৈলেশ্বর ঘোষের মন্তব্য আমাদের আলাদা মনোযোগ দাবি করে :

'জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাই হবে সাহিত্য। সাহিত্য আমাদের কাছে কল্পনাবিলাস

বা ভাববিলাস নয়। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা দিয়ে আমাদের সাহিত্যের শুরু, শেষ হবে, আমরা মনে করি, প্রত্যেকের জীবনের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে। চেতনার ক্রমপ্রসারণ প্রক্রিয়ায় দেখা দেবে এই সম্ভাবনা। এটা বুঝতেই হবে যে একজন স্রষ্টা আর একজন সাহিত্যব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য একজন ভ্রমণকারী ও একজন দারোয়ানের পার্থক্যের সমান!' (প্রতিবাদের সাহিত্য : পৃ ৯৪)

৩

শৈলেশ্বর যখন বলেন 'জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা'র কথা, স্পষ্টত তা প্রাতিষ্ঠানিক পণ্য-সাহিত্যের মেকি বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে তোলে। হাংরি প্রজন্মের দর্শন যদিও এতে ব্যক্ত হয়েছে, আসলে তা খাঁটি লিটল ম্যাগাজিনের অন্বিষ্ট। জীবনকে যে অপশক্তি খাঁচায় বন্দী করতে চায়, তার লক্ষ্যই হল মিথ্যার আবর্জনাস্তূপের সম্প্রসারণ। এর মোকাবিলা করতে চায় যারা, তাদের সমিধ সংগ্রহের জন্যে কোনো বানানো বাস্তবতায় গেলে চলে না। জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে রসদ নিয়ে তাদের বিনির্মাণ করতে হয় যাবতীয় সন্ত্রাস ও রুদ্ধতার কারিগরিকে। মানুষের নিষ্কর্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হয় সেই নবীন চেতনাকে যা কেবলই যথাপ্রাপ্ত পরিসরকে পুনর্নির্মাণ করে। চেতনা অনবরত সম্প্রসারিত হয় যখন, স্থবিরতার উল্টো মেরুতে গতি তীব্র দ্যুতি অর্জন করে নেয়। মানুষের হওয়া আর হয়ে ওঠা কত যে সম্ভাবনায় স্পন্দিত, সেই বার্তা পৌঁছে দেয় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। রোলাঁ বার্তের কথায়, এই উদ্দেশ্য হল 'To undo our own reality under the effect of other formulation !' প্রতিষ্ঠানের চক্রান্তকে ওই সম্ভাবনার নিরন্তর কর্ষণ করেই প্রতিহত করতে পারেন ছোট পত্রিকার লড়াকু যোদ্ধারা। শৈলেশ্বর লিখেছেন : 'প্রতিষ্ঠান যা প্রত্যাখ্যান করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তাই গ্রহণ করে, প্রতিষ্ঠান যা ঘৃণা করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তাতেই আনন্দ পায়, প্রতিষ্ঠান যা ধ্বংস করতে চায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তাই লালন করে, প্রতিষ্ঠান যা পাপ মনে করে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তাকেই ধর্ম মনে করে, প্রতিষ্ঠানের থাকে পোষা কুকর, প্রতিষ্ঠান-বিরোধীর থাকে ক্ষুধার্ত বাঘ, প্রতিষ্ঠানের কাছে যা যৌনতা প্রতিষ্ঠান-বিরোধীর কাছে তাই ভালোবাসা, প্রতিষ্ঠানের কাছে যা জীবন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধীর কাছে তাই মৃত্যু। প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা করে বিদ্রোহীর দুর্বলতা খুঁজে নিয়ে তাকে ইতিহাসে ঢুকিয়ে দ্যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এমন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে যা প্রতিষ্ঠানের মাথায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় এবং বুর্জোয়া ইতিহাস তাকে ভয় পায়'। (তদেব)

সুতরাং, দুটো-চারটে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাপিয়ে দিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের দায় শেষ হতে পারে না। সমস্ত প্রচলিত নান্দনিক-সামাজিক অভ্যাস ও সংস্কারকে প্রত্যাহ্বান জানায় না যেসব লেখাপত্র অর্থাৎ যা আধিপত্যবাদী বর্গের নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন উদ্ধত অবস্থানে অস্বস্তি জাগাতে পারে না—ছোট পত্রিকার দুর্মূল্য পাতা ভরানোর কোনো অধিকার তাদের নেই। এর মানে এই যে, কেবলমাত্র প্রতিবাদ বা এমন কি বিদ্রোহ করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, ছোট পত্রিকাকে বিস্ফোরক উত্তাপের কেন্দ্রও হয়ে উঠতে হবে।

নইলে ধারাবাহিক ভাবে অবক্ষয়ের বিষ-জীবাণু সংক্রামিত করে তরুণ লেখক-প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে প্রতিষ্ঠান। লিটল ম্যাগাজিনের পালের হাওয়া সহজে কেড়ে নেওয়া যায় না নিশ্চয়। কিন্তু এও অনস্বীকার্য যে, বারবার চিলের মতো ছোঁ দিয়ে প্রতিষ্ঠান যদি শিকার তুলে নিতে থাকে—ছোট পত্রিকার অস্তিত্বগত তাৎপর্য অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষত লড়াই যখন সম্মিলিত তারুণ্যের সঙ্গে সর্বগ্রাসী দাম্ভিক মিথ্যার, এই অপক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণতি জনিত সংকটকে হাল্কাভাবে দেখা চলে না। এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত সুবিমল লিখেছেন : 'প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এমন গভীর ও নেপথ্যচারী যে খুব কম সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব তার গ্রাস থেকে রেহাই পাওয়া। প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিশীল, প্রতিভাসম্পন্ন উঠতি তরুণ কবি-সাহিত্যিকের সামনে এক আপাত-দুর্ভেদ্য, অথচ বহু বর্ণ-সমন্বিত মায়াবী রহস্যের দরজা খুলে দেয়, ঝালরি পর্দা দোলায়, তখন খ্যাতির মোহ, অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার নিশ্চিতি থেকে নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে রাখা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ওরা মুক্ত চিন্তার, নিশ্চিতির কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে, উদার নীতির কথা শোনায়, চাই কি গভীর বোধজাত নান্দনিকতার কথা উচ্চারণ করে, প্রতিষ্ঠানে প্রবিষ্ট হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত, কিন্তু একবার স্বর্ণশৃঙ্খলিত ফটক পেরুলেই চিরবন্দী।' (১৯৯৫ : ৭৬) খুব সত্যি কথা। এত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে আছে যে বন্দিত্বের আগে ও পরে কীভাবে একই মানুষ দুই মানুষে পরিণত হয়—এটা খোঁজার জন্যে কোনো তাত্ত্বিক বয়ানের প্রয়োজন পড়ে না। ছোট পত্রিকার ধ্বজদণ্ড যাঁরা বহন করেন, তাঁদের আসলে শুরুতেই জীবন সম্পর্কে একটি মৌলিক ঘোষণা করে নিতে হয়। অন্য কারও কাছে নয়, নিজেরই কাছে। একটাই তো জীবন আমাদের, একে স্বাধীন রাখব নাকি সম্ভোগের নেশায় বন্ধক রাখব প্রতাপের কাছে? কী করব এই জীবন নিয়ে : বাঙালির কাছে এই প্রশ্ন নতুন নয়। লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলনে যাঁরা শরিক, তাঁরা এই পুরনো প্রশ্ন তবু পুনরুত্থাপন করছেন অনেক বেশি মরিয়া হয়ে। বলা ভালো, কার্যত জীবন-মরণ প্রশ্ন হিসেবে।

কিন্তু 'করছেন' ক্রিয়াপদটি কি যথার্থ প্রয়োগ হল? সত্যিই করছেন কি তাঁরা! নাকি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রসারিত সামাজিক বিষয়বস্তুকে দেখার মতো 'দ্রষ্টা-চক্ষু' যাঁদের অধিগত, সংখ্যাগত বিচারে তাঁরা আসলে হাজারে এক? তাহলে, ছোট পত্রিকা কেন করছেন সরকার আশরাফ বা সমীরণ মজুমদারের মতো সম্পাদক-সংগঠক? তাঁরাও কি মনের মতো লেখা ছাপাতে পারেন সব সময়! নাকি স্বপ্নের লেখা ছাপানোর স্বপ্ন দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছে অনেক দিনরাত্রি! প্রচলিত পদ্ধতিতে যা কুলোয় না, সেই সময়-বাহিত অন্তর্বস্তু কটি প্রতিবেদনে থাকে? বিপ্লবী বক্তব্যের জন্যে বিপ্লবী উপস্থাপনার অনিবার্যতা কজন জানেন, বোঝেন এবং প্রয়োগ করছেন! এই প্রশ্নমালার জবাবে যে অনিশ্চিত উত্তর আসবে বলে অনুমান করছি, তাতেই কি ছোট পত্রিকার আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার কারণ নিহিত নেই? এই নিবন্ধের শুরুতে আত্মবিনির্মাণের কথা যে লিখেছি, সেখানেই কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের সবচেয়ে বড়ো জোর। কেননা নিজেকে অনবরত ভাঙতে পারে না যে, প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্তে সে তো আত্মপ্রতিষ্ঠানে

আরেকটি ইট যোগ করবে। অতএব ছোট পত্রিকা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কেবলই প্রশ্ন তুলে ধরুক, পড়ুয়াদের জন্যে অস্বস্তি তৈরি করুক। সাহিত্য 'করা' কথাটার মধ্যে যে সামন্তবাদী দাতা-গ্রহীতার বিভাজন ইঙ্গিতে রয়ে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে জীবন ও জগতের সাহিত্য-হওয়া লক্ষ করুন পড়ুয়ারা। বলা ভালো, তাঁরা নিজেরা ওই প্রতিবেদন-নির্মিতির অবিভাজ্য অঙ্গ হয়ে উঠুন। কেবলমাত্র এভাবেই গড়ে উঠতে পারে বিকল্প নন্দন, বিকল্প সন্দর্ভ, বিকল্প অনুভূতির পরম্পরা।

কথা হলো, বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার মতো স্বেচ্ছাব্রতী ইঁদুর সমাজে পাওয়া ভার। ভক্ষকের সঙ্গে ভক্ষ্যের মৈত্রী অসম্ভব, এমন কি আপাত-মৈত্রীও আত্মহননের মূর্খ উচ্ছ্বাসমাত্র। আজকের বাঙালি সমাজ যাদের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তের চাতুর্যে শতধা-বিচ্ছিন্ন এবং প্রতিটি একক সত্তা অন্য একক সত্তা থেকে দ্বীপের মতো সুদৃঢ় ও অনধিগম্য, তাদের জটিল গ্রন্থনাকে শনাক্ত করাই লিটল ম্যাগাজিনের সাহিত্যকৃতি। শুধুমাত্র সপ্রতিভ ভঙ্গি দিয়ে যেসব বন্ধুরা অন্যের চোখে ধুলো দিতে ও ঠুলি পরাতে চান, তাঁরা আসলে যে নিজেদের আধিপত্যবাদী বর্গের ঢাকের কাঠিমাত্র করে তোলেন—এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। ছোট পত্রিকার নামে আত্ম-প্রত্যাখ্যানের এই মারক অভ্যাসও যে অনেকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন, তা অস্বীকার করব কীভাবে! নিসর্গ বা অমৃতলোক বা উত্তরাধিকার এই সত্য যদি জেনে থাকেন, তাহলে তাঁরা কাগুজে বাঘদের প্রতি তর্জনি সংকেতের দায়িত্ব নিন। শুধু কি তাই! বিশ্বজুড়ে আজ মৌলবাদী প্রতিক্রিয়ার বাড়বাড়ন্ত। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাঙালির ভুবনে, পেছনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তাড়নায় সাংস্কৃতিক মৌলবাদ ক্রমশ পরিশীলিত ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলায়, বাংলাদেশে এবং বাঙালির অন্য ভূগোলেও ঐতিহ্য-মূলকতার নামে কিছু কিছু লিটল ম্যাগাজিন অতীতমোহ বিস্তার করতে চাইছে। অবধারিত ভাবে ধর্মীয় কুহক তাতে পুনর্বাসন পেয়ে যাচ্ছে। এই কি অপ্রাতিষ্ঠানিকতার নিদর্শন! সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিংস্রতম ও কুটিলতম অচলায়তনে ফিরে যাচ্ছেন যাঁরা সূক্ষ্ম ও কৃৎকুশলী পরিশীলনের আড়ালে—তাঁদের ইতিহাসবোধ ঝাপসা। অন্তত বাঙালির হাজার বছরের উত্থান-পতন অগ্রগতি-পশ্চাৎবর্তন স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ আত্মহনন-পুনর্নির্মাণ থেকে কোনো পাঠ এরা নেননি। সবচেয়ে বড়ো কথা, সব ধরনের প্রতিষ্ঠানিকতা ভেঙেই যে বাঙালি চিরকাল বিকল্প পথ, পাথেয় ও গন্তব্য গড়ে নিয়েছে—এই মূল সত্য তাদের উপলব্ধিতে নেই। সমস্ত দিক দিয়ে আজ আমরা ক্রান্তিকালের আবর্তে। এ সময় খাঁটি লিটল ম্যাগাজিনের পতাকাবাহকেরাই কেবল আমাদের পৌঁছে দিতে পারেন নতুন সম্ভাবনার সহস্রাব্দে। তাঁরা যদি ব্যর্থ হন, বাঙালির লেখা-লেখা খেলা থেকে নির্বাসিত হবে আবহমান বাংলা।

৪

লিটল ম্যাগাজিনের যারা শত্রু, তাদের জীবনেরই শত্রু বলে অনায়াসে শনাক্ত করা যায় আজ। আমাদের দৈনন্দিন প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপে। আমরা যত নগ্ন

হচ্ছি, তত তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অবসাদ আর আত্মপ্রতারণা। কিন্তু উল্টো দিকে শত্রুপক্ষের চাতুর্য বাড়ছে, পরিশীলন বাড়ছে, মুখোশের কারুকাজ বাড়ছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, অর্ধেক দশক যেতে না যেতে ভেঙে যাচ্ছে সংঘ। বড়ো বেশি একক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন। ছোট পত্রিকার ভেতর থেকেই তাকে চুরমার করে দেওয়ার কসরত। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে নিজেরা খুদে খুদে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে চাইছি আমরা। লিটল ম্যাগাজিন মানে বিকল্প পথ-পাথেয়-গন্তব্য এবং বিকল্প দর্শন-নন্দন-গ্রন্থনা : এই গোড়ার কথাটা অনেকেই আজ মনে রাখছি না। তবে কি সাহিত্যের মুষলপর্ব এসে গেছে, যখন, প্রত্যেক সহযাত্রীর মুঠোয় ধরা পাটকাঠিও বল্লমে রূপান্তরিত হবে! প্রয়োজন কি সত্যি ফুরিয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের? এবার তাহলে লেখা হবে সমবেত এপিটাফ, কারণ, আন্দোলন হিসেবে তার মৌল অস্তিত্ব আজ অস্বীকৃত। এখন কেবল অশ্মীভবনের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যে নিরাবেগ প্রতীক্ষা।

অর্থাৎ গণশত্রুদের পোয়াবারো। তাদেরই উদ্যত খড়্গের নিচে নতশির হবে জীবনের সংস্কৃতি! এরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে বলাৎকার করাবে, ক্রয়মূল্য দিয়ে ঠিক করে দেবে অস্তিত্বের উপযোগিতা, ঘাতকের বেপরোয়া হিংস্রতার কাছে যাবতীয় মানবতাকে কুঁকড়ে যেতে বাধ্য করবে। লিটল ম্যাগাজিনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া কি এই অনিবার্য ভবিতব্য নয়? নিশ্চয় সরকার আশরাফ বা সমীরণ মজুমদার বা তাঁদের অন্য সহযোদ্ধারা এই আত্মবিলয় মেনে নেবেন না। বরং তাঁরা আরও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, ছোট পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশ মানে আপসহীন যুদ্ধ জারি রাখার ঘোষণা। সুতরাং এর প্রতিটি পাতা যেন লক্ষ্যভেদী হয়, প্রতিটি রচনা যেন হয় রণক্ষেত্রের বিস্তার—নতুন করে বরং এই চিন্তায় তাঁরা শান দিন। অন্ধকার এই মুহূর্তে গাঢ়তম বলেই তো নিসর্গের-একবিংশের-অমৃতলোকের-কবিতীর্থের নিরবচ্ছিন্ন আলোর ঝলকানি এতখানি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে। তবে পরিশীলিত শত্রুরা যখন কৌশলী ও সংঘবদ্ধ, সে-সময় ছোট পত্রিকার কর্ণধারদের মধ্যে অর্থহীন (ও, কখনো-কখনো, ন্যক্কারজনক) কলহ বন্ধ হোক। ঈর্ষা ও অসূয়া সমবায়ী চেতনার পক্ষে মৃত্যুকীট। বলা বাহুল্য, ওই সমবায়ী চেতনার সমৃদ্ধিতে ছোট পত্রিকার আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয়ে থাকে। পথ আলাদা হোক, ক্ষতি নেই। কেননা এসময় বহুত্বদ্যোতক, বহুস্বর-সঙ্গতি একালের অন্বিষ্ট।

বরং, তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনাপর্বে দাঁড়িয়ে, লিটল ম্যাগাজিনের যোদ্ধারা আত্মখননকে সমাজখনন ও সময়খননের দ্বিবাচনিকতায় প্রতিষ্ঠিত করার নতুন-নতুন পথ ও পাথেয় খুঁজে নিন। বিষয় নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না, আঙ্গিক নিয়েও নয়। দ্রষ্টা চক্ষু যখন মেলে রাখছি আমরা, অপ্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের প্রতি দায়বদ্ধতা যখন অবিচল রাখছি—বিষয় ও আঙ্গিক নিজে থেকেই ধরা দেবে। ক্রান্তিকালে পরিধির অবিরাম বিস্তার ঘটিয়ে যাওয়াই কাম্য। যন্ত্রসভ্যতার সাম্প্রতিক উৎকর্ষের পর্যায়ে যেভাবে চিন্তার বিশ্বায়ন ঘটে গেছে, তাতে লিটল ম্যাগাজিনের জন্যে তৈরি হয়েছে অভূতপূর্ব প্রত্যাহ্বানের পসরা।

পাঁচ বছর আগেও বাঙালির ভুবন ঠিক এরকম ছিল না। সন্দেহ নেই যে, পাঁচ বছর পরেও আজকের মতো থাকবে না। খাঁটি হাওয়ামোরগের মতো লিখিয়েদের, সম্পাদকদের আজ শুষে নিতে হবে দ্রুত ধাবমান সময়ের বার্তা। তবু শব্দাতিগ গতির এই পরিবর্তনমালায় পুঞ্জীভূত আন্তর্জাতিকতা চিন্তাবিশ্বে যে-বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে—তা যেন বাঙালির নিজস্ব অনুভবকে গ্রাস না করে। কতখানি গ্রহণ করব কতখানি বর্জন আর কতখানি বা পুনর্নির্মাণ করব—পড়ুয়াদের কাছে এ বিষয়ে অত্যন্ত জরুরি দিগদর্শক সংকেত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন লিটল ম্যাগাজিনের যোদ্ধারা। এত গতির ঘূর্ণাবর্তেও কোন উপকরণ স্থির অপরিবর্তনীয়—নতুন-নতুন প্রতিবেদন ও বয়ন তৈরি করে সেদিকেও তাঁরা আলোকপাত করুন। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড়ো দায় আর কিছু নেই।

এসময় নাকি সংশয়ের, আকছার শোনা যায় একথা। সত্যভ্রম নাকি এখন বেশি জোরালো ও কার্যকরী, এমন ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু বোধহয় কর্কশ সত্যটা বলে নেওয়াই ভালো। যাদের কোনো কেন্দ্র নেই, এমনকি কেন্দ্রহীনতাই যাদের অভিজ্ঞান ও প্রত্যয়—এরা কিন্তু ছদ্মবেশী। অপ্রাতিষ্ঠানিকতা তাদের কাছে সিঁড়িমাত্র, ব্যবহার করুন এবং ছুঁড়ে ফেলে দিন গোছের আসবাব। গাছের খেতে খেতে আর তলার কুড়োতে কুড়োতে এরাই ফন্দিফিকির খুঁজে বেড়ায়, কীভাবে কোথায় উপরে ওঠার পথটা লুকোনো। সাহিত্য 'করা' এদের কাছে নামী-দামী হওয়ার জন্যে, কোনো সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে নয়। ছদ্মবেশও তাই যখন-যেমন পরে নেয় এরা। সংশয় এদের জন্যে কারণ চোখের ঠুলিটা তো নজরে পড়ে না কখনো। লেখক-জীবনের শুরুতে অধ্যবসায় থাকে, থাকে আবিষ্কারের স্পৃহা। কিন্তু পরে একে একে সব ঝরে যায়। যে যে আকল্প পড়ুয়ারা সাদরে নিয়েছেন, এরা কেবলই এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। নিজেকে ভাঙার মধ্যে পাঠকের সমর্থন হারানোর শঙ্কা থাকে বলে নিজের মৌচাকে নিজেই বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। সংশয়বাদ এদের খেয়া-পারানির কড়ি হয়ে পড়ে।

স্বভাবত লিটল ম্যাগাজিন এই সংশয়বাদে বিশ্বাসী নয়। অন্তত সাম্প্রতিক পর্বান্তরের আবহে নিশ্চিতভাবে ছোট পত্রিকার ওপর ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে। আঁধির মধ্য দিয়ে পথ ও পাথেয় চিনে নেওয়ার এই দায় যুগপৎ আত্মবিনির্মাণের, জগৎ-বিনির্মাণেরও। বাঙালির শেকড়ে জল নেই নানা কারণে। 'জল দাও' আর্তিকে মান্য করে প্রাকৃতায়নকেও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। অথচ একই সঙ্গে আত্মস্থ করে নিতে হবে চিন্তার বিশ্বায়ন-সম্পৃক্ত প্রবণতাগুলিকেও। সত্য যে দ্বিবাচনিক, ছোট পত্রিকা নিজের বহুমাত্রিকতার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট করে তুলুক। ঘটতে থাকুক অজস্র বিচ্ছুরণ, উত্থাপিত হোক প্রশ্নের পরে প্রশ্ন। লিটল ম্যাগাজিন নামক শমীবৃক্ষে মেগা প্রশ্নমালার আগুন যেন নির্বাপিত না হয় কখনো।

সাহিত্যতত্ত্বের সহজ পাঠ

গত কয়েক বছরে বাঙালির পাঠাভ্যাস নামক অচলায়তনের প্রাচীরে বেশ কিছু ফাটল দেখা দিয়েছে। পড়ার চিরাচরিত ধরন কিছুতেই বজায় থাকছে না। চিন্তা-চর্চার কোনো ক্ষেত্রই আর সুনির্দিষ্ট দীক্ষিতজনদের মধ্যে রুদ্ধ নয়। বহুদিন যে যাঁর সীমানার মধ্যে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্নভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা করে গেছেন। সামাজিক জীবনে বড়োসড়ো ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে প্রাচীরগুলি হয়তো কেঁপে উঠেছে কিম্বা পাথর খসে পড়েছে ; কিন্তু চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় এইসব উৎপাত শুষে নিতেও দেরি হয়নি। সময়-স্বভাবের কথা বিদ্বজ্জনেরা বিবেচনা করেছেন হয়তো এবং বিবর্তনশীল সময়ের অনুশীলন করে নতুন কিছু উপাদানও আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু কাঠামোর খোলনলচে পাল্টে নেওয়ার কথা ভাবেননি। মানুষের অস্তিত্বগত নির্যাস এবং তার হওয়া ও হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া কীভাবে সময়ের গ্রন্থিল বাস্তবতায় সম্পৃক্ত এবং অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ কেন অজস্রবার বদলে যাচ্ছে—তার যথার্থ অনুশীলন হয়নি।

একুশ শতকের প্রত্যুষে আমরা দেখছি, আমাদের চেনাজানা পৃথিবী গত একশ বছরে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতি অন্যদিকে নিজেরই গড়া সাজানো বাগানকে ঘাতকের নির্মমতায় উপড়ে ফেলছে মানুষ। ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বদলে যাচ্ছে মুহূর্মুহু, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তঃসার খোঁজার বদলে আমরা নিজেদের অজান্তে বহিরঙ্গসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। বাইরের জগতে তুমুল আলোড়ন-ই চলছে না শুধু, উদ্দাম গতি তৈরির তাড়নায় আজকের সব চিহ্ন ও প্রত্যয় আগামী কালই মুছে যাচ্ছে। যে-কোনো মূল্যে নতুন হওয়া ও নতুন থাকার তাগিদ সব বিশ্বাস, দায়বোধ ও মূল্য-চেতনাকে অবান্তর করে দিচ্ছে। ফলে কোথাও কোনো স্থিরতা নেই, কেন্দ্র নেই কাজে কিংবা চিন্তায় ; আছে কেবল চাওয়া পাওয়ার মাদকে নিজে আচ্ছন্ন হয়ে অন্যকেও আচ্ছন্ন করার প্রক্রিয়া। বিশ শতক মানুষকে কেবল লেনিন, মাও সে তুং, চে গুয়েভারা দেয়নি—হিটলার, আইখম্যানদেরও দিয়েছে। এযুগে মহাত্মা গান্ধী-নেতাজী-সুভাষচন্দ্র-ফিদেল কাস্ত্রো যেমন রয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে মুসোলিনি-গর্বাচ্যভ-বিল ক্লিন্টনের মতো ইতিহাসের খলনায়কেরাও। এ যুগ ফ্রয়েড-সার্ত্র-আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ-কাম্যু-মার্কেজের যতখানি, ঠিক ততটাই প্রতিভাবাদর্শের অজস্র স্থপতিদেরও। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে।

মোদ্দা কথা হল, বিশ শতকের বহুরৈখিক মানবিক উপার্জন ধ্বস্ত হয়ে গেছে হিরোশিমা নাগাসাকিতে, ইরাকে বসনিয়ায়, নাৎসি বন্দী শিবিরে, ইথিওপিয়ায়,

সোমালিয়ায় ক্ষুৎপীড়িত মানুষের মিছিলে। গত তিন দশকে ঐশ্লামিক মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, নব্য নাৎসিবাদ ইত্যাদির পুনরুত্থানে মুক্ত আলো-হাওয়া-রোদ অনেকটা বিষিয়ে গেছে। এই সময় আত্মপ্রতারণার, পারস্পরিক প্রবঞ্চনারও। ইতিহাস, সামাজিক প্রগতি, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়কে মহাআখ্যান বলে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, এরা যে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধাঁচের ও চরিত্রের নয়া উপনিবেশবাদী কৃৎকৌশলগুলিকে আরও পোক্ত করতে চাইছে এবং মানুষকে নির্বাসন দিচ্ছে তারই যত্নে-গড়া জগৎ থেকে—এই অনস্বীকার্য সত্য থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার আয়োজন এখন সর্বত্র। এই মুহূর্তে যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা।

আবার এরাই সব ধরনের মৌলিক জিজ্ঞাসা থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে চায়। এবং এরাই, অগভীর সফরি-সঞ্চরণে অভ্যস্ত থেকে যাবতীয় জিজ্ঞাসু প্রতিবেদনকে তত্ত্বকথা বলে পরিহাস করে আসর জমিয়ে তোলে। এতে অযোগ্যতা ও অক্ষমতা জনিত কিছু অস্বস্তি থেকেও খুব সহজলভ্য পরিত্রাণের পথ এরা পেয়ে যায়। তাদের অগভীরতা, অন্তঃসারশূন্যতা, আঙ্গিক-সর্বস্বতা, সময়-নিরপেক্ষতা আড়ালে চলে যায়। চিন্তা ও মননের সংকীর্ণতা, অনুভূতি ও উপলব্ধির অভাব, ধারাবাহিক অধ্যয়নে অনীহা, বিশ্লেষণে ব্যর্থতা যখন সীমাহীন, তখনই 'তত্ত্ব' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র এরা আঁৎকে ওঠে। থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, এদের জন্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হল প্রবাদের সেই অণুগল্পটি : 'কত রবি জ্বলেরে? কেবা আঁখি মেলেরে!'

২

মূল প্রশ্নটা হল : তত্ত্ব কী এবং তত্ত্বের কেন প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচিত হয়েছে। তবু আরও একবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

'তত্ত্ব' এর আভিধানিক অর্থ হল স্বরূপ বা যাথার্থ্য। অন্যভাবে বলা যায়, বস্তুস্বরূপই তত্ত্ব। কোনো ঘটনা-বিন্যাস বা ভাব-বিন্যাসের সারাৎসার যখন অনুসন্ধান করি এবং সেই অনুসন্ধানের বার্তা বা প্রতিবেদন তৈরি করি, তখনই তত্ত্বকথা জন্ম হয়। তার মানে, তত্ত্ব হল বিশেষ দৃষ্টি এবং দার্শনিকেরই অন্য নাম তাত্ত্বিক। ইংরেজি ভাষান্তরে তত্ত্বকে বলি 'Theory'। এতেও রয়েছে দেখারই প্রসঙ্গ। ল্যাটিন ও গ্রিক উৎসমূলে পাচ্ছি 'Theoria' যার আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ (Webster's 3rd New international Dictionary, 1986 : 2371 অনুযায়ী) হল 'act by viewing, contemplation, consideration'। আর, একই উৎসজাত ফরাসি 'Theorein' এর অর্থও 'to look at, behold, contemplate, consider'। ওই একই অভিধানে শব্দটির প্রাচীন প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, Theory হল 'Imaginative contemplation of reality, Direct intellectual apprehension, insight', অর্থাৎ বাস্তবতার কল্পনা-নিষিক্ত উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ বৌদ্ধিক উপপত্তি বা অন্তর্দৃষ্টি হল

তত্ত্বের সারাৎসার। যিনি প্রতীয়মানের নির্মোক ভেদ করে গভীরে দৃষ্টিপাত করতে পারেন, তিনিই তাত্ত্বিক।

উল্টো করে বলা যায়, সাহিত্যের কিংবা সমাজের কিংবা দর্শনের কোনো প্রতিবেদন থেকে নির্যাস খুঁজে নিতে চাইলে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া আবশ্যিক। যাদের মনোযোগ কেবল বহিরঙ্গে সীমিত থাকে, তারা আসলে খোলসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে শাঁসের দিকে নজর দিতে ভুলে যায়। এরা চোখ থাকতেও অন্ধ, মন থাকতেও মননহীন। এইসব দৃষ্টিহীন জনেরাই প্রকরণ-সর্বস্ব হয় এবং বহু প্রজন্ম ধরে সুনির্দিষ্ট প্রথাসিদ্ধ পথে চলতে পারলে স্বস্তি বোধ করে। অতএব এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে এ ধরনের মানুষ-জনেরা তত্ত্বের ওপরে সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত। এই অচলায়তনের দ্বাররক্ষীরা সমালোচনার নামে নিরপেক্ষ বাক্যপিণ্ডের সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে। প্রচলিত চিন্তা-পদ্ধতি বলতে যা বোঝায় তাকেই নির্বিচারে মান্যতা দিয়ে যায়। এদের মনে কখনো কোনো জিজ্ঞাসা জাগে না। তাই পাঠকও তাঁদের রাশিরাশি ভারাভারা বাক্যস্রোত থেকে নিজের মনে কোনো প্রশ্ন উঠে আসতে দেখেন না।

দেখা যাচ্ছে, ধ্রুপদী গ্রিক ও রোমান মনীষা দৃষ্টির বিশেষত্বকেই সত্য সন্ধানের মুখ্য হোতা বলে জেনেছিল। অতএব তত্ত্ব মানে গভীর বিশ্বাস ও অবস্থান গ্রহণের প্রস্তাবনা। প্রাগুক্ত অভিধান দৃষ্টি ও তাত্ত্বিকতাকে অভিন্ন বলে জেনে এদের গভীরতর ব্যঞ্জনাকে প্রসারিত করে জানিয়েছে যে তত্ত্ব বা Theory হল '(a) belief, policy or procedure proposed or followed as the basis of action ; a principle or plan of action ; (b) an ideal or hypothetical set of facts, principles of circumstances, (c) the body of generalisations and principles developed in association with practice in a field of activity ; (d) the coherent set of hypothetical, conceptual and pragmatic principles forming the general frame of reference for a field of enquiry ; (e) a hypothetical entity of structure explaining or relating an observed set of facts' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, গ্রিক বিশ্ববীক্ষায় দেখা বা বীক্ষণ ছিল সমস্ত বৌদ্ধিক উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দু। তাই দৃষ্টির বহুধা-বিচ্ছুরণ মূল অভিধা থেকে ক্রমাগত নানা ধরনের ব্যঞ্জনা নিঙড়ে নিয়েছে। শুধু কি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায়, গ্রিক জীবনের আরও দুটি প্রধান পরিসরে তত্ত্বের মূলাধার 'দেখা'কে আমরা প্রসারিত হতে লক্ষ করি। যেমন জ্যামিতিক উপপাদ্য বা Theorem উদ্ভূত হয়েছে গ্রিক (এবং ল্যাটিন) Theorema থেকে যার আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে Sight বা Spectacle। ফরাসি ভাষায় Theoros হল Spectator অর্থাৎ দর্শক। সুতরাং এখানেও দেখারই রকমফের।

এই দৃষ্টির বিচ্ছুরণ থেকে দেখা দিচ্ছে বস্তুতে বস্তুতে, প্রতীকে প্রতীকে, বস্তুতে প্রতীকে বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন। এই দৃষ্টিই রয়েছে Theater বা নাট্য-ক্রিয়ায়। গ্রিক Theatron ইংরেজিতে বোঝাচ্ছে To see, view, action of seeing। আসলে

মূল গ্রিক শব্দের পূর্বপদ এই দৃষ্টির ক্রিয়া বোঝায় আর প্রত্যয়-সূচক উত্তরপদ বোঝায় means, instrument or place। এভাবে ভাষার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতধর্মিতায় চেতনার উন্মেষপর্ব থেকে বিশিষ্ট দৃষ্টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তত্ত্ব বা Theory-র অব্যাহত যাত্রা কোনো নতুন কথা নয়। গত ত্রিশ বা চল্লিশ বছরে যদি তাত্ত্বিক প্রতিবেদনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব খুব বেশি মাত্রায় লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকে, এর মানে নিশ্চয় এই নয় যে এ কোনো নতুন প্রবণতা। মানুষ যেদিন থেকে অস্তিত্ব ও জগতের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েছে, সেদিন থেকেই তত্ত্বেরও সূচনা হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ যদি কেউ ঘুম ভেঙে উঠে বলেন, এসব তত্ত্বটত্ত্ব আবার কেন—তাহলে তিনি আত্মপ্রতারণা করছেন মাত্র।

৩

যাঁরা খুব বিজ্ঞের মতো 'গাছ আগে না ফল আগে' গোছের যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আগে সাহিত্য পরে তত্ত্ব কিংবা আগে সমাজ পরে তত্ত্ব (অথবা আগে অভিজ্ঞতা পরে উপলব্ধির সূত্র) তাঁরা শুধু বিভ্রান্তি ছড়ান। যেখানে কোনো বিভাজন নেই, সেখানে জলবিভাজন রেখা কল্পনা করে তাঁরা নিজেদের চিন্তাদৈন্য ও অগভীরতাকে ধরিয়ে দেন মাত্র। এঁদের অধিকাংশ জেগে-জেগে ঘুমোন বলে তাঁদের ঘুম কেউ ভাঙাতে পারে না। যদি কেউ 'বুঝব না' বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে থাকেন, তাঁকে বোঝাবে কে? আসলে এই বোঝা এবং না-বোঝার ব্যাপারটাও পুরোপুরি অভ্যাসের বিষয়। যেভাবে ভাবতে এবং বুঝতে আমরা বহু প্রজন্ম ধরে অভ্যস্ত, তাতে কোনো ছেদ ঘটলে বা ব্যতিক্রম হলে সমস্ত বোধ তোলপাড় করে প্রত্যাখ্যানের জেদ দেখা দেয়। যা কিছু অভ্যাসের বাইরে, তাকেই সন্দেহের চোখে দেখে অধিকাংশ মানুষ। স্বভাবত সাবধানী মন অতি সতর্কতাবশত ভেবে নেয়, নিয়ম মাফিক কিছু না হলেই বিপত্তির আশঙ্কা। এর চেয়ে ভালো স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপদ সরলীকৃত পথে চলা। সময়ের রূপান্তর এহেন চিত্তবৃত্তিতে কথার কথা মাত্র, চোখের সামনে চেনা-জানা জগৎ অপরিচিত হয়ে গেলেও কিছুতেই স্বেচ্ছাবৃত বৃত্তবন্দিত্ব থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে চায় না। একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ছে :

তাতস্য জলোয়ম্ ইতি ব্রুবাণাঃ।
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি ॥

তার মানে, 'এ আমার পিতৃপুরুষের তৈরি কুয়ো, এই বলে দূষিত কুয়োর জল কাপুরুষেরাই খেয়ে নেয়।' বলা বাহুল্য, কাপুরুষ বলতে এখানে গোঁয়ার-গোবিন্দ, মূর্খ অবিবেচকদেরই বোঝানো হচ্ছে।

জীবনের সর্বস্তরে এখন মুহুর্মুহু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মহাকাশ-প্রযুক্তির কল্যাণে একদিকে ইন্টারনেট এবং অন্যদিকে দূরদর্শনের অজস্র চ্যানেলে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য ও বিনোদন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। বিশ্বায়নের নামে নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভোগবাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আমাদের চিন্তাচেতনা আজ দুমড়ে মুচড়ে

অষ্টাবক্র হয়ে যাচ্ছে। সত্য উৎপাদিত হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। কায়া হয়ে যাচ্ছে মায়া আর মায়া হয়ে উঠছে কায়িক অস্তিত্ব। দৈনন্দিন জীবনে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না কোথাও। সব কিছুতে আমরা পরিবর্তন মেনে নিচ্ছি। বস্তুত স্বতশ্চল ভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যাচ্ছে। অথচ সাহিত্যের পাঠ বিশ্লেষণে আমরা অদ্ভুতভাবে রক্ষণশীল। নতুনভাবে পড়তে, ভাবতে ও বিশ্লেষণ করতে আমরা নারাজ। কেউ যদি নতুনভাবে কথা বলতে চায়, নতুন ওই বাচনকে তত্ত্বকথা বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরা ভারি স্বস্তি বোধ করি। 'তাত্ত্বিক' বিশ্লেষণটি হয়ে উঠেছে নিন্দাবাচক। বিচিত্র আত্মবিরোধিতার এই প্রদর্শনী সমানে চলেছে।

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে আরও একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। একদিকে বিশ্বায়নকে মান্যতা দিয়ে আমরা পিটার ইংল্যাণ্ড শার্ট কিম্বা নিউ পোর্ট জিন অথবা রিকার্ডি রামের মতো পানীয়কে আমাদের ঈপ্সিত আধুনিকোত্তর জীবনের চিহ্নায়ক করে নিতে পারি, কিন্তু সাগরপারের কোনো তত্ত্ব-প্রস্থানের ছায়ামাত্র দেখে ব্যাখ্যাতীত শুচিবায়ুর প্রভাবে 'গেল গেল' বলে আর্তনাদ শুরু করে দিই। পদার্থবিদ্যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ কি বিদেশের বস্তু বলে উপেক্ষিত হতে পারে কখনো? হকিং-এর সময় ও কৃষ্ণবিবর বিষয়ক ভাবনা কি ভারতীয় উপমহাদেশের বৈজ্ঞানিকেরা বিদেশি তত্ত্ব বলে উপেক্ষা করতে পারেন? অথবা ভাষা-বিজ্ঞানে কেউ কি আজ সোস্যুর ও চমস্কিকে এড়িয়ে যেতে পারেন? প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অলীক ব্যবধান বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মুছে গেছে। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স যদি বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য বিভাগে অবশ্যপাঠ্য বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে নতুন কালের নতুন দাবি অনুযায়ী ফুকো-দেরিদা-বার্ত-বদ্রিলার-বাখতিন প্রমুখ তাত্ত্বিকদের ভাবনা কেন অনুশীলন করা যাবে না? অ্যারিস্টটল-পরবর্তী পৃথিবী কতবার ওলটপালট হয়ে গেছে ; কিন্তু দেশে দেশে সাহিত্য আলোচনায় তাঁর অমোঘ উপস্থিতি তর্কাতীত। তবু এও সত্য যে সার্বিক বিনির্মাণের এ পর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে সাহিত্যচিন্তা রুদ্ধ থাকতে পারে না। ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির সাহিত্য-চিন্তাও নতুন বিশ্বপরিস্থিতির অভিঘাত অস্বীকার করতে পারে না। অন্ধ হলে কি আর প্রলয় বন্ধ থাকে?

চিন্তাচেতনায় কোনো ভূগোলের সীমারেখা স্বীকৃত নয়। তা যদি হত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রুদ্ধ থাকত তার উৎসভূমিতে। মানুষের পৃথিবীতে যত কিছু নতুন উদ্ভাসন হয়ে চলেছে, তাতে প্রত্যেকের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। যদিও জ্ঞান আর প্রতাপ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত এবং তথ্য-উপনিবেশবাদ অত্যন্ত সক্রিয়—মননবিশ্ব এক ও অবিভাজ্য। সেখানে নতুন ধরনের 'হ্যাভ' আর 'হ্যাভনট'-এর বিভাজন মেনে নেবে না কেউ। যেহেতু তাৎপর্য সর্বদা প্রসঙ্গ-নির্ভর, প্রতিটি গ্রহীতা সমাজ নতুন চিন্তা-চেতনাকে নির্বিচারে একইভাবে প্রয়োগ করবে না। নিজের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী যতখানি নেওয়ার নেবে, বাকিটুকু বর্জন করবে। বস্তুত একই তত্ত্ববীজ ভিন্ন ভিন্ন মননভূমিতে আলাদা-আলাদা ফসল উৎপাদন করতে পারে, করে থাকেও।

তত্ত্ববীজের উপযোগিতা পরখ করতে গিয়ে চিন্তার অভ্যাসে রৈখিকতা ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত তার প্রায়োগিক সম্ভাবনা যতটুকু থাক না কেন, বহুদিনের প্রাতিষ্ঠানিক মনন সম্পর্কে তাতে যে-প্রশ্ন দেখা দেয়—এর গুরুত্ব অনেকখানি। বিশেষত সাহিত্যিক পাঠকৃতির বিশ্লেষণে নিরন্তর বিনির্মাণ সবচেয়ে জরুরি। মননের প্রাতিষ্ঠানিক ধরন প্রশ্নের সম্ভাবনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। তাই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা উসকে দেওয়ার অর্থ যাবতীয় বদ্ধতা-নিষ্ক্রিয়তা-অনীহার জটাজাল থেকে চেতনাগঙ্গার মুক্তি। এই প্রক্রিয়াকে গতিময় করে তোলে নতুন নতুন তত্ত্ববীজের সাহসী ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ষণ। অর্থাৎ চিন্তাবীজের ব্যবহার-উপযোগিতা আর ফসলের জমি তৈরির কাজ একই প্রক্রিয়ার এপিঠ আর ওপিঠ।

৪

বাঙালির চিন্তাবিশ্বে উনিশ শতক যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল, তাতে বহুদিনের রৈখিকতা ও অভ্যাসের গতি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আঠারো শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত সামাজিক ধারাবাহিকতায় বিপুল ছেদ নিয়ে এসেছিল প্রতীচ্যের অজস্র ভাববীজ। সেদিনকার রক্ষণশীল সমাজ যাবতীয় নতুনের বিরুদ্ধে উৎকটভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসের চাকা সব অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেছে। অবশ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লক্ষ করার মতো। নবীন প্রজন্মের যারা নির্বিচারে ও প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতীচ্যের ভাববীজকে মান্যতা দিয়েছিলেন—নিজেদের মুদ্রাদোষে ক্রমে তাঁরা আলাদা, কক্ষচ্যুত ও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন। অন্যদিকে নবাগত তত্ত্ববীজ ও কর্ষণযোগ্য ভূমির দ্বিবাচনিক সম্পর্ক যাঁরা যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে সোনালি ফসল ফলিয়েছেন। গ্রহণ ও বর্জনের এই দ্বিরালাপ আসলে সময়েরই আহ্বান। সময়ের কণ্ঠস্বর যাঁরা শুনেও শোনেননি, তাঁরাই বিশ্লেষণশূন্য নিরক্ত মননের কিংবা মননহীনতার পরিচয় দিয়ে অনিবার্যভাবে সময়-বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। ফলে সময়ের মূল স্রোত তাঁদের নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে নতুন ভগীরথদের শঙ্খনাদ শুনে এগিয়ে গেছে।

বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর উপাসনাকে যতই একমাত্রিক ভাবে শ্লাঘ্য মনে করা হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু খুব বেশি মর্যাদার অধিকারী নন। বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে যতই প্রশংসা করুন না কেন, তিনি নিজে কিন্তু উপন্যাসের মতো সময়-সচেতন ও দ্বিবাচনিক কল্পনায় ঋদ্ধ নতুন প্রকাশ-মাধ্যমটি প্রতীচ্যের ভাবজগৎ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রতীচ্যের তত্ত্ববিশ্ব থেকে আহৃত সাহিত্য-মাধ্যমকে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের জাগরণ-উন্মুখ বাঙালি চেতনার পক্ষে যথাসাধ্য উপযোগী করে তুলেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেমনি মহাকাব্যের ভাববীজ ও প্রকরণ সন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় আধার ও প্রতীচ্যের আধেয়ের মধ্যে অপূর্ব দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা সম্ভব করে তুলেছিলেন। Blank verse কোন জাদুমন্ত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত হল, তা যদি অনুধাবন করি, তাহলে বুঝব, পয়ারের বেড়ি

তাঁর পক্ষে ভেঙে ফেলা সম্ভবই হ'ত না যদি তিনি প্রতীচ্যের চেতনাবিশ্বকে অস্বীকার করতেন। আসলে প্রতিভার অভিজ্ঞানই হল সংশ্লেষণের ক্ষমতা।

গোটা বিশ শতক জুড়ে আমরা বারবার দেখলাম, সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও আঙ্গিক পুরোনো পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরে এগিয়ে যেতে চাইছে। সর্বদা এই উদ্যম যে সফল হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু তবুও অব্যাহত থাকছে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিনির্মাণ। এই অসংখ্যবার বাঁক ফেরার পেছনে কিন্তু রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বপরিসর থেকে অনবরত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আত্তীকরণের প্রবণতা। চিন্তায় যখনই নতুন বিভঙ্গ তৈরি হচ্ছে, সাহিত্যে তার অভিঘাত অনিবার্যভাবে এসে পড়ছে। বাঙালির মনন পর্বে-পর্বান্তরে নতুন নতুন তত্ত্ব-প্রস্থান থেকে আধেয় সংগ্রহ করে গেছে বলেই স্রোত সরে গিয়ে চরভূমি বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। কোনো সন্দেহ নেই যে চিন্তা-প্রবাহকে সঞ্জীবিত করার জন্যে বহির্জগৎ থেকে নিয়মিত নতুন নতুন উপকরণের যোগান চাই। অন্তত বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ-অভিজ্ঞতা এই সিদ্ধান্তকে অনিবার্য করে তোলে। বিশ শতকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক প্রেরণাকে নানা মাত্রায় শুষে নিয়ে বাঙালির সৃষ্টিশীলতা এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে পরিক্রমা করেছে। মার্ক্সবাদ-অস্তিত্ববাদ-পরাবাস্তববাদ থেকে শুরু করে হাল আমলের আকরণবাদ-আকরণোত্তরবাদ-নারীচেতনাবাদ-উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ ওই পরিক্রমায় কত বিচিত্র ধূপছায়া ও উচ্চাবচতা এনে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণ ছাড়া এত অজস্র তত্ত্ববীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও পুষ্পায়ন সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করা অসম্ভব।

সাহিত্যতত্ত্ব জীবনের বাইরে যেতে পারে না কখনো। জীবনতত্ত্ব আর সাহিত্যতত্ত্ব একই সত্যের দু-রকম উপলব্ধি মাত্র ; জীবনে যা কিছু ঘটে এবং সাহিত্যিক প্রতিবেদনে যা কিছু প্রকাশিত হয়, সমস্তই কোনো-না-কোনো তত্ত্বের পুষ্টিদান করে। জীবনে তত্ত্ব মিশে থাকে জলে মাছের মতো। তেমনি সাহিত্যে তত্ত্ব থাকে ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের মতো কিম্বা জৈব অস্তিত্বে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। অর্থাৎ তত্ত্বের অন্তর্বৃত অস্তিত্ব বুঝে নিতে হয় স্বভাবের পথে। তাই কোথাও যদি সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় বা আতিশয্য প্রকট হয়ে পড়ে, তাতে তাত্ত্বিক বিন্যাসের সৌন্দর্য ও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং সাহিত্যতত্ত্বের সার্থক অভিব্যক্তি বা অনুশীলন কখনো সামঞ্জস্যবোধকে পীড়িত করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা এই বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে চান, তাঁদের জন্যে রয়েছে আবশ্যিক কিছু প্রাক্‌শর্ত! প্রণালীবদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ছাড়া জীবন থেকে উৎসারিত সাহিত্যতত্ত্বের গভীরে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। এই উপলব্ধি অর্জনের জন্যে কোনো সরলীকৃত সহজিয়া মার্গ নেই।

আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তত্ত্বের অনুধাবন মানে জীবনের অনুধাবন আর জীবনের অনুধাবন মানে সময়-চিহ্নিত পরিসরের অনুধাবন। এইজন্যে কোনো সাহিত্যতত্ত্বই সময় ও পরিসর নিরপেক্ষ নয়। ফলে বিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যতত্ত্বের উদয়, বিকাশ ও অস্তকে বুঝে নিতে

হয়। বিশ শতকের গোড়ায় যে সাহিত্যতত্ত্ব প্রাসঙ্গিক ছিল, একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নতুন সময় নিয়ে এসেছে নতুন প্রয়োজন, নতুন বিনির্মাণ, তত্ত্ব ও প্রয়োগের নতুন বিন্যাস। অবশ্য এইসঙ্গে এও মনে রাখতে হয় যে গ্রহীতার দেশকালজাত যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় কোন তত্ত্ব কতটা স্বীকৃত, বর্জিত, পরিমার্জিত, পুনর্বিন্যস্ত হবে।

যেমন ধরা যাক প্রতীচ্যের আধুনিকতা বিষয়ক আকল্প ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বাঙালির ভাববিশ্বে, অনেকখানি পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল। বিলম্বিত পুঁজিবাদের পর্যায়ে আধুনিকোত্তরবাদের সূচনা হল যখন, বাঙালির চেতনায় তার অভিঘাত বহুধা বিচ্ছুরিত হল। নয়া ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্যেও এত দ্রুত পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে যে গত তিন দশকে উত্তরআধুনিকতা ও আধুনিকোত্তরবাদী চিন্তার সহাবস্থান আমরা লক্ষ করছি। এই বিতর্ক এখনও অমীমাংসিত। প্রবল অনিশ্চয়তা ও কেন্দ্র-বিচ্যুতির আবহে এমন ধরনের আশ্চর্য নতুন সাহিত্যিক পাঠকৃতি রচিত হয়ে চলেছে যে এদের বিশ্লেষণ করতে গেলে পুরোনো পাঠাভ্যাস সংহিতায় আর কুলোচ্ছে না। প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের উপযুক্ত সমর্থন ছাড়া এখন কোনো ধরনের প্রতীতি অসম্ভব।

৫

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ঠিক কী কী কারণে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক উপন্যাসকল্প রচনার ভিড় থেকে আলাদা—প্রথাসিদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়ে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। তেমনি ভোগবাদ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাঁর অধিগত, কেবলমাত্র তেমন সমালোচকই গত চার দশকের সাহিত্যিক পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ও অনান্দনিক চরিত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন। আমাদের আধুনিকতার ঔপনিবেশিক চরিত্র যাঁর কাছে স্পষ্ট, তিনিই কেবল বাংলা কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটকে অভিব্যক্ত ব্যাধির সংক্রমণ শনাক্ত করতে পারেন। কাকে বলে চিহ্নায়ন প্রকরণ, এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই যাঁর নেই, তিনি কীভাবে কবিতার ভাষায় শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের যুগলবন্দির তাৎপর্য বুঝবেন! জীবনানন্দ-শঙ্খ ঘোষ-শক্তি চট্টোপাধ্যায়-জয় গোস্বামী-রাহুল পুরকায়স্থ-মন্দাক্রান্তা সেনদের চেতনাবিশ্ব কেন পরস্পরভিন্ন, চিহ্নবিজ্ঞানের উদ্ভাসন ছাড়া সম্পূর্ণ অধিগত হওয়া অসম্ভব। আখ্যানের সময় ও পরিসরের দ্বিরালাপ যদি না বুঝি কিংবা ঔপনিবেশিক কাহিনি বয়নের ধরনকে প্রত্যাখ্যান করার তাগিদকে যদি তত্ত্বগত ভাবে বুঝে না নিই, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, দেবেশ রায়, কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্যদের কথনবিশ্বের স্বাতন্ত্র্য কখনো উপলব্ধি করব কি? পাঠকৃতির আকরণোত্তর বিন্যাস ও বিনির্মাণের বহুস্বরিক দ্যোতনা সম্পর্কে যিনি উদাসীন কিম্বা পাঠকের সার্বভৌম পরিসর বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তাধারা থেকে যিনি লক্ষ যোজন দূরে—হাসান আজিজুল হক, রমানাথ রায়, সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, কমল চক্রবর্তীদের লেখা পড়া বা না পড়া তাঁর পক্ষে সমান।

তেমনি নারীচেতনাবাদী দর্শন ও নন্দন সম্পর্কে যিনি জিজ্ঞাসু নন, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের সমস্ত প্রধান স্থাপত্যের গভীরে বিরাজমান ঋদ্ধ অন্তঃস্বরগুলি অস্তিত্বশূন্য হয়েই থাকবে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবাদ-প্রতিম নাট্যসংলাপের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি! কিংবা পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস ও সংস্কারে যেসব লেখিকা আনখশির প্রোথিত, তাঁদের রচনা কেন তাৎপর্যহীন, এর উত্তর পাওয়া সম্ভব শুধু নারীচেতনাবাদের দর্পণে। নারীর আত্মকথামূলক রচনার সাম্প্রতিক আলোচনাগুলি থেকে বুঝতে পারি, প্রাসঙ্গিক তত্ত্বভাবনায় নিষ্ণাত হওয়ার ফলেই এতদিনকার অন্ধকার পরিসর ক্রমাগত আলোকিত হয়ে উঠছে। আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবীদের রচনা নবার্জিত শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু হয়েছ। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সেলিনা হোসেন, সুচিত্রা ভটাচার্যদের চেতনাবিশ্ব কি যথার্থ তত্ত্বভাবনা ছাড়া বিশ্লেষণ করা আদৌ সম্ভব?

আখ্যানতত্ত্ব ও প্রতিবেদনতত্ত্ব কীভাবে সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বের পুরোধা চিন্তাবিদদের অবদানে অভাবনীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, সে-সম্পর্কে উদাসীন থাকার অর্থ নিজেদের মনন-জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু করে দেওয়া। বিশ্বায়ন কি কেবল দুনিয়াজোড়া বাজারের হট্টমেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্যে? রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'যত্র বিশ্ব ভবতি একনীড়ম্'-এর ভাবকল্প দিয়েছিলেন আমাদের, সেদিনই তো সমস্ত নঞর্থক প্রবণতা মুছে দিয়ে সদর্থক বিশ্বায়নের বার্তা প্রচারিত হয়েছিল। মানববিশ্বে যা কিছু জ্ঞেয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক, তাতে যে-কোনো মানুষের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আখ্যান আর কাহিনি মনোলোভা মায়ামৃগ মাত্র নয় কিংবা প্রতিবেদনও নয় যে-কোনো সন্দর্ভ। মানুষের চিন্তাবিশ্ব থেকে উৎসারিত অজস্র বিচ্ছুরণে আখ্যান ও প্রতিবেদন আজ অনেকান্তিক ও অনেকার্থদ্যোতক। তত্ত্ব-নিরপেক্ষতা আসলে অসাড় চিত্তবৃত্তির লক্ষণ। আজ সর্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক অর্থনীতির পেষণে কীভাবে অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে পুরনো চিহ্নায়ক মুছে গিয়ে চিহ্নায়নের নতুন প্রকরণ জেগে উঠছে—এ বিষয়ে যিনি অবহিত নন, তাঁর পক্ষে আজকের আখ্যান ও প্রতিবেদনের অভিনবত্ব উপলব্ধি অসম্ভব।

দেবেশ রায়ের 'একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন', নবারুণ ভট্টাচার্যের 'যুদ্ধ পরিস্থিতি', স্বপন সেনের 'মুখোশযোদ্ধা', রবিশঙ্কর বলের 'পোখরান ৯৮' ইত্যাদি কেন ঔপন্যাসিকতার নব্য গ্রন্থনার নিদর্শন, তা শুধুমাত্র বিবর্তনশীল আখ্যানতত্ত্বের নিরিখে বুঝে নেওয়া সম্ভব। সত্তর পরবর্তী ভারতবর্ষের দ্রুত বিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবচেতনা, বহুরৈখিক বাস্তবতা, চেতনার অনেকান্তিকতা কীভাবে লেখক-কথক স্বরের নতুন অন্তর্বয়ন এবং মুক্ত পাঠকৃতির বিশ্বাসে প্রতিফলিত হচ্ছে—তা যখন বুঝে নিই, অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়' ও 'দেবাংশী', ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' ও 'মৃগয়া', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পক্ষবিপক্ষ' ও 'জলতিমির', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' ও 'চরপূর্ণিমা', আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' ও 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং

চল্লিশজন লোক' ইত্যাদি উপন্যাসের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারি। একইভাবে কবিতা ও ছোটগল্প থেকে আমরা নতুন ধরনের নির্যাস পেয়ে যাই। আরও একটি কথা এখানে বলতে চাই। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, সুবিমল মিশ্র, কমল চক্রবর্তী, অজিত রায়, বারীন ঘোষাল, মলয় রায়চৌধুরীর মতো লিখিয়েরা কেন একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে উদ্ভুত হয়েও সমান্তরাল সৃজনশীল পরিসরের সূত্রধার এবং কেনই বা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা-বিশ্বের পক্ষেও তাঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব অপরতার সন্ধানী—এই মীমাংসা উপযুক্ত তত্ত্বের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।

বস্তুত শুধুমাত্র বাংলা কথা-সাহিত্যেই নয়, গত তিন দশকে প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে রচিত ও তথাকথিত সৃষ্টিশীল প্রেরণায় রচিত প্রবন্ধের জলবিভাজন রেখা তৈরি করে অকারণ কটু বিতর্ক চলত। কিন্তু রোলাঁ বার্ত, জাক দেরিদা ও জাঁ বদ্রিলারের কল্যাণে সৃষ্টিশীলতার সংজ্ঞা আমূল বদলে গেছে। প্রাগুক্ত জলবিভাজন রেখা এখন পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। কেন এই মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে, এর উত্তর রয়েছে সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসর যখন যন্ত্র-প্রযুক্তির দৌলতে খোলনলচে পাল্টে ফেলেছে এবং নতুন নতুন চিহ্নায়ন প্রকরণ তৈরি হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি চিন্তা-প্রস্থানে, সে-সময় প্রবন্ধের প্রতিবেদনও বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্তজনেরা অজস্র কুম্ভের ভূমিকা নিয়ে নকল বুঁদির গড় রক্ষায় ব্যস্ত। তফাত অবশ্য একটু আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কুম্ভ কাউকে কটু মন্তব্য করেনি, অকারণ হিংস্রতায় কিংবা অসূয়ায় কাউকে আঘাত করা দূরে থাক, দাঁত খিঁচানোর কথাও ভাবেনি। কিন্তু যারা প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা বিদ্যাচর্চার দ্বারপাল, সময়ের দাবি অবচেতনে বুঝতে পেরে কিন্তু সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। পায়ের নিচে জমি দ্রুত সরে যাচ্ছে, তা অনুমান করেও দুর্মর অভ্যাসের শেকল ভেঙে তত্ত্ববিশ্বের নতুন সত্যকে স্বীকার করতে পারছে না। তাদের তত্ত্বশূন্য রচনা পুঞ্জপুঞ্জ কথার ফানুস বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ভেবে এরা সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব ধরনের তাত্ত্বিক রচনার উপর।

সময়ের পাঠ গ্রহণে অনিচ্ছুক ওইসব ছদ্মপড়ুয়াদের সংঘ-রচনার জন্যে সাহিত্য থেকে আজ জীবন নির্বাসিত। সাহিত্যের বিশ্লেষণে সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির গুরুত্ব এইসব রক্ষণশীল জনেরা মৌখিকভাবে স্বীকার করেন হয়তো, কার্যত কিন্তু বহু প্রজন্ম লালিত চিন্তার অচলায়তন থেকে এঁরা একচুলও সরে আসেন না। রবীন্দ্রনাথের গোরা, রক্তকরবী, কালান্তর এবং এরকম অন্যান্য বই তাঁদের জন্যে কখনো অনেকার্থদ্যোতক পাঠকৃতি হয়ে ওঠে না। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে প্রতি মুহূর্তে বাংলা বিদ্যাচর্চা নিহত হচ্ছে তাই। আমাদের যে-কোনো সহজিয়া পাঠ তাই ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে নিরালম্ব বায়ুভুক ফানুসের মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্বতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিয়ে যেসব তত্ত্বভাবনা

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার মতো অভ্যাসের জাড্য ও অন্ধকার দূর করে দেয়, তাতে আমাদের বড়ো ভয়। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিপুল দৈন্যের মধ্যেও এমন কয়েকজন চিন্তাবিদকে পাওয়া গেছে, যাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রবন্ধ কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ের গণ্ডিতে রুদ্ধ রচনা মাত্র নয়। তাঁদের বয়ানে মিশে থাকে দার্শনিক চিন্তার দ্যুতি, সমাজতত্ত্বের নির্যাস, ইতিহাসের চলিষ্ণুতা।

৪

শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধে আমরা যে-ধরনের পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, তা কি কেবল বিষয়-গৌরবে আমাদের আকৃষ্ট করে? নাকি তার প্রতিটি বাক্যে গভীর দার্শনিক বাচনের দ্যুতি বিকীর্ণ হয়? অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধে বিপুল মানব-বিশ্বের অনেকান্তিক অভিজ্ঞতা কি একনীড় হয়ে ওঠে না? প্রবন্ধ মানে জিজ্ঞাসার বয়ন ; মীমাংসার ছলে আরও জিজ্ঞাসা উসকে দেওয়া। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন প্রাঙ্গন থেকে কুসুম চয়ন করে একটি মালা গেঁথে নেওয়াই প্রাবন্ধিকের অন্বিষ্ট। বিষয় সাহিত্য হোক বা না হোক, প্রবন্ধকে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন অর্থাৎ নান্দনিকবোধে ঋদ্ধ হতেই হবে। আর, দার্শনিক উপলব্ধির সূত্রায়িত বিন্যাস ঘটবে তাতে। আমরা যখন প্রবন্ধ পড়ব, চেনা জগতের অচেনা আদল খুঁজে নিতে চাইব। অতি পরিচিত জগৎ ও জীবনের অভ্যস্ত ব্যাখ্যা পেয়ে যারা সন্তুষ্ট, প্রবন্ধ তাদের জন্যে নয়। প্রবন্ধ পড়ে প্রাবন্ধিকের সঙ্গে একমত হতে হবে, তা কিন্তু নয়। তিনি সাহিত্য ও সমাজ কিংবা সাহিত্য ও দর্শন কিংবা সাহিত্য ও ইতিহাসের বহুমাত্রিক যুগলবন্দি উপলব্ধি করবেন : এইটুকুই শুধু প্রত্যাশিত। তার মানে, কোনো প্রবন্ধে যদি কোথাও কোনো তত্ত্ববীজ বয়ানের মধ্যে বিকশিত না হয়, তাহলে তা 'প্রবন্ধ' অভিধার যোগ্যই নয়।

কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিকেরা যখন নিজেদের সৃজনী অভিজ্ঞতার নিরিখে সাহিত্যের হওয়া ও হয়ে ওঠা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের রচনায় ভিন্ন মাত্রা নিশ্চয় প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁদের কাছেও আমরা চাইব দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা। সব সময় আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়, একথা অবশ্য বলা যায় না। জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে উত্তম প্রাবন্ধিক ছিলেন। তাঁদের বয়ানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিক ভাবাদর্শ ও সময়-চেতনার অভিব্যক্তি দেখেছি। নিবিড় পুনঃপাঠে তাঁদের প্রবন্ধ থেকে নানা ধরনের তত্ত্ববীজ আবিষ্কার করা সম্ভব। শঙ্খ-অলোকরঞ্জনের কথা আগেই লিখেছি। এছাড়া দেবেশ রায়, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধেও সমান সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই তালিকা দীর্ঘ নয়। 'কবিতার কথা', 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' দার্শনিক মননে ঋদ্ধ, তা আজও আমরা ভালোভাবে লক্ষ করিনি। আসলে আমাদের সাহিত্যিক পাঠকৃতির ঐতিহ্যে 'কবি ক্রান্তদর্শী' কিংবা 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' ইত্যাদি নিছক প্রাজ্ঞোক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বলা ভালো, কথার কথা মাত্র হয়ে থেকেছে। এইসব উচ্চারণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়তো করেছি, কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত

গভীর তাৎপর্য কতটা সুদূর-প্রসারী, তা তলিয়ে ভাবিনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি নিবিড় তাত্ত্বিকতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও জীবনজিজ্ঞাসা কীভাবে সমার্থক হয়ে ওঠে, তা যদি ভালোভাবে লক্ষ করতাম, তাহলে আমাদের রবীন্দ্র-পাঠ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার চক্রব্যূহে রুদ্ধ হয়ে যেত না। সব জিনিসকে টুকরো করে আনা আমাদের পদ্ধতি বলে রবীন্দ্রচর্চা আজও অসম্পূর্ণ। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে বলে শতবর্ষের ঢাকঢোল সত্ত্বেও জীবনানন্দচর্চাও অসম্পূর্ণ। তেমনি অন্য সব লিখিয়েদের রচনা-পাঠও ছজন অন্ধের হাতি দেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। তত্ত্ব-চেতনাকে আমরা কখনো যথাযথ গুরুত্ব দিতে শিখিনি বলে আমাদের যাবতীয় সাহিত্য-পাঠ হয়ে রইল অর্ধমনস্ক, লক্ষ্যশূন্য ও অগভীরতায় আক্রান্ত। তাসের দেশের সেনাদের মতো নিয়ম-মাফিক পা তুলে পা ফেলে খড়ির গণ্ডির মধ্যে আমরা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে তৃপ্ত থাকতে চাই। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত তর্জনি উদ্যত হয়ে ওঠে। কোথাও বা বিহ্বল কণ্ঠ অভিযোগ করে : 'আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে!'

আসলে ভাষা সংযোগ সাধনের মাধ্যম হলেও তাতে যে অধিকারী অনধিকারী ভেদ অবশ্যস্বীকার্য, একথা প্রায়ই ভুলে যাই। সংযোগ হতে পারে শুধু দক্ষ দাতা ও প্রস্তুত বা উপযুক্ত গ্রহীতার মধ্যে। মনে পড়ে 'বিসর্জন' নাটকের একটি বিখ্যাত সংলাপ :

'জয়সিংহ : জানো কি একেলা করে বলে?
অপর্ণা : জানি, যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!'

যিনি নেবেন, তাঁকে তো নেওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। মা-ঠাকুমার কোলে শুয়ে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শোনা যেতে পারে ; কিন্তু বয়স্ক কালের কথাতেও কি একই ধরন সম্ভব? পরিণত বয়ানের জন্যে আবশ্যিক পরিণত মন। মুশকিল এই, অনেক পরিণত শরীরে অপরিণত মন লুকিয়ে থাকে। কারো কারো শৈশব, কৈশোর কিছুতেই কাটতে চায় না। কেউ কেউ আবার জেগে জেগে ঘুমোতে অভ্যস্ত ; কোনোভাবেই এদের ঘুম ভাঙে না। চারদিকে ঘটনার ঘনঘটা যত আবর্তন তৈরি করুক, দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি চোখের সামনে যত ওলট পালট হয়ে যাক, ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানে যত জটিলতাই দেখা দিক—চোখের ঠুলি অনড় হয়ে এঁটে থাকে। চোখ খুলে দেখাতে চাইলেও এরা দেখতে নারাজ। মান্ধাতার আমলে যেভাবে পড়া, জানা, বোঝা চলত, তেমনি চললেই ভালো, এই হল এদের অভিপ্রায়। যে-ভাষা খবরের কাগজে নিত্যদিন ব্যবহৃত হয়, সাহিত্য বিশ্লেষণেও এঁরা সেই একই ভাষা প্রত্যাশা করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদিও মোক্ষম কথা লিখে গেছেন—'যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্যে কবিকে দোষারোপ করা অন্যায়'—তবু কোনো ইতর-বিশেষ হয়নি। বিনা আয়াসে সব বুঝে নেব, সমস্তই হবে জমা-খরচের হিসেবের মতো প্রাঞ্জল—এই মনোভঙ্গির কোনো বদল নেই। ব্যতিক্রম মাত্রেই উৎপাত হিসেবে নিন্দনীয়।

সমস্যার মূল কারণ, নতুন কিছু পড়তে অনীহা আর নতুনভাবে চিন্তা করতে আপত্তি। যখন প্রচলিত বিদ্যাচর্চা ও চিন্তাপ্রস্থানের সীমানা মুছে যাচ্ছে, সাহিত্যিক প্রতিবেদন কি নতুন কালের বার্তাকে 'ওকে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছিঃ ও যে চণ্ডালিনীর ঝি, নষ্ট হবে যে দই সেকথা জানো না কি' বলে ছোঁয়া-বাঁচানো দূরত্বে চলে যেতে পারবে? দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সংশ্লেষণে যে অনেকান্তিক সন্দর্ভ তৈরি হয়ে চলেছে, তার বহুস্বরিক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে সাহিত্যকেও নানা ধরনের তাত্ত্বিক আয়ুধে সজ্জিত হতে হচ্ছে। যে এই অনিবার্য সত্যকে অস্বীকার করছে, সে আত্মঘাতী হচ্ছে মাত্র। ভাষা দুরূহ নয়, দুরূহ হচ্ছে এই সময় ; দুরূহ নয়, দুর্বোধ্য। কিন্তু মানুষ তো অপরাজেয় সৈনিক ; সে এই দুর্বোধ্যতায় ত্রস্ত হবে কেন? বরং গোলকধাঁধায় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্যে নতুন নতুন দিশা খুঁজে নেবে। এই দিশা খোঁজার অভিব্যক্তি হল তত্ত্ব। সাহিত্য যেহেতু স্বভাবত জীবন-ঘনিষ্ঠ, তার প্রতিটি বয়ানে থাকবে তাত্ত্বিকতার মোহর। কখনো তা স্পষ্ট আর কখনো আভাসিত, এই মাত্র তফাত। যাকে সাহিত্য বলছি তা আসলে দর্শন। এই দর্শনে ব্যক্তি উপলক্ষ মাত্র, সমাজই প্রকৃত অন্বিষ্ট। অতএব এমন বাচন ব্যবহৃত হবে সাহিত্যে যা শুধু বর্ণনা দিয়ে ফুরিয়ে যাবে না, ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলবে পরাবাচনের আভা। একক বাচনের সঙ্গে সামূহিক বাচনের দ্বিরালাপ হবে ওই বয়ানের প্রধান আধেয়। এ কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ হল চলমান জীবন থেকে পাওয়া অনুভূতির নির্যাস।

এইজন্যে সাহিত্যিক প্রতিবেদনে অভিব্যক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসায় পরিভাষার গ্রন্থনা অনিবার্য। পরিভাষা মানে তো কঠিন করে বলা কথা নয় ; চিন্তার যে-বীজতলিকে অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, পরিভাষা হল তার একমাত্র আশ্রয়। পরিভাষা থেকে অর্থের বহুধা বিচ্ছুরণ লক্ষ করে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই ; একে বরং তার ঐশ্বর্যের দ্যুতি হিসেবে বন্দনা করাই কাম্য। পরিভাষার গ্রন্থনা যাঁদের কাছে দুরূহ, তাঁরা অনুগ্রহ করে অধ্যবসায়ী হোন। বাংলা ভাষার একটু দূরবর্তী উৎসধারায় তাঁরা অবগাহন করুন। প্রাথমিক দ্বিধা কেটে গেলেই বুঝবেন, কী অসামান্য সম্ভাবনার বীজতলি তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে অন্য একটি প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম একটি প্রত্যয়ের ঘোষণা হিসেবে, আরো একবার তা ফিরিয়ে আনছি : কোনো সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব-বিচ্ছুরণ প্রচলিত ভাষায় কুলোয় না। তাই ভাষার ভিত্তি খুঁড়তে হয়। প্রসারিত করতে হয় অন্তর্বৃত ক্রিয়াপদের সম্ভাবনা। এমন কি উপসর্গের বা প্রত্যয়ের একক ও যুক্ত তাৎপর্য পুনর্নির্মাণ করতে হয়। কখনো কখনো ফিরে যেতে হয় প্রাতিপাদিকের আদি পরিসরে। সব কিছুই আছে ভাষার গভীরে ; তাকে কেবল পুনর্গঠন ও পুনরাবিষ্কার করে নেন পরিভাষা-ভাবুকেরা। পৃথিবীতে দ্রুত তত্ত্বচিন্তার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। খুলে যাচ্ছে শাখাপথের দিগন্ত। শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্ব আর সাহিত্যতত্ত্বে দেখতে পাচ্ছি কত বিচিত্র আয়তন। ইউরোপীয় ভাষাবিশ্ব আজ বাঙালির নিজস্ব ভুবনেও নতুন নতুন প্রবণতার বীজাধান করছে। চিন্তার বিশ্বায়নের যুগে পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক সীমান্তের ধারণাও। অপরিচিত ভাববীজ

ভাষার পুরোনো আকরণে গৃহীত হতে পারে না। তার জন্যে চাই পুরোপুরি নতুন উদ্যম, নতুন সংহিতা, নতুন কৃৎকৌশল। পরিভাষা এইজন্যে আবশ্যিক এখন। অপরিচয়ের দূরত্ব প্রথম পাঠে কিছুটা বাধা তৈরি করবেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি বিরোধিতা পর্যন্ত গড়াবে। ভাবের দুরূহতাকে ভাষার দুরূহতা বলে মনে করেন কেউ কেউ। বারবার পড়া ছাড়া এই ভ্রম কাটিয়ে ওঠার অন্য পথ নেই কোনো। পরিভাষা যখন সার্থক তাতে লক্ষ করি বহুস্বরিকতা। একে যদি বুঝে নিই সতর্কভাবে, দুরূহতা সংক্রান্ত আপত্তি খুব বেশি দিন টিকবে না। গত কয়েক বছরে বাঙালি তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট থেকে নিবিষ্টতর হচ্ছে। এসময় তাই ভাষাচেতনার নয় শুধু, পরিভাষাচেতনারও।

এরপর সম্ভবত খুব বেশি কথা বাকি থাকে না। এইটুকু শুধু বলা যে, পরিভাষা কোনো সত্যিকারের অধ্যবসায়ী পড়ুয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অভ্যাসের অবিরল প্রবাহে তা ছেদ তৈরি করে বলে যাঁরা হোঁচট খাচ্ছেন, তাঁদের শুধু সময়ের অভিজ্ঞান ও দাবি বুঝে নিতে হবে। জীবনযাপনে সব কিছু যখন বদলে যাচ্ছে, সাহিত্য-পাঠ আর বিশ্লেষণ-পদ্ধতিও বদলাতে বাধ্য। তত্ত্ব তো ওই রূপান্তরকে চেনার জন্যে, প্রবহমানতা ও পরিবর্তনের দ্বিরালাপকে বোঝার জন্যে। তত্ত্বকে যষ্ঠির মতো নয়, প্রদীপের মতো ব্যবহার করাই বিধি। সেই প্রয়োগ করাও হচ্ছে। প্রদীপে যষ্ঠিভ্রম তো রজ্জুতে সর্পভ্রমের চেয়েও মারাত্মক। তত্ত্ব সূর্যের মতো নিরপেক্ষ, পর্বতে ও সমভূমিতে তার আলো ও উত্তাপ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে কুয়াশা ও অন্ধকার, সেখানে তত্ত্ব আলো দেয় দৃষ্টিকে লক্ষ্যাভিমুখী করার জন্যে। আর, যেখানে আলোর আভাস থাকলেও তা অপরিস্ফুট, সেখানে তত্ত্বের কাজ উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে দেওয়া। অন্ধকার ঘরেও একটি কোনে প্রদীপ জ্বালালে তা যেমন পুরো ঘরকে আলোকিত করে, তেমনি সাহিত্যতত্ত্বও সম্পূর্ণ প্রতিবেদন বা পাঠকৃতিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। অনেক প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য তখন দৃষ্টিগোচর হয়, সামান্যের অন্তরালে আবিষ্কৃত হয় বিশেষের অস্তিত্ব।

নিজেদের বিশ্বাসে, অভিজ্ঞতায়, অনুভূতিতে তত্ত্বের উপস্থিতি যখন হৃৎস্পন্দনের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়—তখন সাহিত্যপাঠ কেবল শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিষয় থাকে না। তা হয়ে ওঠে কুঁড়ি থেকে ফুলের জেগে ওঠা দেখার মতো আনন্দদায়ী প্রকরণ। আরো নিবিড় ভাবে চিনি নিজেকে, জগৎকে, সম্পর্কের রুদ্ধ ও মুক্ত বিন্যাসকে ; সাহিত্য-পাঠ ও জীবন-পাঠের যুগলবন্দিকে তখন আর কষ্ট করে বুঝতে হয় না। সাহিত্যতত্ত্বের তত্ত্ব অর্থাৎ পরাতত্ত্ব নিয়ে কোনো বাক্‌বিস্তার না করেও বলা যায়, প্রকৃত জীবন আর কল্পিত জীবনের মধ্যে প্রলম্বিত সব অদৃশ্য পর্দা সরিয়ে দেওয়া সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকৃত জীবন যতক্ষণ স্পষ্ট না হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ বিশ্লেষণী সমালোচনা পথ ও পাথেয় খুঁজে পাবে না।

সমালোচক তত্ত্বের দর্পণে নিজেকে দেখেন আবার সমান্তরাল ভাবে সাহিত্যকেও দেখেন। তত্ত্ব ও জীবনের মধ্যে দ্বিমেরুবিষমতা ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুত সামাজিক জীবনই তো কোনো-না-কোনো ভাবে তাত্ত্বিকতার আধার। তেমনি তত্ত্বও বাস্তব সামাজিক

প্রক্রিয়া। আমরাই তাকে অকারণে বিমূর্তায়িত করে তুলি। সাহিত্যতত্ত্ব পৃথিবীকে তাৎপর্য-বিশ্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সারাজীবন ধরে জেনে বা না-জেনে আমরা কেবল চিহ্নায়ক তৈরি করি। আমাদের এই স্বাভাবিক মানবিক প্রক্রিয়াকে সাহিত্যতত্ত্ব প্রণালীবদ্ধ ভাবে তুলে ধরে এবং প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিকতায় যাবতীয় তাৎপর্যকে পরীক্ষা করে।

মানব-বিশ্বে তত্ত্ব দৃষ্টিশক্তির মতোই অপরিহার্য। অনবরত মুছে-যাওয়া আর নতুনভাবে তৈরি-হওয়া চিহ্নায়ন প্রকরণকে সংহত, সুস্থির ও দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্যেই সাহিত্যতত্ত্ব। এমন নয় যে কোনো তত্ত্ব বৈপ্লবিক আর কোনো তত্ত্ব রক্ষণশীল। ব্যবহার-উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে, জীবন-ব্যাপ্ত সন্ধানে কোন তত্ত্ব অন্বিষ্টের দিকে আমাদের কতটা এগিয়ে দেবে! কোটি টাকার প্রশ্ন হল, আমরা কি মীমাংসার অভ্যাস চাই, নাকি এক জিজ্ঞাসা থেকে অন্য জিজ্ঞাসায় বয়ে যেতে চাই?

ইলিয়াসের 'যুগলবন্দি'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুটি কালজয়ী উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' নিয়ে আলোচকদের যতখানি আগ্রহ, প্রায় ততটাই অনাগ্রহ তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে। অথচ এই প্রবলভাবে বিবর্তনশীল সাহিত্য-মাধ্যমেও তিনি অনন্য সৃষ্টিপ্রতিভার স্থায়ী শিলমোহর খোদাই করে দিয়েছেন। 'অন্য ঘর অন্য স্বর' (১৯৭৬), 'খোঁয়ারি' (১৯৮২), 'দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৫), 'দোজখের ওম' (১৯৮৯), 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) নামে পাঁচটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ইলিয়াসের বেশ কিছু ছোটগল্প আমাদের ভিৎ-সুদ্ধ নাড়িয়ে দেয়। এই নিবন্ধের জন্যে 'দোজখের ওম' থেকে 'যুগলবন্দি' গল্পটি নিয়েছি।

সরাসরি ছোটগল্পের বয়নবিশ্বে প্রবেশ করার আগে প্রাক্‌কথন হিসেবে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি লেখকের অনুজ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র (১ম খণ্ড) এর ভূমিকায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ-ঋদ্ধ মন্তব্য করেছেন। প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করছি। ভূমিকাকার লিখেছেন, 'পরিচিত অভিজ্ঞতার প্রায় সর্বস্তরে জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে একেবারে এর গভীরতম শাঁস পর্যন্ত অশেষ কৌতূহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে শিল্পকর্মে তা বেপুরোয়া ভাবে প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা দেখতে পাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায়। প্রকৃতি তাঁকে এই বিশ্ব পর্যবেক্ষণের ও উপলব্ধির সময় বেশিদিন দেয়নি। হয়তো সেজন্যই এই নাজুক ও স্বল্পায়ু সময়ে তিনি মর্মভেদী দৃষ্টিকে শানিত করে দেখেছেন তাঁর ইন্দ্রিয় ও বোধির চেনা বিশ্বকে। এই দেখা একাধারে নির্মম এবং কৌতুকবহ। নির্মম, কেননা সত্যনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ সব সময়ই নির্মম এবং কৌতুকপ্রদ কেননা মানুষের অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্ত কি ভঙ্গি কি বেফাঁস বাক্য বা কাজকে তিনি যেমন অবলীলায় প্রকাশ করেন তাতে পাঠক একই সঙ্গে অস্বস্তি, বিব্রত এবং কৌতুক বোধ না করে পারে না। আর এই দুই অনুভূতি উসকে দেওয়ার শক্তি বড় মাপের লেখকেরই বৈশিষ্ট্য। যে বাস্তবতার আলোয় তিনি জীবন দর্শন করেন তা কখনোই একেবারে চাঁচাছোলা যান্ত্রিক বাস্তবতা নয়। খড়খড়ে শুষ্ক চোখে ইলিয়াস বিশ্ব দেখেননি। চোখে কেবলি খরা নিয়ে সম্ভবত খুব বেশি দূর এগোনো কি খুব বড় মাপের শিল্প রচনা করা যায় না। চোখ তাঁর সিক্তই, কিন্তু সেই সজল চোখ বহির্বিশ্ব এবং অন্তর্বিশ্বকে ঝাপসা না করে বরং আলোর দ্যুতিতে উজ্জ্বলতর করেছে এবং তার উজ্জ্বল, স্বচ্ছ দৃষ্টিপথে যাই পড়েছে তা জীবন্ত এবং সরস হয়ে উঠেছে!' এই বক্তব্য থেকে গল্পকারের জীবনবীক্ষা সম্পর্কে বেশ কিছু সূত্র পেয়ে যাচ্ছি। একই সঙ্গে যাঁর দেখার ধরন নির্মম ও কৌতুকবহ—তিনি নিঃসন্দেহে যুগপৎ নিরাসক্ত ও সংলগ্ন।

আলোচ্য 'যুগলবন্দি' গল্পটিও এর প্রমাণ দিচ্ছে। বুরোক্র্যাট সরোয়ার কবিরের কৃপাভিক্ষু আসগর হোসেন এবং কবিরের অ্যালসেশিয়ান আরগসের নামে যে ইচ্ছাকৃত ধ্বনিসাম্য রয়েছে, কার্নিভালের শ্লেষ সেখানেই উতরোল হয়ে ওঠে। বয়ানের শেষে আসগর যখন তার ডান হাতের কব্জিতে আরগসের শেকলের একটা দিক বেশ টাইট করে জড়িয়ে নেয়, মানুষ ও কুকুরের এমন একাত্মতা ব্যাধিগ্রস্ত বিমানবায়িত সমাজব্যবস্থার অভ্রান্ত প্রমাণ। বিশেষত গল্পকার যখন লেখেন : 'আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে আরগস খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে'—সে-সময় মনে হয় ভাষার অন্তরালে চাবুক উদ্যত হয়ে উঠছে স্থিতাবস্থাপন্থীদের উদ্দেশে। নিঃসন্দেহে শুধু একটা নিটোল গল্প পরিবেশন করাই লক্ষ্য নয় ইলিয়াসের। তিনি পাঠকের মনে বিশেষ কিছু অনুভব সঞ্চারিত করে দিতে চান।

প্রাগুক্ত ভূমিকায় গল্পকারের বাস্তবতা সন্ধানে 'স্বকীয় ধাঁচ'-এর কথা বলা হয়েছে। খুব ঠিক কথা। সার্থক ছোটগল্প হতে পারে ওই ধাঁচ বা আকল্পের নিজস্বতায় যা কিনা কাহিনির কাঠামোয়, সংলাপে, বয়নের বিশিষ্ট ধরনে ফুটে ওঠে। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব হল অনুপুঙ্খের বিন্যাস কেননা এইসব অনুপুঙ্খ আসলে বাচনের চিহ্নায়ক। ভূমিকাকার মন্তব্য করেছেন : 'জীবনের অস্থিমজ্জা সারাৎসারের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতে গিয়ে ইলিয়াস ব্যবহার করেন পর্যাপ্ত ডিটেলস। কেবল বস্তুজগত কি দৃশ্যজগতের সাদামাটা বিবরণ নয়, মানসিক জীবনের সঙ্গে এই জগতের সম্পর্ক এবং মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্ট তরঙ্গও তিনি খুব গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বর্ণনা করেন ব্যাপক স্থান ও সময় জুড়ে। প্রকৃতি ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বিবরণ তাঁকে সাহায্য করে একটি নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান পেতে এবং সেই অবস্থানে থেকে তিনি স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি করেন তাঁর গল্পের জগৎ।'

এই মন্তব্যের যথার্থতা 'যুগলবন্দি'র অনুপুঙ্খ ব্যবহারেও ফুটে উঠেছে। বয়ানের প্রথম অনুচ্ছেদে অনুপুঙ্খ-প্রয়োগের দক্ষতা এমন যে শুধুমাত্র আসগরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎই হয় না আমাদের, তার শ্রেণীগত অবস্থান-ভীরুতা-পরগাছাবৃত্তিও দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে উচ্চবিত্ত সরোয়ার বি কবিরের হাস্যকর অন্তঃসারশূন্যতা এবং মুখোসের আড়ালে আসল কাকতাড়ুয়া মূর্তিও গোপন থাকে না। অর্থাৎ ইলিয়াসের সানুপুঙ্খ বয়ান সূক্ষ্মভাবে বহুস্বরিক ; এক ঢিলে একাধিক পাখি মারতে পারেন তিনি। ছোটগল্পের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ হিসেবে এই অন্তর্নাট্য ঋদ্ধ অংশটি অনবদ্য এবং লক্ষ্যভেদী। তা সরাসরি পাঠককে প্রতিবেদনের মর্মস্থলে নিয়ে যায় :

'আসগর।'

কার্পেটে বসে আসগর হোসেন তখন খালি সব বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তলানি ঢালছিল নিজের জিভে। মস্ত ড্রয়িং রুমের আরেক মাথায় সরোয়ার বি কবিরের হুইস্কিশোষা গলা গমগম করে উঠলে প্রথমে সাড়া দেয় বারান্দায় বসে থাকা

এ্যালসেশিয়ানটি। তারপর চমকে উঠে আসগর। অতিথিদের বিদায় দিয়ে সরোয়ার কবির এই তো ভেতরে গেলো, ১৫ মিনিটের মধ্যে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলে এখন বোতল ঠোঁটে ধরার সাহস আসগরের হয়? মিনিট দশেক আগেও বারান্দায় বসে সে আরগসের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, সরোয়ার কবির ফিরে আসবে জানলে তাই অব্যাহত রাখা যেতো। আসগরের লাকটাই এরকম, সায়েবের ফেবারিট কাজগুলো যখন করে সায়েব তখন লক্ষ্যই করে না। সরোয়ার কবিরের গলা পর্যন্ত এখন ডিম্পলে শিভাজ রিগ্যালে টইটম্বুর, সাহিত্য কি কোষ্ঠকাঠিন্য কি নিজের ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকাদেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে তো রাতটা বসে বসেই কাবার।'

এই যে বয়ান, কানির্ভালের শ্লেষ-তিক্ত হাসি যেন তার প্রতিটি বাক্যকে ভেতর থেকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। যে-সমাজে পারাপারহীন অসাম্য অকাট্য বাস্তব, মানুষ সেখানে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সামাজিক পরিসরের ভেতরকার পাশবিকতা আসগর হোসেনকে দাক্ষিণ্যের জন্যে কাঙাল করেনি শুধু, তাকে পোষা কুকুরের চেয়েও নিচু অবস্থানে নিয়ে গেছে। একদিকে সরোয়ার কবিরের মতো অপমানুষদের বিলাসিতার অপব্যয় আকাশ ছুঁইছুঁই, অন্যদিকে আসগরের মতো অন্তেবাসী ব্রাত্য মানুষ মিলিয়ে যায় ছায়াচ্ছন্নতায়। মাঝখানে অ্যালসেশিয়ান আরগস চূড়ান্ত বিদ্রূপের মতো বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পের প্রথম বাক্যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অন্তেবাসী ও তার হাস্যকর অবস্থান শ্লেষতিক্ত চিহ্নায়কে উপস্থাপিত। ঘরে বউ না থাকলেও সোফায় বসার সাহস হয় না আসগরের। ভালো খাদ্য ও পানীয়কে সে কেবল দূর থেকে আড়চোখে দেখতে পারে। আর, নিতান্ত ছিঁচকে ভিখিরির মতো কার্পেটে বসে খালি সব মদের বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তলানি নিজের জিভে ঢালতে পারে। 'দারিদ্র্যই চৌর্যবৃত্তি'—এই কথাটি প্রবচনের মর্যাদা পেয়েছে, আমরা জানি। আসলে সম্পদই মানুষের পৃথিবীতে অজস্র ধুপছায়ার অঞ্চল এবং নিরালোক বৃত্ত তৈরি করে। সেই বৃত্তের বিধিবিন্যাস আলাদা। একজন সংবেদনশীল গল্পকার ওই সমান্তরাল পরিসরের প্রতি তর্জনি সংকেত করেন না কেবল, মানিয়ে নেওয়ার ছলে কীভাবে হতমান মানুষ ধাপে ধাপে নামতে নামতে পশুর স্তরে পৌঁছে যায়—তাও নির্মম নিরাসক্তি দিয়ে প্রকাশ করেন। অ্যালসেশিয়ানের নামকরণ করতে হোমারের মহাকাব্যিক জগৎ থেকে 'আরগস' কে বেছে নেয় যারা, তাদের কাছে কুকুরের সম্ভ্রম ও আভিজাত্য ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসগর বিলিতি কুকুরের কাছাকাছি মর্যাদায়ও থাকতে পারে না, প্রভুকে খুশি করার প্রয়োজনে কুকুরকেও তোয়াজ করতে হয় তাকে। মানুষের এই অবনমন শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই ঘটে। তবে সবচেয়ে নিষ্ঠুর বাস্তব তো এই যে নিজের অবনমন এবং বাধ্যতামূলক নরকের বলয় সম্পর্কে সেই মানুষটি স্বয়ং চেতনাশূন্য, বোধহীন। মনে পড়ে যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রবাদপ্রতিম পঙক্তি, 'What man has made of man'।

অতএব বারান্দায় বসে আসগর প্রভুর কুকুরের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় একমাত্র এই

আশায় যে তার খেদমত প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু 'সায়েবের ফেভারিট কাজগুলো যখন করে সায়েব তখন লক্ষই করে না', এ জাতীয় বিবৃতিতে উতরোল হয়ে ওঠে শ্লেষ। বয়ানে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগও গল্পকারের সূক্ষ্ম বোধের প্রমাণ : যেমন 'ফেভারিট'। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলা কিংবা ভাবা আসলে নিজেকে সম্ভ্রান্ত করে তোলার অবচেতন প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি। কখনো-কখনো অবশ্য তাতে মিশে যায় তীব্র শ্লেষ ও স্যাটায়ার। আর, যৌন অনুষঙ্গের সূক্ষ্ম ব্যবহারে পারদর্শী ইলিয়াস বাচনের এই বিভঙ্গকে প্রসারিত করে যান ক্রমাগত। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচে যে-অংশটি উদ্ধৃত করছি, তা অন্তর্বয়নের জন্যেই আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। সাহিত্যের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য আর ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকাদেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলে যে সরোয়ার কবির, সে কোনো ব্যক্তি নয়, সে তার শ্রেণীর প্রতিনিধি। গল্পকারের কঠিন ব্যঙ্গ ওই শ্রেণীবদ্ধ মানুষের কাকতাড়ুয়া মূর্তি ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'আসগর আড়চোখে সার্ভে করে ; না, চেহারা দেখে তার মুড বোঝবার জো নাই। তবে মিসেস জেসমিন বি কবিরের মেজাজ বোধহয় ফর্মে নাই, বেডরুমে লোকটা সুবিধা করতে পারেনি। আহা, এতোবড়ো জাঁদরেল অফিসার—যার হাত দিয়ে লক্ষপতি কোটিপতিদের রোজগারের খানিকটা চালান হয়ে আসে রাষ্ট্রীয় তহবিলে—দ্যাখো বৌয়ের মেজাজের জন্য মাসে কম করে হলেও ৪/৫ দিন তাকে কাটাতে হয় ড্রয়িং রুমে, স্রেফ সোফায় কি ডিভানে আধশোয়া অবস্থায়।'

২

এক পলকে মনে পড়ে যায় হাসান আজিজুল হকের অনবদ্য ছোটগল্প 'পাব্লিক সার্ভেন্ট' এর কথা। 'যুগলবন্দি'র সঙ্গে তার তফাত অনেক ; তবু কোথাও যেন আত্মিক সাদৃশ্য রয়েছে। সরোয়ার কবিরেরাই শেষপর্যন্ত মামুন রশীদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একই গোত্রের মানুষ এরা ; দুজন দু-পর্যায়ের। রাষ্ট্রযন্ত্র এদের দৌলতেই টিকে থাকে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতাপের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে পার্থিব সম্পদে ফুলে-ফেঁপে উঠতে গিয়ে এরা যে নিজেদের মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ করে তুলছে, তার আভাস পাই জেসমিনের কাছে সরোয়ারের খানিকটা জব্দ হওয়াতে। আর, এর উৎকট পরিণতি লক্ষ করি মামুন রশীদের চোখের সামনে তার স্ত্রী শায়েলার ধর্ষণে। হাসান দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের তাঁবেদার হয়েও রাষ্ট্রশক্তিরই ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা নিজের স্ত্রীকে ধর্ষিত হতে দেখে আমলা মামুন। আসলে এ হল ছোটগল্পের নিজস্ব চিহ্নায়ক খচিত বাচন। 'গাদাগাদা অপরাধের তলায়...থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো গ্যাঁজলা তুলে' মরে যারা, মামুন এবং সরোয়ার তাদেরই প্রতিনিধি। ধর্ষণের সাতদিন পরে শায়েলা নীরবতা ভেঙে স্বামীকে ধিক্কার দেয় এভাবে : 'তোমার নিজের সম্মানও তোমার কাছে এতটুকু নেই। একটা কেন্নো বা একটা গিরগিটির সঙ্গেও তোমার তুলনা চলে না। সেটা সারা দেশের কেউ না জানলেও আমি জানি। ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান হয়ে চাবুক হাকড়াচ্ছো... তোমার মতো চামচিকে বেঁচে থাকে কবে যে মরবে?' একেই সম্ভবত 'Poetic

justice' বলে। অর্থাৎ এই ধিক্কার কেবল শায়েলার নয়, সংবেদনশীল সব পাঠকের এবং স্বয়ং গল্পকারেরও। অন্তত এখানে পাঠক ও লেখকের পরিসরের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আগেই লিখেছি, হাসানের 'পাব্লিক সার্ভেন্ট' হল সম্ভাব্য সমাপ্তিবিন্দু ; আর, ইলিয়াসের 'যুগলবন্দি'কে বলতে পারি সূচনাবিন্দু। সরোয়ার কবিরেরা অমোঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবধারিত ভাবে মামুন রশীদের পরিণতিতে পৌঁছে যায়।

এই নিরিখে দেখলে বুঝতে পারি কীভাবে 'যুগলবন্দি'তে উপস্থাপিত পৌর সমাজের একফালি ছবির পেছনে রয়ে গেছে রাজনৈতিক সমাজেরই অলক্ষ্যগোচর অথচ দুরপনেয় ছায়া। আমাদের এখানে মনে পড়ে যায় স্বয়ং ইলিয়াসের অসাধারণ একটি প্রবন্ধের কথা। 'বাংলা ছোট গল্প কি মরে যাচ্ছে?' নামক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, তথাকথিত ছোট সুখ ও ছোট দুঃখের পেছনে রয়ে যায় সমাজ ও সময়ের অনেক বড় উপকূলরেখা। এইজন্যে ছোট সুখ বা ছোট দুঃখ বলে কিছু হয় না। যেমন এই 'যুগলবন্দি' গল্পেও আসগর ও আরগসের নামগত সাদৃশ্য পুঁজিবাদের বিমানবায়ন প্রক্রিয়ার চিহ্নায়ক। আসগর সর্বহারা নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত বর্গে তার অবস্থান। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেও একটি বল্টু কিংবা পেরেক। চরম বিকারগ্রস্ত মনস্তত্ত্ব নিয়ে সে কেবল সুযোগের সন্ধান করে বেড়ায়। সরোয়ার কবিরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে ইলিয়াস কার্নিভালের আবহ তৈরি করেছেন : 'আসগর হোসেন কি?—না, তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওরের বন্ধু। এটা কোন সম্পর্ক হল? আসলে তো চাকরির উমেদার?" যেহেতু আসগর স্বপ্ন দেখে যে সারোয়ারের সাহায্যে সে ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড রবিনসন্স-এ চাকরি পাবে এবং চাকরি হলে ফার্নিশড ফ্ল্যাটে আধুনিক তরুণীকে বিয়ে করে রাত কাটাবে—বড়লোকের উমেদারি করতে গিয়ে সে নির্দ্বিধায় নিজেকে ভৃত্যের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। সে বি.এ. পাশ করেছে, তার পরিবারে মা, বাবা, ভাইবোন আছে। রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টারের ছেলে হিসেবে নিজের শ্রেণীগত অবস্থানে সে মোটেই খুশি নয়। তার কাছে নৈতিকতা বা দায়িত্ববোধের কোনো গুরুত্ব নেই। আমেরিকান জাহাজের এক নাবিককে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে পটাতে পেরেছিল বলে বন্দর থেকে একটা ফ্রিজ সরিয়ে নিয়েছিল। যে সমাজ-ব্যবস্থায় ফ্রিজ থাকাটা সামাজিক চিহ্নায়কে পরিণত, সোজাপথে সেই স্তরে পৌঁছাতে পারে না আসগর।

অতএব সম্পর্কিত ভাই সিকান্দারকে সরোয়ার সাহেব চাকরি দেওয়ার পরে আসগর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। শুধু সরোয়ার নয়, তার স্ত্রী জেসমিনের মনোরঞ্জন করার জন্যে সে সর্বদা শশব্যস্ত। রাত পৌনে একটায়ও তাকে কমলালেবু খুঁজে আনার জন্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। এ ধরনের কাজ করতে সে যে অভ্যস্ত, গল্পকার তা আমাদের জানিয়েছেন নানা ভাবে। বিনিময়ে সায়েবের একটু আধটু অর্থ আত্মসাৎ, সিগারেটের প্যাকেট থেকে কয়েকটা সরিয়ে নেওয়া : এসব সে করে খুব তৎপরতার সঙ্গে। যেহেতু রৈখিক বৃত্তান্ত তুলে ধরা কাম্য নয় ইলিয়াসের, তিনি শ্লেষের বারুদ পুরে দিয়েছেন প্রতিবেদনে। সংবেদনশীল পাঠক ওই বারুদে অগ্নিসংযোগ করবেন কিনা, সে

তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে যে আসগরের ভেতর থেকে অন্য আরেক আসগর বেরিয়ে আসতে পারে। কেননা 'যুগলবন্দি'র পরাপাঠ এই যে 'Things are not what they seem !' যেহেতু অন্য উপায় নেই, শ্লেষ দিয়েই নির্মোক উন্মোচনের ইশারা করেছেন ইলিয়াস।

অতএব বৌয়ের কাছে নাজেহাল জাঁদরেল অফিসারের কথা ভেবে 'আসগর এতটা দুঃখিত হয় যে তার দুঃখ নিজেই বরণ করে নেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ ধরনের দুঃখকষ্ট ভোগ করার কপাল যে তার কবে হবে!' এ এক ধরনের বয়ান। আরেকটি ধরন লক্ষ করি এসব অভিব্যক্তিতে : 'কুশনঢাকা মোড়ায় বসে বসেই আসগর অ্যাটেনশন হয়। একই সঙ্গে অভিভূত চোখে তাকায়, সায়েব কীরকম পোলাইট, কী তার এটিকেট!' নিজেকে খেদমতগার হিসেবে তৈরি করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই আর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যারা উচ্ছিষ্টজীবী, তাদের জন্যে পূর্বনির্ধারিত ছাঁচের চেয়ে বড়ো কোনো সত্য নেই। নেই কোনো পৌর্বাপর্যও। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে মরিয়া বলেই আসগর যেন জ্যামুক্ত তীরের মতো সারোয়ারের মনোরঞ্জনের প্রতি ধাবমান। এইজন্যে 'কবির ভাই, বলে ডাকলেও তার কোনো অর্ডার ক্যারি আউট করার সময় আসগর স্যার বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।' রাতদুপুরে মদে টইটুম্বুর জেসমিন ফ্যাট বাড়াতে চায় না বলে কমলালেবু খেতে চায় ; সরোয়ার স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণ করতে ব্যগ্র। সুতরাং আসগরকে গাড়ি নিয়ে বেরোতেই হয়। কিন্তু তার আগে বয়ানের চাপা শ্লেষ সতর্ক পাঠক লক্ষ করেন নিশ্চয় :

'আপেল খেলে হয় না?' জিগ্যেস করেই আসগরের ভয় হয় যে এই কথায় সরোয়ার কবির তাকে কর্মবিমুখ অলস ও অপদার্থ যুবক হিসাবে চিহ্নিত না করে। সঙ্গে সঙ্গে তাই একটু মেরামত করতে হয়, 'রাত্রে কমলালেবু খেলে অনেক সময় এ্যাসিড হতে পারে।'

'আপেল থেকেই বরং এ্যাসিড হওয়ার চান্স বেশি'। এরপর কলা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়াটা রিস্কি। আর এদের সোসাইটিতে কলার পজিশনও ওর কাছে স্পষ্ট নয়।

সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে সরোয়ার কবির বলে, 'শি ওয়ান্টস অরেঞ্জ। ইট হেল্পস হার টু রিডিউস হার ওয়েট। টক তো চর্বিনাশক।'

'জি, টক সব সময় চর্বিনাশক।' সরোয়ার কবিরের ইংরেজির মতো তার কঠিন কঠিন বাঙলা কথাও রপ্ত করার জন্য আসগর সদা সচেতন।'

অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট যে খাদ্যাভ্যাসে এবং বাক্‌ব্যবহারে শ্রেণীবাস্তবতা উপস্থিত। আর, বুঝতে পারি যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের সীমাবদ্ধতা কত অনতিক্রম্য। আসগরের নড়বড়ে অবস্থানই তাকে করুণ জীবে পরিণত করেছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। গল্পকার সরোয়ার কবিরের পুরো নামটা ব্যবহার করছেন, কিন্তু আসগর শুধুই আসগর। বদান্যতা বিতরণ করে বলেই কি প্রথমোক্ত জন পূর্ণাঙ্গ এবং ভিখিরিতুল্য গ্রহীতা বলে আসগর হোসেনের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? বস্তুত শেষোক্ত জন তো কুকুরের সঙ্গে ব্যবহারেও স্বাধীন নয়। নিচের অংশটি লক্ষ করা যাক : 'গাড়ি

বার করার সময় এ্যালসেশিয়ানটা গরর গরর করলে আসগর ডাকে, আরগস। দূর। ডাকটা হার্শ হয়ে গেল। সরোয়ার কবির শুনে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে মোলায়েম ও আদুরে করে বলে, 'আরগস'। এবার গলাটা বেশি নিচু হয়ে গিয়েছিল। সরোয়ার কবির শুনলো তো?' শেষের বাক্যটি যেন শ্লেষের চাবুক হয়ে আমাদের মানবিকতা বিষয়ক গর্বের উপর আছড়ে পড়ে।

৩

ইলিয়াস যে কত বড়ো নির্মাণশিল্পী ছিলেন, এর প্রমাণ রয়েছে ঠিক তার অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদে। এখানে তিনি সচেতন ভাবেই প্রতিবেদনের রৈখিকতা ভেঙে দিয়েছেন। নইলে ছোটগল্পের আখ্যানে হয়তো বা 'গল্প বলছি, শোনো' জাতীয় আদল ফুটে উঠত। কেউ কেউ অবশ্য বলতেও পারেন, লেখকস্বর এখানে গল্পের বাস্তবতাকে খানিকটা আড়াল করে দিয়েছে। এতক্ষণ যে আসগরকে দেখেছি, তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য এক অপরিচিত ও ঈষৎ পরাবাস্তব অস্তিত্ব পাদপ্রদীপের সবটুকু আলো শুষে নিচ্ছে। তাহলে গল্পকার কি বোঝাতে চান আমাদের, যে, এধরনের সম্ভাব্য অপরসত্তা প্রচ্ছন্ন থাকে প্রতিটি রুদ্ধাবকাশ অস্তিত্বের মধ্যে? গল্পত্ব এখানেই যখন বাস্তবের আঁটোসাঁটো গাঁথুনি এমনি আচমকা বিনির্মিত হয়ে যায়। হয়তো এ হেন অপরতার উদ্ভাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না ; আলো ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে ওঠে কেবল অন্ধকারকে গাঢ়তর করার জন্যেই। ঢাকার রাজপথে নিশুতি রাতে বেরিয়ে আসগর নিজেরই অজ্ঞাত সেই অপরসত্তার মুখোমুখি হচ্ছে অথচ তার গভীর তাৎপর্য সে নিজে বুঝতে পারছে না। আর, পারছে না বলেই লেখকস্বরকেই মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে বয়ানে। এই দৃষ্টিকোন থেকে এবার লক্ষ করতে পারি আসগরের বিরল অনুভূতির বিবরণকে : 'এরকম অদ্ভূত লাগেনি কোনোদিন কোথাও পাতলা কোথাও ঘন কুয়াশার আড়ালে পাহাড়গুলো ভারি রহস্যময়। পাহাড়ের এখানে ওখানে আলো জ্বলে, কুয়াশায় সেইসব আলো এখন ঝাপসা। কখনো ১টি আলো ২টি ৩টি আলোয় ভাগ হয়ে লুকোচুরি খেলে। গাড়ির হেডলাইটের আলো কুয়াশা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেই গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফ্যাকাসে অন্ধকার বড়ো অপরিচিত মনে হয়। গাড়ির জানলা খোলা, সেদিক দিয়ে পাহাড়ের ঠাণ্ডা নিশ্বাস এসে মুখে লাগে। জানলাটি উঠিয়ে দিতে বাধো বাধো ঠেকে, মনে হয় কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো সরে সরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ করে চোখে পড়ে একটু দূরে পাহাড়ের মাথায় ন্যাড়া ঢ্যাঙা গাছের পাতা ঝরা ডালে ডিমে তা দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের কালচে রক্তের রঙের চাঁদ। ডাল ভেঙে শালার চাঁদ পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়লে মহা কেলেঙ্কারি!'

সন্দেহ নেই যে বাচনে লেগেছে পরাবাচনের আভা কেননা এই বিন্যাসের মর্মমূলে রয়েছে পরাবাস্তবের দ্যুতি। এই বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গির পরিণত রূপ আমরা দেখেছি 'খোয়াবনামা'র অসামান্য ঔপন্যাসিক সন্দর্ভে। একে বলা যেতে পারে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার অভিব্যক্তি যা কিনা পলকে রুদ্ধ নিরেট বাস্তব পরিসরের মধ্যেও গোপন

সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার করে নেয়। এখানে যেন আসগরের মধ্যে ঘটে গেছে আমূল রূপান্তর ; যদিও তা স্থায়ী হয়নি কেননা স্থায়িত্ব অসম্ভব। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। এমনকি, পরাভাষার বিন্যাসেও সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীর ছাপ রয়ে যায় মূলত বাচনভঙ্গিতে। এইবার সমগ্র গল্পের প্রেক্ষিতে যদি এই আপাত দলছুট অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব, গোটা পাঠকৃতি কতকগুলি স্পষ্ট পর্যায়ে বিন্যস্ত। হয়তো বা ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের আকরণের সঙ্গেও এদের তুলনা করা যেতে পারে। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ হয়ে বয়ান যখন সমে পৌঁছেছে, যুগলবন্দির প্রতীতি স্পষ্ট তখন। প্রারম্ভিক উপস্থাপনা থেকে কমলালেবুর খোঁজে নিশুতিরাতে আসগরের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত যেন স্থায়ী। তখন বাদী ও সম্বাদী সুরের মতো আসগর ও আরগসের উপস্থিতি এবং আলাপের মতো সরোয়ার কবির সহ বিভিন্ন অনুপুঙ্খ। তারপর বিপরীতের দর্পণে সুরের দ্বিবাচনিকতা প্রতিষ্ঠা করে এই গল্পের অন্তরা অর্থাৎ পরাবাচনে স্পন্দিত বয়ান। ঠিক এর পরের পর্যায়ে নিরালোক বাস্তবের আরেক স্তরের কথাবার্তা। তখন আসগর গাড়ি চালিয়ে গেছে বাড়িতে অর্থাৎ নিজের বাসায়।

এখানে তার নিজস্ব নরকটিকে আমরা দেখতে পাই যা আসলে তার শ্রেণী-অভিজ্ঞানসূচক প্রেক্ষিত। প্রারম্ভিক অংশের (স্থায়ী) উচ্ছিষ্টজীবী আসগর এখানে (সঞ্চারী) দাপুটে মানু, যে তার নির্ভরশীল মা-বাবার ওপর চোটপাট করে। অর্থাৎ এক মানুষের ভেতরে কত আলাদা আলাদা মানুষ কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে—গল্পকার তা-ই দেখাতে চান। এইজন্যে বাবা-মা সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা চট করে ফনা তুলে ফুঁসে ওঠে : 'সারাজীবন কিপটেমি করে জমানো পয়সায় দালান তুলে লোকটার ঘুম কীরকম গাঢ় হয়েছে। রিটায়ার করার পর কাজ নাই কম্ম নাই খালি ঘুমাও, না? দাঁড়াও তোমার ঘুমের ঘোর ঘোচাচ্ছি, দাঁড়াও!' এরপর মায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা এবং নিজের নিত্যদিনকার প্রিয় খাদ্যের মেনু শুনে রাগে দুঃখে তার গা জ্বলে যাওয়া, তার বাবাকে দেখে সরোয়ার কবিরের জাঁদরেল চেহারার বাপের কথা মনে পড়া এবং পরবর্তী কথোপকথন প্রমাণ করে, কীভাবে সীমাবদ্ধ শ্রেণী-অবস্থানের হীনমন্যতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে আসগর। কিন্তু কিছুতেই তার উঞ্ছবৃত্তি কাটিয়ে উঠতে পারে না। সরোয়ারের দেওয়া টাকা থেকে ত্রিশ টাকা বাবাকে দিয়ে সে নিজের বড়োমানুষি চাল অব্যাহত রাখে, জেসমিনের জন্যে কেনা কমলালেবু থেকে এক ডজন সরিয়ে রাখে এবং একটি নিজে খেয়ে নেয়। ভাত খাওয়ার জন্যে মায়ের অনুরোধকে 'বাঙাল মার্কা কথাবার্তা' মনে করে সে ভেতরে ফুঁসে ওঠে। জেসমিনের সঙ্গে মায়ের প্রতিতুলনায় তার হীনতাবোধ জেগে ওঠে বলে সে ক্ষুব্ধ বোধ করে। সে এভাবে আসলে নিজের সামাজিক উৎসকেই অস্বীকার করতে চায়। বাবার পরনে ময়লা বেনিয়ান দেখে দামি স্লিপিং স্যুটের কথা বলে আসগর নিজের কাকতাড়ুয়া মূর্তিকেই স্পষ্ট করে তোলে। আর, এখানেই বয়ানের তৃতীয় পর্যায়টিও শেষ হয়ে যায়।

চতুর্থ পর্যায়ে আসগর ফিরে আসে সরোয়ার কবিরের ড্রয়িং রুমে। তখন সবাই ঘুমন্ত। নাটকের স্বগত সংলাপের ধরনে আসগর নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা

আমাদের জানায়। সে মনে মনে কেবলই ভাবতে থাকে কীভাবে সরোয়ার কবিরের কাছে আসল কথাটা পাড়বে। এভাবে অত্যন্ত কৌশলে ইলিয়াস প্রধান কুশীলবের উপর নানাদিক থেকে আলোক সম্পাত করেছেন। এতে পাঠকৃতির রৈখিকতাও এড়ানো গেছে এবং এক ধরনের অন্তর্নাট্যের আভাস তৈরি হয়েছে। আমরা আরো লক্ষ করি যে ছোটগল্পের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী 'যুগলবন্দি'তেও সময়ের বিন্যাস নির্দিষ্ট আকল্পের দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। কেননা বয়ানের শুরু রাত পৌনে একটার কাছাকাছি। রাত দেড়টায় কমলালেবু জোগাড় করে আসগর গেছে মাদারবাড়িতে, রাত আড়াইটা নাগাদ সে ফিরে এসেছে সরোয়ার কবিরের বাড়িতে। পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা সকাল পৌনে সাতটায়। তারপর ধীরে ধীরে রোদ যখন ছড়িয়ে পড়ছে লনে, সরোয়ার ও জেসমিনের উচ্চবিত্ত সুলভ জীবন-যাপনের একটা ছবি স্পষ্ট হল। সময়ের আকল্পে যখন দুপুরের আভাস আসে, অল্পক্ষণের জন্যে আসগর ছায়াচ্ছন্নতা থেকে রোদের সীমানায় এসে দাঁড়ায়।

সে-সময় ক্ষণিকের জন্যে কেন্দ্রীয় কুশীলবের চাপা-পড়া মানুষের মূর্তি হঠাৎ বেরিয়ে আসে। অবশ্য সেই মুহূর্তেও তার ব্যক্তিগত স্বর্গের বিচ্ছিন্ন অবভাস অটুট থাকে : 'কাল বিকাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা হুইস্কি আর কমলালেবুর গোটাচারেক কোয়া ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। রাত্রে মা এত করে মাছ দিয়ে ভাত খেতে বলল। মা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে কী রোগ হচ্ছে কে জানে? ম্যাকডোনাল্ড এ্যান্ড রবিনসনের কাজটা পেলে খেয়ে না খেয়ে দিনরাত এখানে পড়ে থাকতে হবে না। কোম্পানির ভালো বাড়ি আছে কুলশিতে। ফার্নিশড বাড়ি। যা যা দরকার সব পাওয়া যাবে। এমনকি ফর্সা, বয়কাট চুল, ডায়াটিং করা, স্লিম, ন্যাকান্যাকা করে কথাকওয়া ১টা বউ পর্যন্ত!' কিন্তু তার এই ব্যক্তিগত স্বর্গে 'কেরানি মেন্টালিটি' সম্পন্ন বাবা কিংবা নিচুতলার খাওয়ার রুচি নিয়ে থাকা মায়ের কোনো স্থান নেই। সে চায় সবাইকে তার ছাঁচে গড়ে তুলতে। কিন্তু সব কিছু ইচ্ছেমতো হয় না বলে নিজেরই উপর অক্ষম ক্রোধে সে হঠাৎ আরগসকে চড় মারার জন্যে বাঁ হাতটা উপরে তোলে। আর, সেই মুহূর্তের বর্ণনায় ইলিয়াস কার্নিভালের হাসিকে উতরোল করে তোলেন : 'পাগল। সে কি পাগল হয়ে গেলো? বুদ্ধিমানের মতো চট করে ডান হাত দিয়ে নিজের বাম হাতটা নামিয়ে নেয়। ডান হাতের চাপে বাম হাতের কব্জি লাল হয়ে গেলো।'

৪

এই ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতকে ফিরিয়ে আনা চমৎকার এক প্রতীকী ক্রিয়া। ছোটগল্পের পক্ষে উপযুক্ত এই বাচন। এবং, এরপরই আমরা প্রতিবেদনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাই। সময় তখন বিকেল অর্থাৎ কম-বেশি আঠারো ঘন্টার মধ্যে পাঠকৃতির সাতটি স্তর বিন্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয় পাদপ্রদীপের সবটুকু আলো আসগরের ভেতর-মহলকেও দেখে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু সরোয়ার জেসমিনও বাদ পড়ে না। আসগরের মধ্যে আরগসের ছায়া মাঝেমাঝেই জানান দেয়। ইলিয়াস গল্পভাষার

অনুপুঙ্খ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, আসলে আসগরের ভূমিকা অনুগত পোষা কুকুরেরই। প্রভুর কাছে তার লেজ নাড়া, অন্যের কাছে তর্জন। তাই 'সরোয়ার কবির হাসলে আসগরও অগত্যা হাসে,' 'আসগর দরজায় ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি মারে আর চ্যাঁচায়', 'রাগ করার সুযোগ পেয়ে আসগর 'খ্যাঁক করে উঠলো', 'কৃতজ্ঞতায় সে জিভ নাড়ে'। এখানে বলা যেতে পারে, আসগরের জিভ নাড়া হলো আরগসের লেজ নাড়ার বিকল্প। অতএব ক্বচিৎ কখনো 'সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে' ভাবলেও খাঁচা থেকে বেরোনোর কোনো পথ খোঁজে না আসগর। 'কবির ভাইকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে' এই সিদ্ধান্ত থেকে কুকুর আরগসকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে সে ব্যবহার করতে চায়। সরোয়ার যখন ভোরে লনে ব্যায়াম করে 'আরগসকে আদর করে তখন সরোয়ার কবিরের ইমপ্রেশনটা জাস্ট ভালো করা। ব্যাস, দিস মাচ। সায়েবকে তখন শুধু খুশি করা। কথাটা বলবে সরোয়ার কবির যখন অফিস যাবে তার আগে আগে। কিন্তু ঠিক পরিকল্পনা মতো কাজ হয় না। সুযোগ কেবলই পিছলে যায়।' এই প্রক্রিয়াও তাৎপর্যপূর্ণ। কমলালেবুর প্রসঙ্গ থেকে আরগসের মিল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা থেকে আসে বাউয়েলস ক্লিয়ার হওয়ার প্রসঙ্গ। কার্নিভালের স্পর্শে এই অংশটি খুব চিত্তাকর্ষক।

এই এক পর্যায় যখন সরোয়ার কবির ও তার স্ত্রী জেসমিনকে উপলক্ষ করে উচ্চবর্গীয়ের হাস্যকর অন্তঃসারশূন্যতা ও জান্তব অস্তিত্ব উন্মোচিত হয়েছে। তাই সরোয়ারের প্রধান বিবেচনা কথায় কথায় কোষ্ঠ নিয়ে কথা তোলা। কিন্তু তা আবার জেসমিনের রুচিতে বাধে, সে ফিগারের ব্যালান্স নষ্ট হওয়া নিয়ে চিন্তিত। সরোয়ার কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সিগ্রেট টেনে যায়, ভোরবেলায় জগিং ও ব্যায়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য পাকস্থলি পরিষ্কার করা। তবে কোনো-এক বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সে যা বলে, তাতে তার শ্রেণীগত জান্তবতা স্পষ্ট। ইলিয়াসের স্যাটায়ার এখানে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে : 'ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শর্ট একটা ইন্টারকোর্স সলভস ইওর প্রবলেম। কয়েকটা স্ট্রোক দিলেই তলপেটে চাপ পড়বে, এরপর রেগুলার ডোজ অফ থ্রি সিগারেটস এ্যাণ্ড ইউ গেট ইউর বাওয়েলস ক্লিয়ার।' এর সঙ্গে সে জড়িয়ে নেয় জেসমিনের ফিগার স্লিম রাখার জন্যে ব্যাকুলতাকেও : 'ভোরবেলা ঘুম থেকে না উঠেও যে, এক্সারসাইস করতে পাচ্ছো এতেও তোমার ফিগার স্লিম থাকবে। এক নম্বর সাঁতার আর দুই নম্বর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, ইন দি আর্লি মর্নিং—আইদার অফ দিস টু কিপস ইওর ফিগার স্লিম।' অতএব বলতে ইচ্ছে করে, 'যুগলবন্দি' নামটি বহুস্বরিক। একদিকে আরগস ও আসগর, অন্যদিকে সরোয়ার ও জেসমিন—জান্তবতাই তাদের অদৃশ্য-এক অভিন্ন সূত্রে বেঁধে রাখে। তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঈষৎ খিটমিটের এবং স্ত্রীর কাছে সরোয়ারের জড়সড় হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিতে আরগসের বাউয়েলস ফ্লিয়ারের প্রসঙ্গ ব্যবহার করে আসগর।

এবার বয়ানও পৌঁছায় উপসংহারে। বিকেলে আব্দুলের জিম্মা থেকে আরগসকে নিয়ে বাইরে যায় আসগর। সে যে ডান হাতের কব্জিতে শেকলের একটি প্রান্ত বেশ টাইট করে জড়িয়ে নেয়—এই আপাত-তুচ্ছ বিবৃতি গভীর দ্যোতনাগর্ভ। কুকুরের সঙ্গে

মানুষের বাঁধা হয়ে যাওয়াতে কোনো অস্বস্তি জাগে না মনে। বরং নিশ্চেতন মনে আসে নিরাপত্তা ও আশ্বাসের বোধ। কুকুরের পাকস্থলি পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে অদৃশ্য শেকলে জড়িয়ে গেছে আসগর নামক এক সুযোগ-সন্ধানী মানুষের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। এই শেকল বিমানবায়িত সমাজ-ব্যবস্থার যেখানে উচ্চবর্গীয় অবস্থান অর্জনের সুবাদে চরম অন্তঃসারশূন্য মানুষও সর্বত্র দাপট দেখিয়ে বেড়াতে পারে। অথচ শেকল ছিঁড়তে পারে না আসগরের মতো উঞ্ছজীবী প্রান্তিক মানুষেরা। গল্পকারের মুন্সিয়ানায় যুগলবন্দি কেবল মানুষ ও পশুর জান্তব সত্তার মধ্যে ব্যক্ত হয়নি, আরো বড়ো আরো অমোঘ শেকলের ছায়ায় বেজে চলেছে অন্য এক তিক্ত কষায় যুগলবন্দির মূর্ছনাও। আসগরের ভাবনায় সরোয়ার কবিরের উপস্থিতি যেভাবে প্রকট হয়েছে, তার শব্দমধ্যবর্তী শূন্যায়তনের যথার্থ ভাষ্য করলেই ওই যুগলবন্দি অনুভব করতে পারি। 'এঞ্জিনিয়রদের সে সিমেন্ট-বালির অনুপাত সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, এ্যান্টিবায়োটিক কোথায় প্রয়োগ করা উচিত তা শিখিয়ে দেয় ডাক্তারদের, কলেজের বুড়ো প্রফেসার দ্যাখা করতে এলে তাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ক্লাসে রোলকল করার সঠিক ও আধুনিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছিল। ঝাড়ুদারকে ঝাড়ু ধরার কায়দা দেখিয়ে দেয়, আইন গাইনের যথাযথ উচ্চারণ সম্বন্ধে তার এলেম জবরদস্ত আলেমদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। মেয়েদের পটাবার বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত লম্পটদের সে হার মানাতে পারে, কুকুর কখন কী খেতে ভালোবাসে সংশ্লিষ্ট কুকুরদের চেয়ে সে ভালো জানে!' অথচ এমন লোককে জেসমিন 'রাস্টিক' বলে গালাগাল দেয়। স্ত্রীর সামান্য অসন্তুষ্টিও তাকে বিচলিত করে।

তাই গল্প পড়া যখন শেষ হয়ে আসে, আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ করতে হয় : 'পাকস্থলিতে শেষ শীতের নির্মল হাওয়া বইতে থাকলে আরগসের আরাম ও তৃপ্তিতে আসগরের ডান হাতে বাঁধা শেকলে রিনি ঝিনি আওয়াজ ওঠে, আরগসের সঙ্গে আসগরও রীতিমতো দৌড়াতে থাকে সরোয়ার কবিরের কাছে পৌঁছানোর জন্যে।' এই ধাবমানতায় গল্পের বয়ান সমাপ্ত হয়; আমরাও অনুভব করি, চিহ্নায়িত এই ক্রিয়াপদের বিচ্ছুরণ অব্যাহত থাকবে এ সমাজে। এ যুগলবন্দি সহজে থামবে না। কিন্তু একথা ভেবেও কি খটকা জাগে না কে বেশি করুণ জীব : আসগর না সরোয়ার? কার কাকতাড়ুয়া মূর্তি শেষ পর্যন্ত প্রবলতর হয়ে উঠল পাঠকের মনে? অন্তত গল্পকারের অভিপ্রেত কি নয় কার্নিভালের তুমুল হাসির তোড়ে সরোয়ারের আমলাতান্ত্রিক পরিসর থেকে সব প্রসাধন মুছে নেওয়া? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আসগরকেও যেন তত কালো মনে হয় না আর।

এক প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নের বিচ্ছুরণে নিয়ে যায় বলেই 'যুগলবন্দি'র পুনঃপাঠ চলতে থাকবে আরো অনেকদিন।

গ্রহাণুপুঞ্জের আকাশ

এপাশে মায়ের মৃতদেহ, ও পাশে বাবার মৃতদেহ
মাঝখানে সে, মাত্র দু-বছর হল সে পৃথিবীতে এসেছে।
তার মাকে ফুল দিয়ে গেছে
বাবাকেও ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ে গেছে
পৃথিবীতে এত ফুল আছে?
আমরা বড়োরা জানি কখন আমরা ফুল দিই,
জ্বালাই কখন মোমবাতি?

এবছর ফেব্রুয়ারিতে এই কবিতাটি পড়েছি। অন্তর্জাল আর ই-মেল শাসিত দুনিয়ায় আমরা যতই মহানাগরিক সপ্রতিভতা আর চতুর নির্মাণের ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হই না কেন, কবিতার ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চালাকি দেখতে না-পেয়ে আশ্বস্ত হই যেন। একুশ শতকের এই প্রারম্ভিক দশক যখন ধীরে ধীরে অন্তিম প্রহরে পৌঁছে যাচ্ছে, এখনও কত অনায়াসে ফুল ও মোমবাতি চিহ্নায়িত বাচনের ভিত্তি হতে পারে। চারদিককার ধূসর ও নিরাবেগ অভ্যাসের ফুর্তি-ফার্তার মধ্যে এখনও চাপা অন্তর্নাট্যের আভাস বিষাদের ম্লান আভা বয়ে আনে কবিতায়। মা ও বাবার মৃতদেহের মাঝখানে দু-বছরের একটি বিপন্ন শিশুর উপস্থিতি তো আশ্চর্যজনকভাবে আজকের সময়েরই শিল্পিত উপস্থাপনা। তবু শিল্পের নির্মাণকলাও সমকালের নিষ্ঠুর সত্যকে আড়াল করতে পারে না। কবিও কি তা-ই চেয়েছেন? আসলে এ হল উচ্চারণের সামাজিকতা যা সর্বদা কবির সময়-নিষ্পন্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি।

সাম্প্রতিক সময় ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে অবিমিশ্রভাবে প্রতিভাত হয় কি? যতদিন যাচ্ছে, ভঙ্গুর পৃথিবীর তুমুল অনিশ্চয়তা ও ভরকেন্দ্রহীন ভাবনা কিংবা ভাবনাহীনতার আবর্তে শ্বাসরুদ্ধ হতে হতে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কোথায় আমাদের উপনিবেশোত্তর অবস্থানের বহুমাত্রিক স্বীকৃতি আর কোথায়-ই বা আধুনিকোত্তর সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের এলাকা! এ বড়ো বিচিত্র ঘূর্ণিপাকের সময় যখন সাপ ও নেউল স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করে। শিবির বদল হয় মুহূর্মুহু, নন্দন ও প্রতিনন্দনের মধ্যে লক্ষ্মণরেখা লুপ্ত হয়ে যায়। যে-সপ্রতিভ মানুষটি সময়-সচেতনতার পতাকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্নিবার তাড়নায় অন্তর্জাল-সাইবার কাফে-মোবাইল-শপিংমলের ঝাঁ-চকচকে দুনিয়ায় স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে পড়েছে, তার কাছে কবিতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নন্দন সহ মুদ্রাস্ফীতি সেনসেক্স—খুচরো দেশপ্রেম তালিবানীকরণ—আর ডি এক্স : সমস্তই তো একই রকম বার্তাহীনতার খবর হয়েই আসে। অর্থাৎ আদৌ আসে না। ব্রেকিং নিউজ

হিসেবে হিজড়ে পল্লীর বিয়ে, সরকারি প্রতিবেদনে সমকামিতার বৈধীকরণ প্রক্রিয়া, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে কভি খুশি কভি গম জাতীয় কূটনৈতিক খেলাধুলো, ক্রিকেটীয় জাতীয়তাবাদের তুমুল উত্থান এবং এ জাতীয় অন্য সব কাল-চিহ্নগুলি আমাদের সমকালকে অজস্র বুদবুদের সমাহার করে তুলেছে।

এই নৈরাজ্যময় মহোৎসবের মধ্যে কবিতা লেখা হচ্ছে, পড়াও হচ্ছে ; রচিত হচ্ছে 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' নীতির অনুসারী উপন্যাস নামক ভস্মীভূত অভ্যাসের কঙ্কাল। এইসব পড়ার ভান করতে করতে স্মৃতিলুপ্ত প্রজন্ম বোকাবাক্সের মোহিনীমায়ায় বুঁদ হয়ে সা রে গা মা পা এবং সেই জাতীয় আরও অনেক নির্বোধ স্থূলতা, ভাঁড়ামি ও ইতরতার প্রদর্শনী থেকে শিখে নিচ্ছে নয়া প্রাদেশিকতা, আবার পাশাপাশি মেনে নিচ্ছে অভ্যন্তরীন ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশও। হ্যাঁ, এখন সত্যিই চারদিকে দেখতে পাই, শিশুর কাঁধে মড়ার পালকি ছুটে চলেছে নিমতলায় এবং উত্তাল হয়ে উঠেছে বুড়োবুড়িদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ! তাই এখনই তো সেই সময় যখন এ-পাশে মায়ের মৃতদেহ এবং ওপাশে বাবার মৃতদেহ নিয়ে ছিন্নমূল ও লক্ষ্যহীন নবীন প্রজন্ম, মাঝখানে রয়েছে যেন ন যযৌ ন তস্থৌ। তার না আছে কোনো যাত্রা, না আছে কোনো গন্তব্য। একমাত্র কোনো কবিই দেখতে পান ঘটনা-সংস্থানের অন্তর্বর্তী চিহ্নায়নের তাৎপর্য। আর, লেখেন :

'এ পাশে তার মা, ও পাশে তার বাবা
সে জানে না আজ তার জন্মদিন
সে আর বাবার দিকে তাকিয়ে নেই
সে তার মায়ের দিকে আর তাকাচ্ছে না
সে তাকিয়ে আছে পুলিশের দিকে
সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমার দিকে
তোমার, তোমার, তোমার দিকে
কিন্তু আমি আর তাকাতে পারছি না ছেলেটার চোখে
যিশুর চোখের মতো চোখ, ছেলেটার আজ জন্মদিন
সবুজ প্রজাপতি হলুদ প্রজাপতি লাল প্রজাপতি
প্রজাপতিগুলো সব গেল কোথায়?

২

যেমন কোনো কোনো সকাল রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর, তেমনই এই প্রশ্নের মুখোমুখি নিরুত্তর হয়ে থাকি। ভাবি, প্রত্যুত্তরযোগ্যতা সত্যিই কি আছে আমাদের? পিকাসো যেমন বলেছিলেন, কবিতার এই বিপন্ন শিশুটি কি গণহত্যা ও আর ডি এক্স-এর বিস্ফোরণে কন্টকিত পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে পুলিশ ও বন্দুকের দিকে ছুঁড়ে দিতে পারবে এক মুঠো গোলাপের পাপড়ি? গ্যের্নিকার ফ্যাসিবাদী হিংস্রতা থেকে বাহাত্তর বছর পরে আমরা কি আরও নিষ্ঠুর জান্তব ঘাতক সময়ের অভিব্যক্তি দেখছি না? দর্শন-সাহিত্য-

সংস্কৃতি সহ যাবতীয় মানবিক কৃতির প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু, নিষ্কর্ষ ও অন্বিষ্ট কি কেবল ঘাতক সময়ের হনন প্রস্তুতিকেই লক্ষ করবে? না কি বহুমাত্রিক সময়ের বর্ণচ্ছটা কিংবা বর্ণহীনতার তাৎপর্যকে ধারণ করার উপযোগী নতুন কৃৎকৌশল তৈরি করে নেবে? মানুষ-সভ্যতা-ভাবাদর্শ-ইতিহাসের অপমৃত্যুর একমাত্রিক ব্যাখ্যায় তৃপ্ত থেকে শুধু মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার চালাকি ও প্রসাধন রপ্ত করে নেবে? নাকি নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক না হয়ে সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে আপন পরিসর ও অবস্থানকে যথাযথভাবে শনাক্ত করে নেবে যাতে বিপন্ন শিশুর চোখেও খুঁজে নেওয়া যায় যিশুর চোখের মতো চোখ?

মনে দ্বিধা ও জিজ্ঞাসা জাগে তবু। সর্বজনীন সত্য বা সর্বসঞ্চারী উপলব্ধি বলে কিছু আছে কি আদৌ! বিশ্বায়নের পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কি আধিপত্যবাদী শোষণ-চাতুর্য ও চিত্তবৃত্তির উপনিবেশীকরণ সংক্রান্ত যুক্তিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে পারে কখনও? সেইসঙ্গে আরও একটি জরুরি জিজ্ঞাসা জাগে। যথাপ্রাপ্ত অবস্থান যেহেতু অনস্বীকার্য এবং আলাদা আলাদা ভাবে ও যৌথভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ভূগোলের বিপুল বাধ্যবাধকতা অনতিক্রম্য—সুনির্দিষ্ট অবস্থানগত বাস্তবতা তো প্রাগুক্ত জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রবণতাগুলির পরিগ্রহণকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যে-বাংলা ভাষায় এই প্রতিবেদনটি লিখছি, ইতিহাসের নানা পর্বে সেই ভাষা-ব্যবহারকারীদের মননমুদ্রাও বহুবাচনিক হয়ে পড়েছে। কলকাতা মহানগরের শিকড়বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মুদ্রাদোষে নিজেরা যেভাবে আলাদা হয়ে গেছেন, বিস্তীর্ণ মফস্সলের বাসিন্দা লিখিয়ে ও পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁরা কি ভুলেও কখনও আত্মীয়তা অনুভব করেন? প্রশাসনিক সূত্রে কিংবা সরকারি ব্যবস্থাপনায় এই দুইপক্ষকে নিয়মিতভাবে একই আঙিনায় জড়ো করা হয়। কিন্তু এঁদের মধ্যে পাউরুটির ঐক্যও তো দেখা যায় না। একপক্ষে যদি থাকে ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য তো অন্যপক্ষে থাকে বিচিত্র হীনমন্যতা বা অসূয়াজনিত বিকার। বাংলার ভাষামহল এখন অজস্র পরস্পর-বিরুদ্ধ তাঁবুর সমাবেশমাত্র। একই ভাষাজননীর সন্তানেরা কেউ কেউ সুয়োরানী ও কেউ কেউ দুয়োরানীর পুত্র কন্যা হয়ে পড়েছেন। স্বভাবত এঁদের প্রত্যেকের সত্য এবং সময় ও পরিসরের মিথষ্ক্রিয়ার প্রতীতি পরস্পর দ্বিমেরুবিষম।

বাংলা নামে দেশের পরিস্থিতিও ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্যভাবে জটিল যা আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের পরিসর প্রয়োজন। একই বাংলা ভাষার সন্ততি হয়েও দেশভাগ নামক আদিপাপ কী পশ্চিমবঙ্গে কী পূর্ববঙ্গে সামূহিক স্মৃতিলোপের ফলে মনোভূমি থেকে হারিয়ে গেছে। চর্যাপদেরও আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল যে অখণ্ড বাঙালি বিশ্ববীক্ষার অবিভাজ্য অভিব্যক্তির—১৯৪৭-কে দানবায়িত করে আমরা সেই যাত্রার তাৎপর্য ভুলে গেছি। যে-জাতি মেকি আন্তর্জাতিকতার প্রতি একদেশদর্শী মুগ্ধতায় কৃত্রিম ভঙ্গির অনুকরণে সর্বস্ব পণ করে বসে—সেই জাতির অপমৃত্যু নিশ্চিত। তার ওপর রয়েছে উদ্ভট সংকরসত্তা তৈরির আয়োজন : কোথাও মধ্যপ্রাচ্য আর কোথাও আর্যাবর্ত তার হোতা। ফলে পরম্পরাগত ভাবে নানা পর্যায়ে প্রতিবেশী

জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি ধর্মচর্যা-বিশ্ববীক্ষা থেকে নানা ধরনের উপাদান আত্তীকৃত করতে করতে বঙ্গজেরা যে সংশ্লেষণী মননমুদ্রা রপ্ত করে নিয়েছিলেন, আত্মঘাতী মূঢ়তায় সেইসব বিস্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রাক্-আধুনিক পর্ব পর্যন্ত অজস্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত গোষ্ঠীজীবনে নিশ্চিতভাবে এসেছিল ; কিন্তু সেইসব আর যা-ই হোক পায়ের নিচের জমি আর মাথার উপরের আকাশ মুছে দেয়নি। কিন্তু গত শতাব্দীতে যা ঘটল, তাতে বিশ্বায়ন দ্বারা আক্রান্ত বাংলা ভাষা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক হয়ে ওঠার উৎকট আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুত্ববাদের কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত হয়ে যে মগজ-ধোলাইয়ের আয়োজনকে কার্নিভালের উৎসব-মত্ততায় রূপান্তরিত করা হল, তাতে উৎপাদিত হল শুধু মেধার সন্ত্রাস। ফলে হারিয়ে গেল ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মুছে গেল যাবতীয় অভিজ্ঞান উৎকেন্দ্রিকতার অতিব্যক্ত উপস্থাপনায়। মেকি আন্তর্জাতিকতার অজস্র শিবির গড়ে উঠল মহানগর সহ আধাশহরগুলিতে।

একে আমাদের নিজস্ব আধুনিকোত্তর পরিস্থিতি বলা যাবে কী না, তা নিয়ে কিছু সংশয় আছে। তবে এটা ঠিক, এই শ্বাসরোধী পরিবেশের মোকাবিলা করতে চান কোনও কোনও কবি-লিখিয়ে। কেউবা হয়তো আরোপিত কুহককে অকাট্য সত্য বলে ধরে নিয়ে তারই আদলে নিজেকে তৈরি করে নেন। সময়ের চিহ্ন আন্তরিকভাবে যাঁরা খুঁজতে চান, তাঁদের প্রতিবেদনে যুগপৎ ফুটে ওঠে শ্লেষ ও বিষাদ, ক্রোধ ও লাস্য। ভাবা যেতে পারে, বাচনের বিশিষ্ট ধরনেই ফুটে ওঠে তাঁদের প্রতিবাদ ও যন্ত্রণা। এ-প্রসঙ্গে সব্যসাচী ভৌমিকের 'কালবেলা' কবিতাটিকে তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়।

'অবাক কান্না মিহি কুয়াশায় জড়ানো
নাগরিক মন ছিটকে পড়ছে যন্ত্রে
যন্ত্র মানব একলা এবং সদলে
গণ বাঁধকেই মেঘ হারানোর মন্ত্রে
মন্ত্র সাধন কিংবা শরীর পাতন
শরীরে মিশছে ফেরারী পতিত বিশ্ব
তৃতীয় বিশ্ব শপিং মলের স্বপ্নে
ভাঙা হাঁড়ি কুড়ি বিলিয়ে বিলিয়ে নিঃস্ব

যতবার খুঁজি আগুনের বারমাস্যা
মাটি ফুঁড়ে ওঠে একঘটি জল ভিক্ষার
আমরা সবাই কাগজে কলমে ব্যাঘ্র,
আগুন ভুলেছি দশকের ছায়াছত্রে।'

৩

সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বর এভাবেই কবিতার ভাষার গ্রন্থনাকে পাল্টে দেয়। সন্দেহ নেই যে সময়-চিহ্নিত ছোটগল্প এবং উপন্যাসের ভাষাও একইভাবে পুঞ্জীভূত অভ্যাসের

বল্মীকস্তূপ ফুঁড়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আর, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেইসব নির্মানবায়নের প্রবণতাকে উপেক্ষা করে বহুধা-বিপন্ন মানুষেরই পাশে দাঁড়াচ্ছে। কেননা নয়া ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিকার সংক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে এটাই সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। কিন্তু বাংলাকে অবশ্যই সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে তার আপন ভাষা-অভিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই সময়ের প্রকৃত সত্যকে ধারণ করতে হবে। কথাটা এইজন্যেই জরুরি যে সময়েরও আছে অজস্র আপাত-রূপ অর্থাৎ সত্যভ্রমের চতুর আয়োজন। এই আয়োজন আসলে মেধাবী প্রকাশের নামে নির্মননের সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিকতার পূর্বধার্য ভঙ্গির নামে জাতীয় সত্তার শিকড় উৎপাটন। রাজনৈতিক ভূগোলের চাপ যত বেশিই হোক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরম্পরা তাতে আচ্ছন্ন হতে পারে না। আমাদের যৌথ ভাবনা-প্রতিভার অজস্র মোটিফে ও আর্কেটাইপে, অনুপুঙ্খে ও মেটা ন্যারেটিভে উচ্চাবচতাময় অভিজ্ঞতার বিবরণে ও অন্তরীকৃত উদ্ভাসনে আমরা জেনে এবং না-জেনে অভিব্যক্তির ঐতিহ্যকে সম্প্রসারিত করে চলেছি। এর কোনও ব্যত্যয় হতে পারে না ; যদি হয়, তা আর যা-ই হোক, বাঙালির সার্বিক চেতনাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আপাত-সময়ের বর্নিল আঙ্‌রাখায় যাঁরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, প্রাগুক্ত মৌলিক সত্যটি তাদের যেন স্বধর্মে ফিরিয়ে আনে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাইরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে-সমস্ত উপভাষাভাষী বাঙালিরা আছেন, ইতিহাস তাঁদের ভূগোলকে কতখানি ছিন্নমূল করে দিয়েছে, বাংলা ভাষার অন্য শরিকেরা ভুলেও কখনও সেইসব কথা ভাবেন না। কিন্তু সেইসব অঞ্চলের আলো হাওয়া রোদেও আছে নিজস্ব ছন্দ লয়, আছে জমি ও আকাশের দ্বিরালাপ, আছে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ভরা পিপাসা না-ফুরোনোর যন্ত্রণা, আছে বৃত্তবন্দি অস্তিত্বের আর্তনাদ এবং ঘটাকাশের শর্ত পূরণ করেও দূরবর্তী কোনও মহাকাশের জন্য তৃষ্ণা। আছে রিক্ততা ও সীমাবদ্ধতার বোধ পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আরোপিত মনন-মুদ্রাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তথাকথিত মূলস্রোতের পঙ্‌ক্তিভুক্ত হওয়ার জন্যে অপ্রকাশ্য ব্যাকুলতা। আছে মন্থর সমাজের সঙ্গে অনন্বয়-ক্লিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব চক্রব্যূহ রচনা। এই উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে ভৌগোলিকভাবে বহুদূরে বসবাসকারী কোনও কবি যখন লেখেন :

'আমি আজ চূড়ান্ত চিনি না
চিনিনা মানুষ। মরুভূমি
কাকে বলে? কাকে বলে ভূমি?
ভূমি যাকে আমার চাবুকে
বিক্ষত করেছি? আমি চিনি?
না আমি চিনি না ; কে আকাশ,
কে গাছ, কে গর্দভ, কার পিঠে
আঁকা ভারতের রেলপথ।'

(বাড়ি থেকে পালিয়ে)

মনে হয়, দূরীকৃত অপর সত্তার চিহ্নায়িত বাচনই যেন ব্যক্ত হয়েছে। আজন্ম লালিত অভিজ্ঞতায় যে জনপদের মানুষেরা আধা-ঔপনিবেশিক শোষণে-লাঞ্ছনায়-অপমানে অভ্যস্ত, যাদের ঘরের বদলে তাঁবু আছে শুধু অন্দরে-বাহিরে, যাঁদেরে ঘিরে থাকে দারিদ্র্য-মালিন্য-অপুষ্টি আর বহুবিধ প্রতাপের লেজুড়বৃত্তি—তাঁরা চেনেন না কাকে বলে ভূমি আর কাকে বলে আকাশ! কাকে বলে মরুভূমি আর কাকে বলে মানুষের পরিসর—তা বোঝার আগেই গোষ্ঠী-ঘৃণার আগুন ঝলসে দিয়ে যায়। আর্থ-রাজনৈতিক বিন্যাসের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে ও উচ্চাবচতায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অতিসম্প্রতি তীব্রভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে অন্তর্ঘাত ও হত্যার চারণভূমি। সমস্ত অস্থির ও অনিশ্চিত যখন, বাংলা ভাষা-ব্যবহারকারীদের মধ্যেও অবধারিতভাবে দেখা দিয়েছে নানাবিধ বিকার ও বিদূষণ, দুশ্চিকিৎস্য আত্মবিস্মৃতি ও অগভীর সফরি সঞ্চরণ। সম্ভবত এইসব কিছুর জটিল প্রতিক্রিয়ায় এবং অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক কৌশল হিসেবে কূপমণ্ডুকতার আচরণবিধি মান্যতা পেয়ে গেছে। আরও একবার যেতে পারি কবিতার কাছে যেখানে ঐ পরিত্রাণহীন বিপন্নতায় আক্রান্ত অপরসত্তার প্রচ্ছন্ন হাহাকারই ব্যক্ত হয়েছে বলে ভাবা যেতে পারে :

'হাত ময়লা করেছি আমি
হাত নোঙরা করেছি আমি
আর নামব না নীচে ভাবি
তবু মদের গেলাসে নামি।

এক গেলাসে দুজন নামি
বড় গেলাসে দুজন নামি
অই গেলাস মানে সমাজ
যার ফেনায় পুড়েছি আমি।

বিষ পেরেকের মতো ঘৃণা
এসো বলব না পারছি না
এই পরবাস, অপমান
এর ভেতরেই করি গান।'

(ফেনায় পুড়েছি আমি)

৪

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অজস্র জাতি ও উপজাতি সমান্তরালভাবে উপস্থিত রয়েছে কিন্তু সহাবস্থানে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎবর্গ Multiculturalism কিংবা Pluralism নিয়ে বহুদিন ধরে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন, বই লিখছেন, আলোচনাচক্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছেন। কিন্তু দেশীয় শাসক এবং ভূ-রাজনীতির তত্ত্বে বিশ্বাসী

বৈদেশিক শক্তিগুলির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এই মৃগয়াভূমিতে বাস্তব ক্রমশ আরও পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। বিদ্বৎবর্গের চুল-চেরা বিশ্লেষণের কোনও তোয়াক্কা করে না এই বহ্নিমান বাস্তব। বাঙালি-অসমীয়া, উপজাতি-অনুপজাতি, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ধৃতরাষ্ট্রদের কল্যাণে কখনও দাবানল হয়ে দাউ দাউ জ্বলে আর কখনও ছাই চাপা আগুনের মতো ধিকি ধিকি পুড়িয়ে দেয় ধৈর্য ও অধ্যবসায় দিয়ে গড়া সাংস্কৃতিক মিলনায়তনগুলি। সাম্প্রতিক বিদ্যায়তনিক গবেষণায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল সরকারি অনুদান পাওয়ার পক্ষে চমৎকার 'বিষয়' হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সমাজতত্ত্বে, ভাষাবিদ্যায়, পরিবেশ বিজ্ঞানে, মানবিকী বিদ্যায় নানা প্রকল্প নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎবর্গ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ফালা ফালা করে দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি উন্নয়নের নামে সরকারি তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে-পড়া বর্গগুলির মধ্যে হঠাৎ-নবাবদের সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়ে গেছে। এঁরাই আবার নবার্জিত অর্থনৈতিক কৌলিন্যকে রাজনৈতিক প্রতাপে রূপান্তরিত করার জন্যে নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠী বা ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, জাতিবৈরের বিষ-বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে কেবলই দেখা যাচ্ছে চৈতন্যে মড়কের ছবি আর অন্যদিকে মগজ-ধোলাই এর শিকার হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা স্বভাবত অরাজক মৃগয়াভূমিতে সহাবস্থান-শূন্য অন্ধকূপে স্বেচ্ছাবন্দি। গত একদশক ধরে নবীনতর প্রজন্ম হ্যামলিনের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে পাড়ি দিচ্ছে ভারতীয় মানচিত্রের আলোকিত পরিসরে। বিশ্বায়নের উন্মাদনা ভরা আহ্বান পৌঁছেছে তাদের কাছে এবং ফলে যে-পথ দিয়ে যাচ্ছে তারা, সে-পথ দিয়ে ফিরছে না কেউ। মেধাশূন্য মরুভূমি তৈরি হচ্ছে সর্বত্র, গড়ে উঠছে বৃদ্ধাশ্রম। সবার অগোচরে বৈপ্লবিক রূপান্তর ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যমেধা ও নিম্নমেধাজনদের দাপট বেড়ে গেছে ভয়াবহ ভাবে। চোরাবালির বিস্তার দ্রুত বাড়ছে এখন। তাই পান্থপাদপের বদলে কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাসের বাড়াবাড়ন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে। তবু লেখা হয় কবিতা ও ছোটগল্প : সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার চূড়ান্ত অভাব সত্ত্বেও লেখা হয় মৌলিক নাটক, আঁকা হয় ছবি। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাগুক্ত ঐ অনেকান্তিক সাংস্কৃতিক বীক্ষা ও বহুত্ববাদী জীবনচর্যার সূক্ষ্ম ও গভীর প্রকাশ কতটুকু দেখতে পাই? মাঝে মাঝে অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী সৃষ্টি- ভুবনকে চিনে নেওয়ার উদ্যম হয়। কিন্তু তা সার্বিক পীড়া উপশমের বিশল্যকরণী তৈরি করার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

এ অঞ্চলের কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব প্রয়াস হয়, তা আসলে সাগরে লহরী সমান। ধারাবাহিক উদ্যম অন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান নিতে পারত, তাদের মধ্যে শুধু দেখতে পাই এলিয়ট কথিত 'Gesture without motion'-এর দৃষ্টান্ত। প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাসের অনুবর্তনে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু তাতে সার্বিক বিচ্ছিন্নতায় ক্লিষ্ট উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অন্ধবিন্দু থেকে উদ্ভাসনে উত্তীর্ণ করা যায় না, ইন্দ্রপ্রস্থই হোক অথবা

জব চার্নকের ঐতিহ্যপুষ্ট কলকাতা, সবার কাছেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল যদি সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ট্যুরিজমের চিড়িয়াখানা বলে গণ্য হয়, তাহলে অন্তর্জাল—বিশ্বায়ন—উপগ্রহ প্রযুক্তি—ধর্মীয় মৌলবাদ—আঞ্চলিক ভাষা-উপনিবেশবাদ ইত্যাদির বিচিত্র ককটেলে ভয়ঙ্কর মাদকই শুধু তৈরি হবে ক্রমাগত। সুতরাং বাংলা ভাষা-ভাষী সহ অন্য সমস্ত ভাষা-ভাবুকদের মধ্যে নিজস্ব বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি হোক। কেন্দ্র ও পরিধির সুনির্দিষ্ট স্বর্গের সেই পুরনো চিন্তাপ্রণালী ক্লিশে এবং সেইজন্যে বর্জনীয় বলে ঘোষিত হোক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আলো হাওয়া রোদে যারা পুষ্ট, তাদের কাছে নদী ও অরণ্য, উপত্যকা ও পর্বত লালিত নৈসর্গিক চিহ্নায়কগুলি সত্য হয়ে আসুক। মহানাগরিক বৈদগ্ধ্য, অন্তঃসারশূন্য সপ্রতিভ ভঙ্গি, মেকি আন্তর্জাতিকতার মোহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বভাবত বহুত্ববাদী জীবনে কোথাও প্রাসঙ্গিক নয়। চিড়িয়াখানার জীবদের প্রতি ট্যুরিস্টসুলভ দৃষ্টিপাত তাই প্রত্যাখ্যাত হোক।

৫

কিন্তু এতসব বলার পরেও আরও অনেক কথা থেকে যায়। একদিকে সংস্কৃতি সমবায়ের অনেকান্তিকতা এবং অন্যদিকে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য : এই বৈপরীত্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটবে কীভাবে? সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সামর্থ্যে যাদের একান্ত নির্ভরতা, তাদের কাছে অস্তিত্বতাত্ত্বিক বা জ্ঞানতাত্ত্বিক মুক্তি আসবে কোন পথে? তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নানা কারণে এত জটিল হয়ে পড়েছে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলি একে অপরের প্রতি বিরুদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট। প্রত্যেকেই চাইছে বিশ্বায়নের মাদকতাময় ভোজসভায় যোগ দিতে আবার সঙ্গে সঙ্গে আপন বন্দিশালাকে অটুটও রাখতে চাইছে। শানিত যুক্তির সংঘর্ষ নয়, পূর্ব-নির্ধারিত সংজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছোটো ছোটো সংঘের যুক্তিহীন ও পারম্পর্যহীন সংঘাত অপরতার দ্বিবাচনিক তাৎপর্যকে কখনও স্পষ্ট হতে দিচ্ছে না। তার ওপর রয়েছে প্রত্ন-আধুনিক ও আধা-আধুনিক অভ্যাস-পরম্পরার সঙ্গে নব-ঔপনিবেশিক চিন্তা-প্রণালীর সংকর সমাবেশ। এরই মধ্যে চলেছে নিঃশব্দ বিনির্মাণের পালা। বাংলা ভাষার নান্দনিক ও সাহিত্যিক সংরূপ কর্ষিত হচ্ছে আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা ও মননমুদ্রাকে আত্মস্থ করেই। মহাসাগরের মধ্যে ইতস্তত ভাসমান কিছু ভেলার মতো সাহিত্যিক অভিব্যক্তিগুলি জেগে ওঠে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। কখনও কখনও এইসব দ্বীপের মধ্যে সেতু রচিত হয় যদিও, সরকারি বা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অনুপস্থিতিতে এইসব সেতুর সামাজিক তাৎপর্য সর্বদা স্পষ্ট হয় না।

'Garden of Ethnic variety' বলে পরিচিত এই অঞ্চল অনস্বীকার্যভাবে অনেকান্তিক অথচ এর স্বাভাবিক পরিণতি বহুবাচনিকতা নয়। এখানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে আধুনিক জীবনবোধের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেছে কিন্তু তা আধুনিকতাবাদী প্রবণতা তৈরি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেউ কেউ দূরবর্তী মহানগরের ছত্রছায়ায় একলব্যের মতো স্বয়ংলালিত হয়ে অবক্ষয়বাদ কিংবা আধুনিকোত্তর মুদ্রার আশ্রয় নিয়েছেন বটে,

কিন্তু সেইসব অভ্যন্তরীন সংকটেরই প্রমাণ। পাশাপাশি রয়েছে খাসিয়া, গারো, মিজো, মণিপুরি, ডিমাসা, কার্বি প্রভৃতি জাতি বা গোষ্ঠীর লোকায়ত বিশ্ববীক্ষা প্রসূত মৌখিক সাহিত্য নির্ভর পরম্পরা। এদের মধ্যে মণিপুরি অবশ্য সাহিত্যিক সংরূপের নিরিখে বেশ খানিকটা এগিয়ে। কিন্তু এ অঞ্চলের বাংলা-অসমিয়া-হিন্দি সাহিত্যের প্রতিতুলনায় তা তেমন কিছু নয়। সবচেয়ে পরিতাপের কথা, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী হয়েও এরা পরস্পর সম্পর্কে উদাসীন এবং অনাগ্রহী। নইলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠল না কেন? এইজন্যে অনন্ত তাঁতী যখন চমৎকার অসমিয়া কবিতা লেখেন, ভক্ত সিং ঠক্করী মৈমনসিংহ গীতিকাকে বাংলা থেকে নেপালিতে অনুবাদ করেন, হিন্দিভাষী অশোক বার্মা বাংলায় কবিতা লেখেন, খৈরউদ্দিন চৌধুরী বাংলা ও মণিপুরি ভাষায় কবিতা চর্চা করেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষী সমরজিৎ সিংহ বাংলা কবিতার প্রবাহে যুক্ত হন। মনে হয়, হ্যাঁ, এই ছিল উত্তর-পূর্বের স্বভাবের পথ। ভাষা এখানে বন্দিশালা হওয়ার কথা নয়, তা চেতনায় সেতু নির্মাণের আয়ুধ হতে পারত।

তার মানে, উত্তর ঔপনিবেশিক প্রতিস্পর্ধার যথার্থ আয়োজন হতে পারত অনেকান্তিক ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বহুবাচনিকতার প্রকৃত নিরীক্ষাভূমি হিসেবে গড়ে উঠত যদি উত্তর-পূর্বাঞ্চল, অরূপা পটঙ্গিয়া কলিতা কিংবা সৌরভকুমার চালিহার অসমিয়া ছোটগল্প কারো অনুরোধের অপেক্ষা না করেই অনূদিত হত বাংলায়, মণিপুরিতে, খাসিয়ায়। অথবা নীলমণি ফুকন ও হীরেন ভট্টাচার্যের কবিতার পাশাপাশি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, প্রবুদ্ধসুন্দর করদের কবিতা সমান আগ্রহে পড়তেন সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর পড়ুয়ারা। মিথিলেশ ভট্টাচার্য, শেখর দাশ, রণবীর পুরকায়স্থ, দুলাল ঘোষ, দেবব্রত দেবদের বাংলা ছোটগল্প ইন্দিরা গোস্বামী, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, যোগেশ দাস, জোহিরুল হুসেইনদের অসমিয়া আখ্যানবিশ্বে সম্পৃক্ত হত সৃজনশীল দ্বিবাচনিকতার সামর্থ্যে। বহুবাচনিক এই ভুবনে প্রতিটি সত্তা হত অপর সত্তার সহযোগী ও পরিপূরক। আর, মিথষ্ক্রিয়ায়, শৌর্যে ও সৌন্দর্যে ঋদ্ধ হত উত্তর-পূর্বাঞ্চল নামক দূরীকৃত অপর পরিসরের বাসিন্দা বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যিক সমাজ। হল না যে, সেইজন্য কি পুরোপুরি দায়ী অভ্যন্তরীন ঔপনিবেশিকতা? নাকি দেশভাগ ও প্রব্রজনের সহগামী সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বহুবিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক যে-মানচিত্রটি চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, তার হাঁ-মুখ গহ্বরের শূন্যতা আমাদের সামূহিক সত্তাকে যাবতীয় সংলগ্নতাবোধ সহ গ্রাস করে ফেলেছে : আমাদের জন্যে তাই রয়ে গেছে গন্তব্যহীন যাত্রা— 'gesture without motion'।

৬

কিন্তু কী হল না অথচ হওয়ার কথা ছিল—এই নিয়ে আক্ষেপ করা অর্থহীন। কেন হল না, তা নিশ্চয় ভাবা যেতে পারে। তবে কোনও একটি ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে সেই গণ্ডির প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিয়ে যদি ভাবি, তা হলে বড়ো পরিসরের সঙ্গে দ্বিবাচনিকতার নান্দনিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন অস্পষ্টই রয়ে যাবে। তাছাড়া তথ্য

থেকে ভাবনা-বিশ্বের নিয়ন্তা তত্ত্বে যদি পৌঁছানো না যায়, সমস্ত চেষ্টাই হবে পণ্ডশ্রম মাত্র। একদিকে পরস্পর বিবাদমান ও বেপথুমান জাতিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য অন্বয়ের জন্যে নিরুৎসুক ভাবনা ও উদাসীন অনাগ্রহের টানাপোড়েন এবং অন্যদিকে কল্পিত কোনও সাহিত্যকেন্দ্র বা সংস্কৃতিকেন্দ্রের প্রতি কখনও সচেতন কখনও অবচেতন আনুগত্য : এইসব কিছুর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষীদের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-প্রয়াস যেন নেপচুন নামক গ্রহের মতো সৌরমণ্ডলের আলোককেন্দ্রকে পরিক্রমা করে চলেছে। সম্ভবত লেখা উচিত ছিল গ্রহাণুপুঞ্জের মতো। তবু এও অনস্বীকার্য যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বাংলা ভাষাভাষীদের আত্মতৃপ্ত উদাসীন স্বয়ংলালিত সৌরমণ্ডলে পরস্পরের সঙ্গে যত অনতিক্রম্য ব্যবধানই রচিত হয়ে থাকুক, আত্ম-বিস্মরণ সত্ত্বেও অভিন্ন চেতনার পরম্পরায় প্রত্যেকে লালিত। তা-ই উত্তর-পূর্বাঞ্চল যতই বহুজাতি-উপজাতির সমাবেশ হোক না কেন, Ethnicity সংক্রান্ত গুরুগম্ভীর বিদ্যায়তনিক গবেষণার আঁধি ও ধোঁয়াশা সত্ত্বেও অন্তত সৃজনশীল নন্দনের নিজস্ব বিধি-বিন্যাসকে তা মুছে ফেলতে পারেনি।

কেন এখানকার সাহিত্যচর্চায় জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণ, নিদেনপক্ষে ওয়ালীউল্লাহ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়-ভাস্কর চক্রবর্তী-সুবোধ সরকার-খোন্দকার আশরাফ হোসেন আবির্ভূত হলেন না, এ সম্পর্কে আক্ষেপের কোনও মানে হয় না। এখানকার শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বা অন্য কেউ কেন শঙ্খ ঘোষ বা উৎপল কুমার বসুর মতো লিখবেন, কেনই বা মিথিলেশ ভট্টাচার্য বা দেবব্রত দেব লিখবেন দেবেশ রায় বা ভগীরথ মিশ্র বা হাসান আজিজুল হকের মতো? একটু আগে স্বতন্ত্র আলো হাওয়া রোদের সঞ্জীবনী উপস্থিতির কথা লিখেছি, তা তো কেবল কথার কথা মাত্র নয়। আমাদের না থাকুক মরুভূমির আকাশে তারা, না-ই বা সপ্রতিভ ভঙ্গিতে লিখলাম 'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে।'—আমাদের আছে একান্ত নিজস্ব পা রাখবার ভূমি, আছে অনন্ত ভাসানে যাওয়ার আয়োজন, আছে নিজস্ব কক্ষপথ ও টুকরো টুকরো গাথা-প্রত্নকথা-কিংবদন্তি এবং আছে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে স্বখাত-সলিল কথা রচনা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নগরায়ন এসেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিংবা এসেছিল তবুও আসে নাই জানায়ে গেছে। কিন্তু এখানেই তো হয়েছে—অভূতপূর্ব ভাষা আন্দোলন ; বারবার মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছে তরুণ তরুণীরা। আর্যাবর্ত ও মধ্যপ্রাচ্যের নিরবচ্ছিন্ন নেতিবাচক ও পশ্চাৎমুখী উপস্থিতি এবং নয়া ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী আগ্রাসন সত্ত্বেও ভাষা-চেতনা এখানে এখনও পান্থপাদপের শুশ্রূষা এনে দেয়। তাই প্রকট আত্মবিরোধিতা ও আত্মঘাতী তৎপরতা সত্ত্বেও গ্রহাণুপুঞ্জের আকাশ জুড়ে নিজস্ব আলোর প্রাসঙ্গিকতা অম্লান রয়ে গেছে। নইলে অন্তহীন প্রতিকূলতার মধ্যে (যার মধ্যে রয়েছে প্রকাশন সংস্থার অনুপস্থিতিও) নিজেকেই ইন্ধন করে কীভাবে জ্বলে ওঠেন উত্তর-পূর্বের কবি-লিখিয়েরা! এক দশকের আগেই সংঘ ভেঙে যায় এখানে, তবুও নতুন করে শিকড়ে আলোর সন্ধান শুরু হয়। কল্পিত কোনও চিন্তাকেন্দ্র বা প্রধান শিবিরের আশ্রয় নেবার জন্যে নয়, অখণ্ড বাঙালি মননের

অবিভাজ্য প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যেই আপন ভাষায় রচিত বইপত্র সম্পর্কে উৎসুক এখানকার পড়ুয়ারা। উত্তর-পূর্ব থেকে তাকালে সমস্তই তো পশ্চিম : ঢাকা, কলকাতা, ইউরোপ বা আমেরিকা। কেউ রয়েছেন অদূরবর্তী পশ্চিমে আর কেউবা বহু বহু দূরবর্তী পশ্চিমে। বহুবিধ এই পশ্চিমের জানালা আমরা খুলেই রেখেছি। জানি, আলোর সঙ্গে সঙ্গে আসবে আঁধিও, নতুন হাওয়ার সঙ্গে আসবে ধুলো ও মারীবীজ। কিন্তু তা আমাদের ভাষা-জননীর সঙ্গে নাড়ির বাঁধনকে কখনওই ভুলিয়ে দিতে পারবে না। এই আমাদের উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতি যেখান প্রাক্-আধুনিক পর্যায় আজও সমাজের সর্বত্র উপস্থিত অথচ এরই উপরে চেপে বসেছে পশ্চিমী আধুনিকতাবাদ ও খানিকটা আধুনিকোত্তরবাদের আভাস দিয়ে গড়া আঙ্‌রাখা। তবু লেখাই নিঙড়ে নেয় কুশ্রীতা ও দীনতা-ভরা বেঁচে থাকার আয়োজন থেকে জীবন ও নন্দনের মধু। কোনো এক কবি তাই লেখেন :

'ভাষার গভীরে নেমে এসো বৃষ্টির শ্রাবণ
প্রতিটি আখরে জাগো
শস্য হোক ফুল হোক রূপ হোক প্রতিটি বর্ষণে
কথা থেকে সংকেত জাগুক।'

উত্তরলেখ

এ-পথে এখন প্রতিটি পাথর চেনা, ধুলো ও বৃষ্টিতে ওড়ে কুটোকাঁটা...ছায়ার সুন্দর, মেঘের মতন তাদের পক্ষালাবণ্য আবারও পথের শেষে দুঃখ বিনিময়, থেমে যাওয়া...ক্ষয়ে যাবে পথের পাথর, একদিন, নিশ্চিত মেঘ ও বৃষ্টিতে, তারপর কেউ এসে শ্বাস ফেলে বলে যাবে ; কীভাবে যে গেল পথ বোঝাই গেল না...

... ...

রুগ্ন সময়ের ভাষ্য লিখতে-লিখতে প্রহরের পরে প্রহর পেরিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, প্রসারিত হচ্ছে ক্ষয়ের পরিধি। তুব জেগে আছি, জেগে থাকব। প্রত্যেকেই।

... ...

এই বইও প্রকৃতপক্ষে সমবায়ী উদ্যোগের ফসল। স্নেহভাজন কবি সুমন গুণ সেতু তৈরি করে দিয়েছে প্রকাশকের সঙ্গে এবং প্রুফ সংশোধনেও তার অভিনিবেশ রয়েছে। স্নেহাস্পদ রূপরাজ ভট্টাচার্য ও রামী চক্রবর্তী দ্বিরালাপের সূত্রে এই প্রয়াসে সম্পৃক্ত। আর আছেন তিনি যাঁর সাহচর্যে পেরিয়ে যাচ্ছি বিপন্ন সময়ের এ পরিধি, স্বপ্না ভট্টাচার্য।

... ...

কালবেলার কথকতা ফুরিয়ে যাবে একদিন, ফুরোবে না আমাদের অতন্দ্র প্রহরা।